তফসীরে নূরুল কোরআন

পঞ্চম পারা

৫

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম (র.)

পঞ্চম খন্ড

তফসীরে নূরুল কোরআন

পঞ্চম পারা

৫

পঞ্চম খণ্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মাসিক আল-বালাগ,
তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন
বোর্ড অফ গভর্ণরস, মরহুম ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ
এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহঃ)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স

ঢাকা

প্রকাশক : মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান

তৃতীয় প্রকাশ : জমাদিউস সানী ১৪৩৩ হিঃ
বৈশাখ ১৪১৯ বাং
মে ২০১২ইং

গ্রন্থ স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হাদীয়া : ৩০০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে : নিউ এস আর প্রিন্টি প্রেস
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

অক্ষর বিন্যাস : মোঃ হারুন-অর-রশীদ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার (ইসলামী টাওয়ার)
ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৫৮৯১৩
এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল ০১৭১৩-০১৪৮৮৯
আন্-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৭১৭৩৭২১

Tafsir-e-Nurul Quran (V) 5, Hazrat Mawlana Mohammed Aminul Islam (Rh.) Published by Al-Balag Publications,12/17, Sir Sayed ahmed Road, Mohammadpur, Block-A, Dhaka-1207
Price :300.00.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

আলহামুদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাকের অপার রহমতে তফসীরে নূরুল কোরআনের পঞ্চম খণ্ড (৫ম পারা) প্রকাশিত হলো। এজন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে পেশ করি অগণিত শোকর। আল্লাহ্ পাকের তওফিক ব্যতীত এ কাজ শুধু অসম্ভবই নয়; বরং অচিন্তনীয়ও ছিলো। কিন্তু আল্লাহ্ পাক যখন যার দ্বারা কোন কাজ নিতে চান, তখন তাঁর মর্জিতেই তা পূর্ণ হয়। মানুষের শক্তিতে বা যোগ্যতায় নয়; বরং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহিমাময় আল্লাহ্ পাকের কুদরত ও হেকমতে। এজন্যেই মরমী কবি বলেছেন–

داد حق را قابلیت شرط نست

قابلیت را داد حق شرط ہست

অর্থাৎ আল্লাহ্র দানের জন্যে যোগ্যতা শর্ত নয়; বরং যোগ্যতার জন্যে আল্লাহ্র দান শর্ত।

করুণাময় আল্লাহ্ পাকের মর্জি হলে তিনি অযোগ্যকে যোগ্য করতে পারেন, মূককে করতে পারেন বাগ্মী– এটি শুধু তাঁর মর্জিরই ব্যাপার।

পবিত্র কোরআন শুদ্ধ করে পাঠ করা, তার মর্ম উপলব্ধি করা এবং অন্যকে পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী বুঝিয়ে দেয়া এবং এ মহান দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করা আদৌ সহজ ব্যাপার নয়; আর আমার ন্যায় দ্বীনহীন অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে তো অসম্ভব নয়; কিন্তু

لٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ

আল্লাহ্ পাক যা ইচ্ছা তা করেন এবং যার দ্বারা ইচ্ছা তাঁর পবিত্র কালামের খেদমত গ্রহণ করেন।

আজ তফসীরে নূরুল কোরআনের পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বারে বারে আল্লাহ্র পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয়ে আসে এবং স্মরণ হয় হযরত রসূরে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা, যাঁর নেক নজরের বরকতে আমি আল্লাহ্ পাকের দানে ধন্য হয়েছি। তাই তাঁর দরবারে পেশ করি অগণিত দরূদ ও সালাম। হে আল্লাহ! দরূদ প্রেরণ কর আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, সমগ্র সৃষ্টি জগতের সংখ্যা অনুসারে এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি মোতাবেক আর সেই দরূদ শরীফ হবে মহান আরশের ওজনের সমান। আর পবিত্র কোরআন লিপিবদ্ধ করার জন্যে যত মসি ব্যবহৃত হয়েছে এবং হবে তার ওজন মোতাবেক। আর সে দরূদ শরীফ তেমনই হবে যেমন দরূদ শরীফের তিনি যোগ্য।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিভ্রান্ত-পথভ্রষ্ট বিশ্ব মানবের হেদায়েতের জন্যে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআন।

পবিত্র কোরআনকে আল্লাহ্ পাক নূর বা আলো বলে আখ্যায়িত করেছেন অতএব, পবিত্র কোরআনের হেদায়েত ব্যতীত বিশ্বমানব অন্ধকারে আচ্ছন্ন; মানব ইতিহাসের চরম অন্ধকার যুগেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিলো মানব জাতির পথের দিশা রূপে। আল্লাহ্ পাকের আমোঘ বিধান হিসেবে, এসেছিলো মুমূর্ষু মানবতার সঞ্জীবনী শক্তি হিসেবে, বিপন্ন মানবতার রক্ষা করচ হিসেবে, সর্বকালীন মানুষের মুক্তির মহা সনদ রূপে।

বিশ্ব মানবের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব হলো ইসলাম। এ বিপ্লবের মহান নায়ক হলেন স্বয়ং প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। আর এ বিপ্লবের সংবিধান হলো পবিত্র কোরআন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের এবং পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে পৃথিবীতে যে অবস্থা বিরাজমান ছিল তা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হলো কোরআন নাযিল হবার পর। মরনোন্মুখ মানবতা বেচে উঠল, গোমরাহীর সকল অমানিষা কেটে গেল, বিপন্ন মানবতা রক্ষা পেল।

এ বিস্ময়কর বিপ্লব সংঘটিত হলো মাত্র ২৩ বছরের সীমিত সময়ে। প্রশ্ন হলো তা কিভাবে সম্ভব হলো? এর জবাব অতি সুস্পষ্ট। পবিত্র কোরআনের আলোকে আল্লাহ্র কালামের বরকতে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। এজন্যে আল্লাহ পাক এ দু'টি বিষয়কে এক সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এরশাদ হয়েছে—

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ

অর্থাৎ হে মানব জাতি! নিশ্চয় তোমাদের নিকট আগমন করেছে একটি নুর অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থ অর্থাৎ পবিত্র কোরআন।

অতএব, মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক দু'টি নেয়ামত দান করেছেন।

(১) প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

(২) পবিত্র কোরআন

এজন্যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের পর এ দু'টি নেয়ামতকে বরণ করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে—

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا

অতএব, তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি যা আমি নাযিল করেছি তথা পবিত্র কোরআন।

এখানে এ বিষয়টি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, সূরা মায়েদায় নূর বলা হয়েছে প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে, আর সূরা তাগাবুনে নূর বলা হয়েছে পবিত্র কোরআনকে অতএব, হেদায়েতের মূল উৎস হলো পবিত্র কোরআন ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ।

এজন্যে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে দু'টি উৎসেরই হেফাজত করছেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন। আর এ হেফাজতের কথা তিনি পবিত্র কোরআনেই ঘোষণা করেছেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ

"নিশ্চয় আমি পবিত্র কোরআন নাযিল করেছি এবং নিশ্চয় আমিই এর হেফাজতকারী"।

এ পর্যায়ে বর্তমান যুগে আল্লাহ্ পাক মানুষের ঈমান এবং একীনকে সুদৃঢ় করার জন্যে অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন দেখাচ্ছেন, যেমন ১৯৮৮ সালের নভেম্বরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে বহনকারী বিমানটির সকল আরোহীসহ সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক্বের বুকে সংরক্ষিত পবিত্র কোরআন খানি সম্পূর্ণ অক্ষত থেকে যায়। এ ঘটনা বিশ্ববাসীর চক্ষু উন্মীলিত করার জন্যে যথেষ্ট। বিগত মার্চ ১৯৮৯'র একটি ঘটনা খুলনাতে ঘটে। পুকুর খনন কালে একখানি পবিত্র কোরআন অক্ষত অবস্থায় মাটির নীচে পাওয়া যায়। দেশের দৈনিক পত্রিকাগুলোয় এর বিবরণ প্রকাশিত হয়।

বিগত ৫ই মে '৮৯ এর দৈনিক পত্রিকা সমূহের সংবাদঃ ২৬ এপ্রিল মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় যে টর্নেডো হয় তাতে সব কিছু ধ্বংস হলেও অক্ষত থেকে যায় কয়েক শত কপি পবিত্র কোরআনের। সংবাদপত্রের বিবরণীতে আরো প্রকাশ যে একই টেবিলে অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে পবিত্র কোরআন ছিলো কিন্তু পবিত্র কোরআন ব্যতীত আর সমস্ত পুস্তক সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে আর পবিত্র কোরআন রয়েছে সম্পূর্ণ অক্ষত। এটা এজন্যে যে পবিত্র কোরআন স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের কালাম, তাঁর মহান বাণী, তিনি নিজেই এর হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন।

আল্লাহ্ পাক যে শুধু পবিত্র কোরআনের ভাষাকে হেফাজত করছেন তাই নয়; বরং তার মর্মবাণীরও হেফাজত করছেন। সারা বিশ্বে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ হলো পবিত্র কোরআন এতদ্ব্যতীত, হাফেজগণ পবিত্র কোরআন হেফজ করে রাখছেন, আল্লাহ্ পাকের বিশেষ কুদরতে কিছু ভাগ্যবান মানুষকে সম্পূর্ণ পবিত্র কোরআন কণ্ঠস্ত রাখার তৌফিক দেয়া হচ্ছে যা মানব রচিত কোন গ্রন্থের ক্ষেত্রে অচিন্তনীয়।

এর পাশাপাশি আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনের তরজমা, তফসীর তথা ব্যাখ্যার প্রচার ও প্রসারের তওফিকও দান করছেন। পৃথিবীর প্রায় ৪০০শত ভাষায় এ পর্যন্ত এ মহান গ্রন্থের তরজমা বা তফসীর হয়েছে।

বাংলা ভাষায় কোন মৌলিক বিস্তারিত এবং প্রামাণ্য তফসীর গ্রন্থ ইতিপূর্বে রচিত হয়নি তাই এ নগণ্য খাদেমকে এমন কঠিন কাজে হাত দিতে হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! তফসীরে নূরুল কোরআনের যে চার খানি খণ্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে তা পাঠক বৃন্দ কর্তৃক আল্লাহ্ পাকের রহমতে সমাদৃত হয়েছে। এক আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করেই আজ তফসীরে নূরুল কোরআনের পঞ্চম খণ্ড পাঠক সমীপে পেশ করতে যাচ্ছি। এর মধ্যে যা কিছু সৌন্দর্য রয়েছে তা শুধু আল্লাহ্ পাকের রহমত ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর যা কিছু ত্রুটি রয়েছে তার জন্যে দায়ী আমার জ্ঞানের দৈন্য। আশাকরি ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতেই দেখা হবে। এ বিষয়ে আমাদের অবহিত করা হলে ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনে প্রয়াসী হব।

ইনশাআল্লাহ্! তফসীরে নূরুল কোরআন ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত হবে। পাঠকবৃন্দের খেদমতে আবেদন এই, দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ পাক এ মহান গ্রন্থের অবশিষ্ট খণ্ডসমূহ পেশ করার তৌফিক দান কনের।

তফসীরে নূরুল কোরআনের পঞ্চম খণ্ড প্রকাশনায় যারা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন জনাব কে. বি আহমদ সাহেব, ঢাকা জেলার ডেপুটি কমিশনার জনাব নিজামুদ্দীন সাহেব সহ অনেকে। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ দান করুন।

আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে দোয়া করুন যেন তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের এই সাধনা তিনি কবুল করেন। এবং আমার আখেরাতে নাজাতের ওসিলা হিসেবে গ্রহণ করেন।

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

"হে পরওয়ারদেগার, কবুল কর আমাদের তরফ থেকে, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত"।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله
واصحابه اجمعين

বিনীত
মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
১১/০৫/৮৯

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
তফসীরুল কোরআন	২
একজন নারী একই সময় একাধিক স্বামী বরণ করতে পারেনা	৩
মোতয়াহ্ হারাম	৬
বাঁদীর সঙ্গে বিবাহ্ প্রসঙ্গে	১০
পূর্ববর্তী শরীয়তের বিধান সম্পর্কে	১৬
সূরা নেসার ৮খানি আয়াত	১৭
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	২০
আত্মহত্যা করোনা	২৩
কবীরা গুনাহ্ প্রসঙ্গে	২৫
কবীরা গুনাহ্র তিনটি স্তর	২৬
আয়াতের মর্মকথা	৩২
শানে নুজুল	৩৪
উত্তরাধিকার সম্পর্কে	৩৭
ইসলামের প্রথম যুগের কিছু সমস্যা	৩৮
শানে নুজুল	৩৯
নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব	৪০
স্ত্রীর কর্তব্য	৪১
পুরুষের প্রাধান্য	৪১
নেককার স্ত্রীদের বৈশিষ্ট্য	৪৪
ঈমানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত	৪৫
স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে	৪৬
স্বামীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী	৪৭
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	৪৯
সালিশ নিয়োগের নির্দেশ	৪৯
সালিশদের অধিকার	৫০
মানুষের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব	৫২
গোপন শেরক সম্পর্কে সতর্কবাণী	৫২
আয়াতের দুটি কথা	৫৪
পিতা মাতার প্রতি কর্তব্য পালনের তাগিদ	৫৫
আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ	৫৭

বিষয়	পৃষ্ঠা

এতীম মেসকীনের প্রতি কর্তব্য..৫৮
প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব পালন..৫৮
প্রবাসী মুসাফিরের প্রতি কর্তব্য..৫৯
শ্রমিকের অধিকার..৬০
আয়াতের মর্মকথা..৬১
শানে নুজুল..৬২
লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দানের ব্যর্থতা..৬৫
কাফেরের সৎ কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই হয়..৬৮
নাজাত প্রাপ্ত মোমেনের আরযী..৬৮
আখেরাতের দৃশ্য..৭০
প্রতিদিন উম্মতের আমল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে পেশ করা হয়..৭৩
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাক্ষী হবেন সকল নবীর সত্যতার উপর..৭৩
কাফেরদের আকাঙ্খা..৭৫
শানে নুজুল..৭৬
নামাজে সতর্কতা অবলম্বন..৭৮
তৈয়ম্মুমের বিধান..৭৯
তৈয়ম্মুমের বিধান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য..৮০
তৈয়ম্মুমের হেকমত..৮১
প্রণিধান যোগ্য কয়েকটি বিষয়..৮২
তৈয়ম্মুমের অনুমতি..৮৪
শানে নুজুল..৮৬
ইহুদীদের জঘন্য প্রকৃতির নমুনা..৮৭
আল্লাহ পাকই মুসলমানদের অভিভাবক..৮৮
ইহুদীদের প্রতি সতর্কবাণী..৯১
হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালামের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ..৯২
শানে নুজুল..৯৪
ওয়াহশীর ইসলাম গ্রহণ..৯৫
সর্বাধিক আশাপূর্ণ আয়াত..৯৭
শানে নুজুল..৯৮
নবীগণ ব্যতীত কেউ নিঃষ্পাপ নয়..১০০
শানে নুজুল..১০২

বিষয়	পৃষ্ঠা
দুটি শব্দের ব্যাখ্যা	১০৩
ইহুদী অভিশপ্ত কেন?	১০৫
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	১০৭
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	১১৪
শানে নুজুল	১১৫
আমানত রক্ষার আদেশ	১১৮
আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে আমানতের তাৎপর্য	১১৮
বন্দার সাথে আমানতের প্রশ্ন	১১৯
মানুষের সম্পর্ক তার নিজের সঙ্গে	১১৯
শানে নুজুল	১২৩
শাসনকর্তার প্রতি আনুগত্য	১২৬
শানে নুজুল	১৩০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	১৩৬
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ একান্ত কর্তব্য	১৩৯
আয়াতের মর্মকথা	১৩৯
জেহাদের জন্যে প্রস্তুত থাকার আহবান	১৫৩
আয়াতের মর্মকথা	১৫৩
আ'মালুল কোরআন	১৫৯
জেহাদের উদ্দেশ্য	১৬১
শানে নুজুল	১৬২
তফসীরুল কোরআন	১৬৫
শানে নুজুল	১৬৫
তফসীরুল কোরআন	১৭৩
শানে নুজুল	১৭৩
সালামের রীতি	১৮৭
যে সালাম অবৈধ	১৮৯
যে সালামের জবাব দেয়া বৈধ নয়	১৮৯
শানে নুজুল	১৯৩
আয়াতের মর্মকথা	১৯৬
শানে নুজুল	২০৫
আয়াতের মর্মকথা	২০৭
দিয়তের পরিমাণ	২০৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	২১০
এ আয়াত দ্বারা যা প্রমাণিত হয়	২১০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	২২১
একটি বিস্ময়কর ঘটনা	২২১
আয়াতের মর্মকথা	২২৩
জেহাদের তাৎপর্য	২২৪
জেহাদ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান	২২৫
হাদীসের আলোকে জেহাদ	২২৭
আয়াতের মর্মকথা	২৩০
হিজরতের মর্মকথা	২৩৬
মাসায়েলুল কোরআন	২৪০
আয়াতের অর্থ	২৪৫
আয়াতের মর্মকথা	২৫০
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এজতেহাদ	২৬২
উম্মতের প্রতি আল্লাহর দান	২৬৬
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতার শাস্তি	২৭২
সর্বপ্রকার কল্যাণের কথা	২৭৫
আয়াতের মর্মকথা	২৭৮
ইবলিসের শপথ	২৮০
শানে নুজুল	২৮৬
শানে নুজুল	২৮৯
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	৩০২
সুবিচার কায়েম করার নির্দেশ	৩০৭
আয়াতের মর্মকথা	৩০৮
তফসীরুল কোরআন	৩১১
মুনাফেকদের শাস্তির কথা	৩১৯

https://t.me/islaMic_pdf

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

তফসীরে নূরুল কোরআন

পঞ্চম খণ্ড পঞ্চম পারা

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ
عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ
غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ
فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

তরজমা

(২৪) আর তোমাদের জন্যে হারাম সেসব রমণীগণ, যাদের স্বামী বর্তমান রয়েছে। তবে যাদের তোমরা মালিক হয়েছে তারা তোমাদের জন্যে হারাম নয়। এটি তোমাদের প্রতি আল্লাহর আদেশ। এছাড়া অন্য রমণীগণ তোমাদের জন্যে হালাল। যেন তোমরা স্বীয় অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে বিবাহ করতে পার। (সাবধান) ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়োনা, অনন্তর তোমরা উক্ত রমণীগণ থেকে যে উপকার লাভ করেছ সেজন্যে তাদেরকে নিদৃষ্ট মোহরানা আদায় কর এবং মোহরানা নির্ধারিত হওয়ার পরও যে বিষয়ে তোমরা পরস্পর সম্মত হও তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

তফসীরুল কোরআন

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۤءِ

পূর্ববর্তী আয়াতে সেসব নারীদের উল্লেখ রয়েছে যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ আর এ আয়াতেও এমন নারীর উল্লেখ রয়েছে যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ।

"মোহ্‌নাসাত" সেসব স্ত্রীলোককে বলা হয় যাদের স্বামী বর্তমান আছে। তাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে এ আয়াতে। কিন্তু যদি তাদের স্বামী মৃত্যু মুখে পতিত হয় অথবা স্বামী যদি তালাক দেয় তখন ইদ্দত শেষ হলে তাদেরকে বিবাহ্ করা যায়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে সেই মোহাজের মহিলাদের সম্পর্কে যারা স্বামী ব্যতীত মুসলমান হয়ে হিজরত করে মদীনা তৈয়্যেবায় চলে আসতেন। কোন কোন মুসলমান তাদেরকে বিবাহ্ করতেন। এরপর তাদের স্বামীরা মুসলমান হয়ে হিজরত করে মদীনা মোনাওয়্যারায় আসতেন। আল্লাহ পাক এমন নারীদের সঙ্গে বিবাহ্ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন।

যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন তখন আরববাসী ইসলামের বিরোধিতা করলো। মুষ্টিমেয় মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার অবিচারে তারা খড়গহস্ত ছিল সুদীর্ঘ ১৩টি বছর। মুসলমানদেরকে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নির্যাতিত উৎপীড়িত অবস্থায় জীবন যাপন করতে হয়েছে। কাফেরদের জুলুম অত্যাচার যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মজলুম মুসলমানদেরকে প্রিয় মাতৃ-ভূমি ছেড়ে প্রথমে আবিসিনিয়ার পরে মদীনা তৈয়্যেবায় হিজরত করতে বলেন। ইসলামের জন্যে, সত্য ও ন্যায়ের জন্যে নিজের মাতৃ-ভূমি ছেড়েছিলেন সাহাবায়ে কেরাম অকুণ্ঠচিত্তে। বিশেষতঃ যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা তৈয়্যেবায় হিজরত করলেন তখন মুসলমানদের মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হল।

ক্ষেত্রবিশেষে যখন স্বামী মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হিজরত করতো না কিন্তু তাদের স্ত্রীগণ ইসলাম কবুল করে মদীনা তৈয়্যেবায় হিজরত করতেন এবং মদীনা তৈয়্যেবায় মুসলমানগণ তাদেরকে বিবাহ্ করতেন অথচ কিছুদিন পর তাদের স্বামী মদীনায় আসতেন তখন স্বাভাবিকভাবে একটি সমস্যা দেখা দিত। তাই আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, যাদের স্বামী আছে তাদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ নয়। কিন্তু যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী কাফের হয় এবং কাফেরদের দেশেই

থেকে যায় আর স্ত্রী ইসলাম কবুল করে মুসলমানদের দলে চলে আসে এমন নারীর সঙ্গে বিবাহ বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। অবশ্য এ পর্যায়ে আল্লাহ পাকের যে নির্দেশ রয়েছে তা অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ مُهَـٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ

অর্থাৎ হে মোমেনগণ! যখন তোমাদের নিকট মোমেন নারীগণ হিজরত করে আসে তখন তাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান কর। আল্লাহ পাক তাদের ঈমান সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানেন। যদি অনুসন্ধানের পর তারা প্রকৃত মোমেন প্রমাণিত হয় তবে তাদেরকে কাফেরদের নিকট প্রেরণ করোনা।

কেননা, তারা ঐ কাফেরদের জন্যে হালাল নয়, আর ঐ কাফেররাও তাদের জন্যে হালাল নয়। তাদেরকে বিবাহ করার ব্যাপারে তোমাদের কোন গুনাহ নেই।

এ পর্যায়ে আমাদের ইমামে আযম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর মতে, যে মোমেন স্ত্রীলোক কাফের স্বামী থেকে ভিন্ন হয়ে কাফেরের দেশ ছেড়ে মুসলিম দেশে চলে আসে তার এ ভিন্ন হওয়াটাই মুসলিম স্বামী গ্রহণের ব্যাপারে যৌক্তিক পরিণতি মনে করা হয়। ইমামে আযম (রঃ)-এর মতে, অতঃপর কোন ইদ্দতেরও প্রয়োজন নেই। আর ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর মতে, ইদ্দত অতিবাহিত করা জরুরী।

ইমাম মালেক (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ) বলেছেন যে, সে স্ত্রীলোকটির মুসলমান হওয়ার মুহূর্ত থেকে তার তিন ঋতু পার হওয়ার পর তাকে পূর্ব স্বামী থেকে মুক্ত বলে শরীয়ত মোতাবেক গ্রহণ করা হবে যদি তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠে থাকে। পক্ষান্তরে, যদি তাদের মধ্যে এ সম্পর্ক গড়ে না ওঠে তবে মুসলমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন বলে গ্রহণীয় হবে।[১]

একজন নারী একই সময় একাধিক স্বামী বরণ করতে পারে না

যাদের স্বামী বর্তমান এমন নারীর সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ একথা ঘোষণার মাধ্যমে পবিত্র কোরআন এ সত্যও ঘোষণা করলো যে, একজন নারী একই সময় একাধিক

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৭-১৮

স্বামী বরণ করতে পারেনা। কেননা, এমন অবস্থায় সন্তানের পিতা কে হবে- এ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয় না। এতদ্ব্যতীত একজন নারীর পক্ষে একাধিক স্বামীর হক্ব আদায় করাও সম্ভব নয়। এজন্যে স্বভাব ধর্ম ইসলাম এ বিষয়ে কঠোর হুশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করেছে। মানবতার উন্মেষ ও বিকাশ সাধনের জন্যে এবং মানবতার মান রক্ষার তাগিদেই ইসলাম এ নির্দেশ দিয়েছে।

إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

অর্থাৎ যে সব রমণীর স্বামী রয়েছে তাদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্যে হারাম। তবে তোমরা যাদের মালিক হয়েছ তারা হারাম নয়। অর্থাৎ যদি কোন কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলমানরা যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ হিসেবে কোন স্ত্রীলোক পাওয়া যায়, সে তখন মুসলমানদের বাঁদী হিসেবে পরিগণিত হয়। এভাবে মুসলমানগণ যেসব নারীর মালিক হয় তারা মুসলমানদের জন্যে হালাল হয়। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, কোন স্ত্রীলোক যখন গ্রেফতার হয়ে আসে তখন সে বন্দীনীর মালিক যে হবে তার জন্যে এ বন্দীনী হালাল হবে। তবে মুসলমানদের মালিকানায় আসার পর একটি ঋতু অবশ্যই তার অতিবাহিত হতে হবে। মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী এবং নেসায়ী নামক হাদীস গ্রন্থ সমূহে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আওতাছ নামক যুদ্ধের গনিমত বা যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ হিসেবে কিছু মহিলাও হাতে আসে। যখন তাদের সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হয় তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, জেহাদের মাধ্যমে গনিমত হিসেবে আল্লাহ পাক যেসব নারীদেরকে তোমাদের দান করেছেন তারা তোমাদের জন্যে হালাল।

শানে নুযুল

তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আয়াতখানি নাযিল হয়েছে হোনায়েনের যুদ্ধের সময়। এ সময় কয়েকজন আহলে কেতাব মহিলা মুসলমানদের হাতে আসে। তাদের স্বামী ছিল। মুসলমানগণ তাদেরকে স্ত্রী হিসেবে বরণ করে নিতে চাইলে তারা বললো, আমাদের স্বামী আছে। তখন এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে এ আয়াত নাযিল হয়।

ইমামগণ বন্দীনী মহিলাদের ব্যাপারে ঋতু অতিবাহিত করার যে শর্তারোপ করেছেন তার কারণ হলো, আওতাছের যুদ্ধের দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে একজন ঘোষক এ ঘোষণা করেছিল যে, যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ

হিসেবে যেসব মহিলা পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে যারা অন্তঃসত্ত্বা তাদের সন্তান জন্মের পূর্বে এবং যারা অন্তঃসত্ত্বা নয় তাদের ঋতু অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে যেন কেউ বিয়ে না করে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যেসব বন্দীনীর মালিকদেরকে তাদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এ বন্দীনীদেরকে অন্যদের কাছে বিয়ে দেয়ার অধিকারও তাদের রয়েছে।

كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

যাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম ঘোষিত হয়েছে তাদের ব্যাপারে এটিই আল্লাহ্‌র বিধান। এ বিধান মনে রেখো, এর গুরুত্ব উপলব্ধি কর এবং এর ব্যতিক্রম যদি কেউ করে তবে তার পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

এবনে জরীর 'কিতাবুল্লাহ্‌'র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত ওমর (রাঃ)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অর্থাৎ চারজন স্ত্রীর সীমা নিদৃষ্ট, এর অধিক নয়। এবনে জোরাইহের বর্ণনা হলো, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-ও এ ব্যাখ্যাই করেছেন। অতএব, তোমরা এ বিধান মেনে চল। সীমা লজ্ঘন করোনা তথা একসঙ্গে চারজন স্ত্রীর অধিক রাখা তোমাদের জন্যে হারাম করা হলো। এটি আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ বিধান।

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ

অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ হারাম ঘোষণা করা হলো তাদের ব্যতীত তোমরা অন্য নারীদেরকে বিবাহ করতে পার। তবে এর জন্যে কয়েকটি শর্ত রয়েছে (১) উভয় পক্ষের ইজাব কবুল হতে হবে তথা প্রস্তাব এবং সে প্রস্তাব গ্রহণ করা। (২) দেন মোহর নির্ধারণ করা। (৩) বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা যেন স্থায়ী করার সঙ্কল্প থাকে তথা সাময়িক যৌন সম্ভোগের অসৎ উদ্দেশ্যে যেন বিবাহ না হয় এবং (৪) বিবাহ বন্ধন যেন গোপন সম্পর্কের ভিত্তিতে না হয়।

اَنْ تَبْتَغُوْا

যদি তোমরা তাদেরকে কামনা কর অর্থাৎ উভয় পক্ষ থেকে মৌখিক ইজাব কবুল হয়।

بِاَمْوَالِكُمْ

অর্থাৎ শুধু মৌখিক ইজাব কবুল যথেষ্ট নয়, বরং তোমাদেরকে বিবাহের জন্যে দেন মোহর আদায় করতে হবে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, দেন মোহর আদায়

ব্যতীত বিবাহ হতে পারে না। এমনকি ফেকাহ শাস্ত্রের ইমামগণ বলেছেন, যদি স্বামী স্ত্রীও এ বিষয়ে একমত হয় যে, দেন মোহর ব্যতীতই বিবাহ হবে কিন্তু তা-ও বৈধ নয় এবং দেনমোহর অবশ্যই আদায় করতে হবে।

مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ

বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে সে নারীর সাথে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার সংকল্প থাকতে হবে। ক্ষণিকের যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তির লক্ষ্যে যেন এ বন্ধন না হয় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

মোতয়াহ হারামঃ এতদ্বারা মোতয়াহ বিবাহ হারাম প্রমাণিত হলো। কেননা, মোতয়াহ হলো নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার। মোতয়াহর ক্ষেত্রে কোন নারীকে একথা বলা হয় এত দিন বা সময়ের জন্যে, এ পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে অথবা এ দ্রব্যের বিনিময়ে তোমার সাথে মোতয়াহ করছি। এমন কথা এবং এমন সম্পর্ক সম্পূর্ণ হারাম। এ ব্যাপারে ইমামগণ একমত। শুধু বাতিল ফেরকা শিয়ারা মোতয়াহকে বৈধ বলে। এমনকি এ অশ্লীল কাজটি তাদের মতে সওয়াবের কারণ হয়। অথচ আলোচ্য বাক্যে

مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ

মোতয়াহ সম্পূর্ণ অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মোতয়াহ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

হযরত আলী (রঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের সময় নারীদের সাথে মোতয়াহ করতে এবং পালিত গাধার গোশ্‌ত ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিজী শরীফ)

মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং সীরাহ এবনে মাবাদ জোহানী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। তিনি এরশাদ করেনঃ হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে ইতিপূর্বে মোতয়াহ করার অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু মনে রেখো এখন আল্লাহ পাক মোতয়াহকে কেয়ামত পর্যন্ত হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। যার নিকট এমন স্ত্রীলোক রয়েছে তার কর্তব্য হলো স্ত্রীলোকটিকে ছেড়ে দেয়া। আর তাদেরকে তোমরা যা কিছু দিয়েছ তা তাদের নিকট থেকে ফেরত নিও না।[১]

বিবাহ বৈধ হতে হলে কমপক্ষে দু' জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ দু' জন মহিলা যেন বিবাহের সাক্ষী থাকে। এ দু' জন সাক্ষী ব্যতীত যদি ইজাব কবুল করা

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬
তফসীরে কবীর খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৫১

হয় তবে তা শরীয়ত মোতাবেক গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি ব্যাভিচারের পর্যায়ভুক্ত, যেমন মোতয়াহ ব্যাভিচারে পরিগণিত। দেন মোহরের ব্যাপারে আরো কথা আছে। যদি কোন ব্যক্তি দেন মোহর বাবদ অর্থ না দিয়ে এ শর্ত পেশ করে যে, স্বামী এক বছর যাবত স্ত্রীর খেদমত করবে, আর এভাবেই দেন মোহর আদায় হবে।

ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন যে, এক বছরের খেদমতের মূল্য নির্ধারণ করে আদায় করা অবশ্য কর্তব্য হবে। কেননা, স্ত্রী স্বামীর খেদমত করবে এটিই সাধারণ নিয়ম এবং বিবাহের মূল লক্ষ্য। কিন্তু দেন মোহরের স্থলে স্বামী স্ত্রীর খেদমত করবে এটি বিবাহের সাধারণ লক্ষ্যের খেলাফ কাজ। কিন্তু যেহেতু এ খেদমতকেই মোহর হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে তাই যে বস্তুর বিনিময়ে খেদমত হবে তা আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন, এ ক্ষেত্রে মোহরে মেছাল আদায় করতে হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন, এভাবে দেন মোহর আদায় হয়ে যাবে।[১]

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً

অতএব, যেসব নারীদেরকে তোমরা স্ত্রী হিসেবে ভোগ করেছ তাদেরকে তাদের দেন মোহর পুরোপুরি আদায় করে দাও। এটি অবশ্য কর্তব্য। যদি স্ত্রী ক্ষমা না করে তবে এ দাবী থেকে নিষ্কৃতিও নেই। এ আয়াত দ্বারা ভণ্ড প্রকৃতির কোন কোন লোক মোতয়াহকে বৈধ বলার অপচেষ্টা করে অথচ তার পূর্ববর্তী বাক্যেই মোতয়াহ হারাম বলে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে এবং হাদীস শরীফেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

এবনে মাজাহ শরীফে রয়েছে, একবার খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) একটি ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু ৩ দিন দিনের জন্যে মোতয়াহর অনুমতি দিয়েছিলেন। অতঃপর তা হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। যদি আমি কারো সম্পর্কে জানি যে, সে মোতয়াহ করে তবে তাকে পাথর মেরে ধ্বংস করবো অর্থাৎ তাকে ব্যাভিচার করার শাস্তি প্রদান করা হবে।

হযরত সালমান এবনে আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন, আওতাছের যুদ্ধে তিন দিনের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। সিরিয়ার

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২২
তফসীরে কবীর খ-১০, পৃষ্ঠা-৪৭

আকাবা নামক স্থানে পৌঁছার পর আমরা কয়েকজন মহিলাকে পেলাম, তাদের সঙ্গে মোতয়াহ্ করলাম। তারা আমাদের উষ্ট্রে আরোহন করবে এমন সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমরা আরয করলাম এদের সঙ্গে আমরা মোতয়াহ্ করেছি। তখন তিনি এত রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর চেহারা মোবারক লাল হয়ে গেল। তিনি দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণ দিলেন। আল্লাহ্ পাকের হাম্‌দ বর্ণনার পর মোতয়াহ্ বিবাহ হারাম বলে ঘোষণা করলেন। এরপর আর এমন কাজ করিনি, ভবিষ্যতেও আর করবো না।[১]

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

অর্থাৎ বিবাহের সময় যে দেন মোহর নির্ধারতি হয় পরবর্তীতে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় দেন মোহরের কিছু অংশ কমিয়ে দেয় অথবা স্বামী যদি কিছু বাড়িয়ে দেয় তবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই, কিন্তু সর্বাবস্থায় তোমাদের উভয়ের সম্মতি একান্ত জরুরী। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, বিয়ের পর স্বামী স্ত্রী পরস্পর সম্মতিক্রমে দেন মোহরের ব্যাপারে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে পারে। অর্থাৎ স্ত্রী ইচ্ছা করলে কমাতে পারে স্বামী ইচ্ছা করলে বাড়াতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি দেন মোহর বাড়িয়ে দেয় তখন দেন মোহরের মূল দাবীর পাশাপাশি বাড়তি অর্থের দাবীও করতে পারে– এ অধিকার স্ত্রীর থাকে। পরবর্তীতে স্বামীর এ অধিকার থাকে না যে, সে বলবে মোহরানার পূর্ব নির্ধারিত টাকা আমি দেব, আর যা আমি বৃদ্ধি করেছি তা দেয়া না নেয়া আমার ইচ্ছাধীন। শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বামীর পক্ষ থেকে এমন কথা বৈধ নয়।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তোমাদের সুবিধা অসুবিধা তথা সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাই তাঁর আদেশ সমূহ হলো হেকমতপূর্ণ, যুক্তিসঙ্গত এবং এতে রয়েছে তোমাদের জন্যে সার্বিক কল্যাণ।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩২-৩৩

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ
يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ
الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ
فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ
مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ
فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ
الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ
لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٢٥

তরজমা

(২৫) আর তোমাদের মধ্যে যে কোন মুসলিম স্বাধীন মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ না রাখে তবে সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মোমেন নারীকে বিবাহ করবে। আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের ঈমান সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন। তোমরা একে অন্যের সমতুল্য। অতএব, তোমরা ক্রীতদাসীকে বিবাহ কর এবং নিয়মানুসারে তাদের মোহরানা আদায় কর এ কারণে যে, তাকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করা হবে। তবে তারা যেন প্রকাশ্যে ব্যাভিচারিনী এবং গুপ্ত প্রেমিকা না হয়। অতঃপর যখন তারা বিবাহিতা হয় এবং পরে যদি ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, তবে যে শাস্তি স্বাধীনা নারীদের দেয়া হয় তার অর্ধেক তাদের জন্যে। এটি তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তির জন্যে যে ব্যাভিচারের ব্যাপারে শঙ্কিত হয় এবং যদি তোমরা ব্যয় কর তবে তা তোমাদের জন্যে হবে অতি উত্তম। আর আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতীব দয়াময়।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, যদি স্বাধীনা সম্ভ্রান্ত নারীকে বিবাহ করার সামর্থ কারো না থাকে তবে সে মোমেন বাঁদীদের মধ্য থেকে কাউকে বিয়ে করবে। এ আয়াত দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম মালেক (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ) একথা প্রমাণ করেছেন যে, যদি স্বাধীনা সম্ভ্রান্ত নারীকে বিবাহ করার সামর্থ থাকে তবে বাঁদীর সঙ্গে বিবাহ করা হারাম। ইমামে আযম আবু হানীফা (রঃ)-

এর মতে, এটি মাকরূহ তানজিহী বা অবাঞ্ছনীয়। এখানে একথাও উল্লেখ্য, বাঁদী যদি মুসলমান হয় তবে তার সাথে বিবাহ বৈধ হবে নতুবা নয়। আমাদের ইমাম সাহেবের মতে, বাঁদী যদি মুসলমান হয় তবে তা উত্তম অন্যথায় অমুসলমান হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে। যেহেতু স্বাধীনা অভিজাত মহিলার খোরপোশের ব্যয় ও দায়িত্ব থেকে বাঁদীর ব্যয় অনেক কম। বাঁদী সাধারণত তার মনিবের কাছেই থাকে। মনিবই তার ব্যয়ভার বহন করে। আর যদি স্বামীর কাছেও থাকে তবুও দায়-দায়িত্ব অপেক্ষাকৃত কম, তাই যার সম্ভ্রান্ত স্বাধীনা মহিলাকে বিবাহ করার সামর্থ নেই তাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

এবনুল মুনজের হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক বাঁদীদের সাথে বিবাহ সে ব্যক্তির জন্যে হালাল করেছেন, যার স্বাধীনা নারীর পাণি গ্রহণের সামর্থ নেই। আর যার নিজের সম্পর্কে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।[১]

বাঁদীর সাথে বিবাহ প্রসঙ্গে

আলোচ্য আয়াতে যদিও বাঁদীর সাথে বিবাহের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে তবে পবিত্র কোরআনের ভাষা এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। তাহলো

مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ

অর্থাৎ বাঁদী হতে হবে মোমেনা। যদিও আলোচ্য আয়াতে 'মোমেনা' শব্দটিকে শর্ত হিসেবে নয়; বরং গুণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এ গুণটি শর্তের হুকুমে রয়েছে। কেননা আল্লাহ পাক কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমনঃ

لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ

অর্থাৎ ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা। আরও এরশাদ হয়েছেঃ

لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ এমন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করোনা যারা আল্লাহর অভিশপ্ত। এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন নারীর সাথে বিবাহের আগ্রহ হয় চারটি কারণে (১) অর্থ-সম্পদ (২) বংশ মর্যাদা (৩) সৌন্দর্য

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮

(৪) দ্বীনদার। তোমরা দ্বীনদার নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সাফল্যমণ্ডিত হও। (বোখারী, মুসলিম)

ইমাম মুসলিম এ মর্মে হযরত যাবের (রাঃ) থেকেও একখানি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকেও একখানি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের ঈমান সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানেন।

কোন কোন বাঁদীর ঈমান অভিজাত স্বাধীনা নারীর ঈমান থেকেও মজবুত হতে পারে। অতএব, এ কারণে বাঁদীর সাথে বিবাহে সংকোচের কোন ন্যায্য কারণ নেই। মূলতঃ তোমরা সকলেই এক আদম-সন্তান, এ হিসেবে তোমরা সকলেই এক। পরস্পরের সাথে পরস্পরের অভিন্ন সম্পর্ক। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এরশাদ করেছেনঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ পাক তোমাদের বর্বরতার যুগের মন্দ স্বভাব এবং পূর্ব পুরুষদের ব্যাপারে গৌরব করার মন্দ অভ্যাস দূর করে দিয়েছেন। এখন মানুষ হয়তো মোমেন এবং মুত্তাকী অথবা কাফের বদনসীব। তবে সকলেই আদম সন্তান। আদমকে মাটি দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। (তিরমিজী, আবু দাউদ)

হযরত আকাবা এবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের বংশ-সূত্র কারো জন্যে দোষের কারণ নয়, তোমরা সকলেই আদম-সন্তান। আরো এরশাদ হয়েছেঃ শুধু দ্বীনদারী ও পরহেযগারীর কারণেই তোমাদের একের প্রতি অন্যের ফজিলত, অন্য কোন কারণে নয়। তফসীরকারগণ বলেছেনঃ বাঁদীদের বিবাহে সংকোচ নিরসন তথা উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যেই আলোচ্য দু'টি বাক্য উচ্চারিত হয়েছে। ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের প্রেক্ষিতে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) মত প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহ পাক বাঁদীকে বিবাহের ব্যাপারে তিনটি শর্তারোপ করেছেন। তন্মধ্যে দুটি শর্ত হলো বরের ব্যাপারে আর একটি হলো কণের ব্যাপারে। বরের ব্যাপারে আরোপিত দুটি শর্ত হলো ঃ

(১) যে স্বাধীনা সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বিবাহ করার সামর্থ না রাখে। পবিত্র কোরআনে তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ

(২) বিবাহ না করলে যার পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ

আর তৃতীয় শর্তটি হলো কণের ব্যাপারে তাহলো কণেকে অবশ্যই মোমেন হতে হবে।[১] পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

مِنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ.....فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ

অর্থাৎ যদি স্বাধীনা সম্ভ্রান্ত মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনের সামর্থ না থাকে তবে মোমেনা বাঁদীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও। আর সে বাঁদীর মনিব থেকে এর অনুমতি গ্রহণ কর এবং নিয়ম মাফিক তাদের দেন মোহর আদায় কর।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, এখানে বাঁদী অর্থে সর্বপ্রকার বাঁদীই বোঝানো হয়েছে (১) প্রকৃত অর্থে যে বাঁদী (২) মোকাতেবা অর্থাৎ যাকে তার মনিব বলে দিয়েছে, যদি তুমি এ পরিমাণ অর্থ নিজের মূল্য হিসেবে পরিশোধ করতে পার তবে তুমি স্বাধীন হবে। (৩) মুদাব্বেরা অর্থাৎ যে বাঁদীকে তার মনিব বলেছে, আমার মৃত্যুর পর তুমি স্বাধীন হবে। (৪) উম্মে ওয়ালাদ অর্থাৎ যার মনিবের পক্ষ থেকে কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে।

আলোচ্য আয়াতে বাঁদীর বিয়ের ব্যাপারে তার মনিবের অনুমতিকে পূর্ব শর্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ আদেশ বাঁদী এবং গোলাম উভয়ের জন্যেই। কোন গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করতে পারে না। স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, যে গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করে সে ব্যাভিচারী। (তিরমিজী শরীফ)

আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করে তার বিয়ে বাতিল।[১]

وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ

অর্থাৎ বাঁদীদেরকে তাদের দেন মোহর আদায় কর। ইমাম মালেক (রঃ) এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, দেন মোহর বাঁদীর হক্ব। দেন মোহর তার মনিব পাবে না। অথচ অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে, দেন মোহরের মালিক হবে বাঁদীর মনিব, এতে বাঁদীর কোন অধিকার নেই। আর এ আয়াতে একটি বাক্য গুপ্ত রয়েছে তাহলো-

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪০

بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ

অর্থাৎ বাঁদীদেরকে তাদের দেন মোহর আদায় কর মনিবের অনুমতিক্রমে। যেহেতু এ বাক্যটি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে তাই এখানে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা সমীচিন মনে করা হয়নি। অথবা এর তাৎপর্য এই, বাঁদীদেরকে দেন মোহর দেয়ার অর্থই হলো তাদের মনিবকে দেয়া। কেননা, গোলাম-বাঁদীর সব কিছুর মালিকই তার মনিব।

مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ

অর্থাৎ যখন বাঁদীরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখনই দেন মোহর আদায় করা অপরিহার্য হয়। কিন্ত যদি তারা ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় বা গোপন বন্ধুত্ব সম্পর্ক করে এমন অবস্থায় দেন মোহর আদায় জরুরী নয়।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, বাঁদী হলেও যারা উন্নত চরিত্রের অধিকারীনি তাদের সাথেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে এ আয়াতে। যদিও তারা এ গুণের অধিকারীনি নয় তাদের সাথেও ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে বিবাহ বৈধ হয়। কিন্তু ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে এ ব্যাভিচারিণী তওবা না করা পর্যন্ত তার সাথে বিবাহ বৈধ নয় কেননা, কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً

অর্থাৎ ব্যাভিচারী শুধু ব্যাভিচারীণীকেই বিয়ে করবে। মোমেনদের জন্যে ব্যাভিচারীণী এবং মুশরেক নারী বিয়ে করা হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ

অর্থাৎ যদি কোন বাঁদী ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তবে স্বাধীনা নারীর যে শাস্তি হয় তার অর্ধেক শাস্তি হবে বাঁদীর। এ পর্যায়ে শরীয়তের বিধান এই, যদি বিবাহিত স্বামী স্ত্রী ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তবে তাদেরকে পাথর মারার মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। আর যদি বিবাহের পূর্বে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তবে তাদের শাস্তি হলো ১০০ বেত্রাঘাত। কিন্তু গোলাম বাঁদীর বিবাহ হোক বা অবিবাহিত তারা যদি ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তবে তাদের শাস্তি হলো ৫০টি বেত্রাঘাত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আইয়াশ এবনে আবি রবিয়াহ বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে এবং আরো কয়েকজন কোরায়শ যুবককে আদেশ দিয়েছিলেন

যে, কয়েকটি বাঁদী ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছে তাদেরকে ৫০ বার বেত্রাঘাত কর। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ হে লোকসকল! তোমরাও তোমাদের গোলাম-বাঁদীর উপর শরীয়ত মোতাবেক শাস্তির বিধান জারী কর। কেননা, একটি বাঁদী যখন ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বেত্রাঘাতের মাধ্যমে শাস্তি দেয়ার জন্যে আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু আমি জানতে পারি যে, অতি সম্প্রতি তার সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে। আমি চিন্তা করলাম যদি এ মুহূর্তে তাকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হয় তবে সে মৃত্যু মুখে পতিত হবে। তাই তার প্রতি আমি বেত্রাঘাত করলাম না। বিষয়টি প্রিয়নবী সাল্লাললাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করলে তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি ভাল করেছ।

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ

অর্থাৎ যার কষ্টে নিপতিত হবার আশঙ্কা রয়েছে তারই জন্যে বাঁদী বিবাহের অনুমতি দেয়া হলো। তবুও যদি কেউ আত্ম সংযম করতে সক্ষম হয় তবে বাঁদী বিয়ে না করাই শ্রেয়। তোমরা যদি সবর অবলম্বন করতে পার তবে তা হবে তোমাদের জন্যে উত্তম এবং কল্যাণকর। কেননা, যদি স্বাধীনা রমণীর সাথে বিয়ে হয় তবে তার সন্তানও স্বাধীন হবে। যদি আত্মসংযম কঠিন হয়, ব্যাভিচারের আশঙ্কা হয় প্রবল তবে এমন অবস্থায় বাঁদী বিবাহ করাই সমীচিন।

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়বান। যে ব্যক্তি বাঁদীকে বিয়ে না করে থাকতে পারেনি আল্লাহ পাক তাকে মাফ করবেন। আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়াবান। এজন্যেই তো বাঁদীর সঙ্গে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, এতদ্বারা ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেক (রঃ)-এর কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় যে, বাঁদীর সাথে বিয়ে শুধু সে ব্যক্তির জন্যেই বৈধ যার ব্যাভিচারের লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেনঃ এ মতই পোষণ করতেন হযরত যাবের (রাঃ) এবং তাউস ও আমর এবনে দিনার (রঃ)। ইমাম আবু হানিফার (রঃ) মতে, একান্ত প্রয়োজন না হলে বাঁদী বিয়ে করা মকরুহ। ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ (রঃ)-এর মতে, বাঁদী বিয়ে করার ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে তা বৈধ অন্যথায় অবৈধ। ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে, যদি কারো নিকট স্বাধীনা স্ত্রী থাকে তবে তার উপর বাঁদীর সঙ্গে বিয়ে বৈধ নয়। ইমাম মালেক (রঃ)-এর মতে যদি স্বাধীনা স্ত্রী রাজী থাকে তবে বাঁদীর সঙ্গে বিয়ে বৈধ অন্যথায় অবৈধ। আর যদি

বাঁদী স্ত্রী থাকে তারপর স্বাধীনা রমণীকে বিবাহ করা হয় তবে তা সকল ইমামের মতেই বৈধ।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, বাঁদীদের বিবাহের ব্যাপারে বিধান পেশ করার পর

وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

বাক্যটির তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যদিও বাঁদী বিয়ে না করা উত্তম কিন্তু তোমাদের কষ্ট দূর করার লক্ষ্যে আল্লাহ পাক দয়া করে তোমাদেরকে এর অনুমতি দান করেছেন কেননা, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। তোমাদের গুনাহকে তিনি মাফ করেন, তোমাদের প্রতি তিনি দয়া করেন।[২]

يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ
سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾
وَاللّٰهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوٰتِ
أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ
الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

তরজমা

(২৬) আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন যে, তোমাদের জন্যে তাঁর বিধি-নিষেধ বর্ণনা করেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পথ তোমাদের প্রদর্শন করেন এবং তিনি ইচ্ছা করেন যেন তোমাদেরকে মাফ করেন এবং আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

(২৭) আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন যে, তোমাদেরকে মাফ করবেন এবং যারা শুধু স্বীয় কামনার অনুসরণ করে তারা তোমাদেরকে অধঃপতনের অতল গর্ভে ঠেলে দিতে চায়।

(২৮) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে তাঁর বিধি-নিষেধ সহজ করতে ইচ্ছা করেন কেননা, মানুষকে অত্যন্ত দুর্বলই সৃষ্টি করা হয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৪-৪৫
২। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬৫

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে হালাল হারাম বা বৈধ অবৈধ বিষয় সমূহ সম্পর্কে অবহিত করার ইচ্ছা করেন এবং এসব বিষয় সুস্পষ্ট ভাষায় তোমাদেরকে জানিয়ে দিতে চান যে, কি কাজে তোমাদের কল্যাণ আর কি কাজে তোমাদের অকল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর তোমাদের পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের আদর্শও তোমাদের নিকট পেশ করতে চান যেন তাদের অনুসরণের সৌভাগ্য তোমরা লাভ কর।

পূর্ববর্তী শরীয়তের বিধান সম্পর্কে

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহের কোন বিধান যদি আমাদের শরীয়তে বাতিল না হয়ে থাকে তবে সে বিধান আমাদের জন্যে বাকী রয়েছে। যদি পবিত্র কোরআন এবং সুন্নতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দ্বারা তার সত্যতা প্রমাণিত হয় তবে তার উপর আমল করাও আমাদের কর্তব্য। তবে ইহুদীরা যেসব বর্ণনা দিয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয় কেননা, তারা কাফের। এ কারণে তারা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। অবশ্য হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) এবং হযরত কা'বে আহবার (রঃ)-এর ন্যায় ব্যক্তিত্ব যারা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে বিশ্বাসযোগ্য হয়েছেন তাঁদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অধিকন্তু তোমাদেরকে ক্ষমা করাই আল্লাহ পাকের উপরোক্ত নির্দেশাবলীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে দেখতে চান তথা এসব বিধি-নিষেধ বর্ণনা করার পূর্বে তোমাদের দ্বারা যে সব পাপাচার হয়েছে সেগুলো তিনি মাফ করতে চান। অথবা এ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তওবা করার তৌফিক দিতে চান। অথবা এর অর্থ আল্লাহ পাকের মর্জি হলো, তোমরা এমন কাজ কর যা তোমাদের পাপাচারের কাফ্ফারা হয়ে যায়।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের কোন নির্দেশই অযৌক্তিক বা অহেতুক নয়। অথবা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করার মধ্যেই রয়েছে তোমাদের কল্যাণ। পক্ষান্তরে, আল্লাহর বিধি-নিষেধ অমান্য করার মধ্যেই রয়েছে তোমাদের সমূহ অকল্যাণ।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৭

সূরা নেসার ৮ খানি আয়াত

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, সূরা নেসায় ৮ খানি এমন আয়াত নাযিল হয়েছে যা এ উম্মতের জন্যে সবকিছু থেকে উত্তম।

(১) وَاللّٰهُ يُرِيْدُ

(২) يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ

(৩) اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰئِرَ

(৪) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ

(৫) وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا

(৬) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ

(৭) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الاية

(৮) وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক তোমাদের কল্যাণকর পন্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। আর তাঁর বিধান সমূহ অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ কেননা, তিনি বিজ্ঞানময়, তিনি তোমাদের ভাল-মন্দ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেন, এর অর্থ হলো বন্দার কোন প্রয়োজন এবং কল্যাণের পথ আল্লাহ পাকের অজানা নয়। অতএব, তিনি মানব জাতির জন্যে এমন বিধান প্রচার করেছেন যা হেকমতপূর্ণ এবং মানুষের প্রয়োজনের নিরীখে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১]

১। তফসীরে মাজেদী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৬

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ

মূলত আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে নেক আমলের তৌফিক দিতে ইচ্ছা করেন, ব্যাভিচারকে নিষিদ্ধ করা, ব্যাভিচারের শাস্তি ঘোষণা করা এবং বিবাহের দেন মোহর প্রভৃতি হুকুম আহকাম যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার উপর মানুষ যেন যথাযথভাবে আমল করতে পারে। এক্ষেত্রে যাতে কোন শৈথিল্য না দেখায় তার জন্যে তাগিদ স্বরূপই দ্বিতীয়বার এ বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছে। যারা ভোগবাদী বা রিপুর গোলাম তারা একান্তভাবে কামনা করে যেন তোমরা কল্যাণের পথ থেকে পুরোপুরিভাবে দূরে সরে যাও। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যাদেরকে ভোগবাদী বলা হয়েছে তারা হলো ব্যাভিচারী। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, এতদ্বারা মজুসী বা অগ্নিপূজকদের বোঝানো হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেছেন, এতদ্বারা ইহুদীদের বোঝানো হয়েছে। কেননা, তাদের মতে সম্পর্কীয় কোন ভাতিজী ভাগ্নী সবই হালাল।[১]

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ

(আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে সহজ করতে চান।)

বস্তুতঃ মানুষ স্বভাবগতভাবেই দুর্বল, তার এ দুর্বলতা সৃষ্টিগত। স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। মানুষের পক্ষে কতখানি সংযম-চর্চা করা সম্ভব, ভোগের নেশা এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মানুষ কতখানি আত্মরক্ষা করতে পারে তা আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ ভাবেই জানেন। এজন্যে আল্লাহ্ পাকের প্রতিটি নির্দেশ মানুষের অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক তোমাদের ভার লাঘব করতে চান, তোমাদের জন্যে সহজ করতে চান তাঁর বিধানকে। কেননা, মানুষকে দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এ আয়াত সম্পর্কে তফসীরকারদের দু'টি অভিমত আছে। ১. এ সহজী-করণের তাৎপর্য হলো একান্ত প্রয়োজন হলে স্বাধীন নারীর বিবাহের সামর্থ না থাকলে বাঁদী বিবাহের অনুমতি প্রদান, আর এ মত হলো মুজাহেদ এবং মোকাতেল (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারদের আর অন্যদের মতে, ২. এ আয়াত শুধু বাঁদীদের বিবাহের অনুমতি দানের ক্ষেত্রেই নয়; বরং সামগ্রিকভাবে শরীয়তের সকল বিধান সমূহের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। বস্তুতঃ উম্মতে মোহাম্মদীয়ার জন্যে এটি বিশেষ এহসান যে, এ উম্মতের জন্যে শরীয়তের বিধান অত্যন্ত সহজ করা হয়েছে। কোন কিছুই কঠিন করা হয়নি যেমন বনী ইসরাঈলের জন্যে কঠিন করা হয়েছিল।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৭

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم
بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَ
لَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ
يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ
وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ
بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَىْءٍ عَلِيمًا

তরজমা

(২৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসা ব্যতীত একে অন্যের ধন-রত্ন গ্রাস করোনা এবং একে অন্যেকে হত্যা করোনা, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান।

(৩০) এবং যে কেউ সীমা লঙ্ঘন করে জুলুম অত্যাচারে লিপ্ত হয় আমি অচিরেই তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো, আর তা আমার জন্যে অত্যন্ত সহজ কাজ।

(৩১) যদি তোমরা বড় বড় নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাক তবে আমি তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপগুলো দূরীভূত করবো এবং একটি অত্যন্ত সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করার সুযোগ প্রদান করবো।

(৩২) এবং তোমরা এমন বস্তুর আকাঙ্খা করোনা যা দ্বারা আল্লাহ্ পাক তোমাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষগণ যা উপার্জন করছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে, আর নারীগণ যা উপার্জন করছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে এবং তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার নিকটই তাঁর দানের জন্যে প্রার্থনা কর এবং আল্লাহ্ তায়ালা সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে বিবাহ সম্পর্কে যা হালাল বা হারাম তার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে, আর এ আয়াতে অর্থ সম্পদ আহরণ সম্পর্কে বিধান পেশ করা হয়েছে এবং অবৈধ ও অন্যায় পন্থায় অর্থ-সম্পদ উপার্জন না করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হারাম পন্থায় অর্থ সম্পদ আহরণ করোনা। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, 'হে মোমেনগণ! তোমরা ইসলামী শরীয়ত যেসব পন্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সে সব পন্থায় অর্থ সম্পদ আহরণ করোনা। যেমন চুরি, ডাকাতি, খেয়ানত, মিথ্যা, ধোকা, প্রতারণা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং মিথ্যা শপথ করার মাধ্যমে অর্থ সম্পদ গ্রহণ করা, সুদখোরী, জুয়াচুরি, ঘুষখোরী প্রভৃতি। শুধু পরস্পরের সন্তুষ্টির মাধ্যমেই তোমরা অর্থ সম্পদ রোজগার কর। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'ব্যবসা শুধু পরস্পরের সন্তুষ্টির মাধ্যমেই হয়'।

হযরত রাফে এবনে খোদায়েজ (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করা হলোঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সর্বাধিক পবিত্র রোজগার কোন্‌টি? তিনি এরশাদ করলেনঃ মানুষের হাতের রোজগার এবং পবিত্র ব্যবসায়। (আহমদ)

হযরত মেকদাম এবনে মাদীকারব (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নিজের হাতের রোজগারের চেয়ে উত্তম কোন রোজগার নেই। আল্লাহ্‌র নবী দাউদ (আঃ) স্বহস্তে রোজগার করে খেতেন। (বোখারী শরীফ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা যা কিছু আহার কর তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো যা তোমাদের হাত দ্বারা রোজগার কর। তোমাদের সন্তানদের রোজগারও তোমাদেরই রোজগার। (তিরমিজী ও এবনে মাজাহ)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যদি ব্যবসায়ের মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য থাকে তবে তার রোজগার পবিত্র হয়।

ক্রয় করার সময় যে বস্তু ক্রয় করবে তার নিন্দাবাদ না করা, বিক্রি করার সময় তার প্রশংসা না করা। ব্যবসায়ে কোন রকম প্রতারণা না করা এবং ক্রয়-বিক্রয়ের সময় শপথ না করা। ইমাম আহমদ (রঃ) এবং হাকেম হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি নিজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ব্যবসায়ী মাত্রই গুনাহগার।

সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ্ পাক কি ব্যবসাকে হালাল করেননি? তিনি এরশাদ করলেনঃ 'হালাল করেছেন কিন্তু ব্যবসায়ীরা বিক্রয়ের সময় শপথ করে এবং গুনাহগার হয় এবং মিথ্যা কথা বলে'।

হাকেম (রহঃ) হযরত রোফায়াহ এবনে রাফের (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন এবং তাকে সহীহ্ হাদীস বলেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ব্যবসায়ীদেরকে কেয়ামতের দিন গুনাহ্গারদের সঙ্গে উঠানো হবে। শুধু সেসব লোক ব্যতীত যারা আল্লাহ্কে ভয় করে নেক কাজ করে এবং ব্যবসায়ের সময় সত্য কথা বলে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ীর হাশর হবে নবী, সিদ্দিক, শহীদগণের সঙ্গে। নেককার ব্যবসায়ী আল্লাহ্র সাহায্য লাভ করে।

তেবরানী হযরত সাফওয়ান এবনে উমাইয়া (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেনঃ নেককার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আল্লাহ্র সাহায্য থাকে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, সত্যবাদী ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় থাকবে।

হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, পবিত্র রোজগার সেই ব্যবসায়ীদের যারা কথা বলার সময় মিথ্যা কথা বলেনা। যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেনা, যারা আমানতে খেয়ানত করেনা, যারা ক্রয়ের সময় যে জিনিস ক্রয় করে তার নিন্দাবাদ করেনা এবং বিক্রয়ের সময় সে বস্তুর প্রশংসা করেনা। যদি তারা কারো দেনাদার থাকে তবে দেনা আদায়ের ব্যাপারে টাল বাহানা করে না। আর যদি তারা পানাদার হয় তবে দেনাদারকে লজ্জা দেয় না।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো, হে মোমেনগণ! তোমরা পরস্পরের অর্থ সম্পদ বাতিল পন্থায় অর্থাৎ শরীয়ত বিরোধী পন্থায় হজম করোনা। শরীয়ত বিরোধী পন্থা যথা জুলুম করা, ছিনতাই ও মিথ্যা সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে এবং মিথ্যা শপথ করার মাধ্যমে যে ব্যবসায় হয়, তবে হ্যাঁ পরস্পরের সন্তুষ্টির মাধ্যমে যে ব্যবসায় হবে তা হালাল।[১] আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাসের (রাঃ) নিকট প্রশ্ন করা হয় যে, এক ব্যক্তি একটি কাপড় ক্রয় করে এবং বলে, যদি এ

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৯

কাপড়টি আমার পছন্দ হয় তাহলে নিয়ে নেব, আর যদি পছন্দ না হয় তবে এ কাপড়টি এবং তার সাথে এক দেরহাম ফেরত দেব। এ ব্যবসা কি বৈধ হবে? তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন। অর্থাৎ এমনি ব্যবসাকে বাতিল ব্যবসা বলে পরিগণিত করলেন, অতঃপর তিনি বললেনঃ এ আয়াত খানি মোহকাম, মনসুখ নয় তথা এর মর্ম বাতিল হয়নি আর কেয়ামত পর্যন্ত বাতিল হবে না। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন মুসলমানগণ এতে অন্যের বাড়ীতে পানাহার পর্যন্ত বন্ধ করে দেন। অতঃপর কোরআনে করীমের অন্য একখানি আয়াত নাযিল হওয়ার পর এ অবস্থার অবসান ঘটে।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, ক্রয়-বিক্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত শুদ্ধ হয় না।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ের অধিকার সংরক্ষিত থাকে যতক্ষণ তারা একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ না করে।[১] যাহোক, পরস্পরের সম্মতিক্রমে অনুষ্ঠিত ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে একে অন্যের সম্পদ গ্রহণ করা বৈধ যদি তাতে শরীয়ত সম্মত যাবতীয় শর্ত পাওয়া যায়।

এ পর্যন্ত অর্থ সম্পদ সম্পর্কে নির্দেশ ছিল, এরপর শারীরিক ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কে বিধান পেশ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করোনা। যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ

অর্থাৎ সারা পৃথিবীর সমস্ত মোমেনগণ যেন একই ব্যক্তি। অতএব, কোন মোমেনকে হত্যা করা যেন নিজেকেই হত্যা করা। আরব দেশে প্রবাদ রয়েছে যদি কাউকে হত্যা করা হতো তখন তারা বলতো–

قُتِلْنَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

কা'বার প্রতিপালকের শপথ, আমাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। অতএব, আয়াতের অর্থ হলো– 'এবং তোমরা একে অন্যকে হত্যা করোনা'। নিশ্চয় আল্লাহ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫, পৃষ্ঠা-১৫

পাক তোমাদের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়, আর করুণার কারণেই তিনি তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

আর যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে তথা হত্যা করবে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করে এবং জুলুম করবে আল্লাহ্ পাক অদূর ভবিষ্যতে তাতে দোযখের শাস্তি দেবেন। আর এ কাজ আল্লাহ্ পাকের জন্যে অত্যন্ত সহজ।

আত্মহত্যা করোনা

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এর অর্থ হলো তোমরা আত্মহত্যা করোনা অথবা তোমরা কেউ নিজেকে হত্যা করোনা। এ পর্যায়ে তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কয়েক খানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত সাবেত এবনে যাহ্যাক (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তাকে সেই জিনিস দ্বারাই শাস্তি দান করবেন। (বগবী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবে সে সর্বদা জাহান্নামে পড়তেই থাকতে। এবং যে ব্যক্তি কোন লৌহ দ্বারা আত্মহত্যা করবে সে সেই লৌহখণ্ড হাতে নিয়েই দোযখে প্রবেশ করবে এবং সর্বদা সে নিজেকে লৌহ দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। ভাষার সামান্য পরিবর্তনসহ এই হাদীস বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিজী শরীফ এবং নেসায়ী শরীফেও সংকলিত হয়েছে। আর আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় রয়েছেঃ যে ব্যক্তি বিষ পান করবে সে দোযখেও বিষ পান করতে থাকবে।

হযরত যন্দব এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বিগত উম্মত সমূহের মধ্যে এক ব্যক্তির একটি হাত যখম হয়। সে তার কষ্ট সইতে না পেরে ছুরি দিয়ে নিজের হাতটি কেটে ফেলে এবং মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত তার রক্তপাত বন্ধ হয়নি। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমার বন্দা প্রাণ দেয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেছে, আমি তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দিয়েছি।

ইমাম আবু দাউদ, এবনে হাব্বান এবং হাকেম লিখেছেন যে, বিখ্যাত সাহাবী হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ) অতি শীতের সময় তৈয়ম্মুমের বৈধতার দলিল হিসেবে এ আয়াতকে পেশ করেছেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার প্রতিবাদ করেননি। হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার তীব্র শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়ে যায়। আমরা তখন জাতুস সালাসে জেহাদে

ছিলাম। আমার আশঙ্কা হলো এই তীব্র শীতের মধ্যে যদি গোসল করি তবে মরে যাব। সেজন্যে তৈয়ম্মুম করে নামাজ আদায় করে নিলাম। যখন এ ঘটনার উল্লেখ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসালামের সম্মুখে হলো তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি জানাবাতের অবস্থায় সাথীদের নামাজ পড়িয়েছ? আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ

"এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করোনা"। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার এ জবাব শ্রবণ করে আর কিছু বলেননি।

হাসান, একরামা, আতা এবনে আবি রবা এবং সুদ্দী প্রমুখ তফসীরকারগণের মতে, এ বাক্যটির অর্থ হলো তোমরা পরস্পর একে অন্যকে হত্যা করোনা। যেমন অন্য আয়াতেও এ মর্মে নির্দেশ রয়েছেঃ

ثُمَّ أَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ

"অথবা তোমরা সে সব লোক যারা পরস্পর একে অন্যকে হত্যা কর" অর্থাৎ নিজের দ্বীনি ভাইকে হত্যা করোনা। শেরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কোন মুসলমানকে হত্যা করা।

হযরত জরীর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেনঃ আমি মানুষকে শুনিয়ে দিতে চাই তোমরা যেন আমার পর কার্যতঃ কাফের না হয়ে যাও, একে অন্যকে হত্যা করতে শুরু করো, অর্থাৎ একে অন্যকে হত্যা করোনা কেননা, এটি কুফরী কাজ। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলেম আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, আয়াতের অর্থ হলো অন্যায় পন্থায় অর্জিত অর্থ সম্পদ ভোগ করে নিজেকে ধ্বংস করোনা। এ তফসীরেরও দুটি অর্থ রয়েছে।

(১) অন্যায় পন্থায় অর্জিত অর্থ-সম্পদ ভোগকারী নিজেকেই ধ্বংস করে কেননা, আখেরাতে তাকে এজন্যে দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

(২) কারো অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে ভোগ করা তাকে ধ্বংস করার সমতুল্য। কেননা, এতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১]

অতঃপর এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান"।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫১-৫২

বস্তুতঃ তাঁর অনন্ত অসীম দয়ার কারণেই তো তিনি মানুষকে নেক কাজের নির্দেশ দেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার তাগিদ করেন।

উম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রতি দয়া

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলেম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ পাক বনী ইসরাঈল জাতির তওবার পন্থা নির্দেশ করেছেন এভাবে যে, তারা একে অন্যকে হত্যা করবে। কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রতি দয়া করে কঠিন পন্থা রহিত করেছেন এবং তওবার জন্যে এ পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন যে, কৃত অন্যায়ের জন্যে আন্তরিকভাবে লজ্জিত হও, ভবিষ্যতেও এমন অন্যায় না করার শপথ গ্রহণ কর, আর আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ

আর যে এমন অন্যায় কাজ করবে তথা কারো অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে হজম করবে অথবা অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে ইচ্ছাকৃতভাবে (ভুল করে নয়) এবং জুলুম করে তবে আখেরাতে তাকে দোযখের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে এবং কোন মানুষকে হত্যা করা হালাল মনে করে তার জন্যে চিরস্থায়ী শাস্তির ঘোষণা রয়েছে এ আয়াতে। কিন্তু যারা এ অন্যায় কাজকে হালাল মনে করেনা, বরং অন্যায় ও হারাম মনে করেও এমন অন্যায় করে ফেলে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী শাস্তি নয়; বরং তারা দোযখের শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হবে। আল্লাহ্ পাকের মর্জি হলে তিনি ক্ষমা করতে পারেন অথবা শাস্তি দিতে পারেন।

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ

কবীরা গুনাহ্ প্রসঙ্গে

যদি তোমরা বড় বড় পাপ কাজ থেকে বিরত থাক তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ কার্যকে দূরীভূত করবেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) হযরত আলীর (রাঃ)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, কবীরা গুনাহ (মহা পাপ) হলো সে গুনাহ্ যার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ্ পাক দোযখী হওয়ার বা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার অথবা তাকে লা'নত করার বা শাস্তি দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। আর কবীরা গুনাহ্র ব্যাখ্যা করে যাহ্যাক (রঃ) বলেছেনঃ যে গুনাহ্র ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে শাস্তি বিধান করেছেন অথবা আখেরাতে শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন তাকেই কবীরা গুনাহ্ বলা হবে। আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) বলেনঃ

কবীরা গুনাহর তিনটি স্তর

(১) সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হলো আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তাকে মিথ্যা জ্ঞান করা, এসবই শেরকের অন্তর্ভুক্ত আর এগুলো মহা পাপ বা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হলো কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করা এবং আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভীক থাকা এবং আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হওয়া। তেবরানী এ মর্মে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কবীরা গুনাহ কি?

তিনি এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বা এবং গুণাবলীতে কোন কিছুকে শরীক করা, আর আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহ পাকের গোপন শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক হওয়া।

(২) কবীরা গুনাহর দ্বিতীয় স্তর হলো এমন গুনাহ যার দ্বারা আল্লাহর বন্দাদের প্রাণ অথবা সম্পদ অথবা সম্মানের ক্ষতি হয়। হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেছেন, কবীরা গুনাহ হলো এমন গুনাহ যার কারণে তোমাদের এবং আল্লাহর বন্দাদের মধ্যকার হক্ব বিনষ্ট হয়।

(৩) তিনি আরো বলেছেনঃ এটি আল্লাহর হক্ব বিনষ্ট করার চেয়েও বড় গুনাহ। কেননা, আল্লাহ পাক যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর রহমতের সম্মুখে সব কিছুই ক্ষুদ্র। অতএব আল্লাহ পাক তাঁর হক্ব বিনষ্টকারী গুনাহ সমূহ মাফ করবেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরয করেছিলেনঃ হে আল্লাহ! আমার গুনাহর চেয়ে তোমার মাগফেরাত অনেক বড়, অনেক বিস্তৃত। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছিলেনঃ

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ

(আমার রহমত সমস্ত কিছুকে ছেয়ে আছে।) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের নিকট তিনটি রেজিষ্টার রয়েছে।

(১) এতে এমন গুনাহর উল্লেখ রয়েছে যা আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে সেগুলো ক্ষমা করতেও পারেন।

(২) এতে এমন গুনাহর উল্লেখ রয়েছে যা আল্লাহ পাক ক্ষমা করবেন না।

(৩) এতে এমন গুনাহর উল্লেখ রয়েছে যা আল্লাহ্ পাক নিজে ক্ষমা করবেন না।

প্রথম রেজিষ্টারের গুনাহ সমূহ যেমন রোজা না রাখা, নামাজ আদায় না করা– এসব গুনাহ ক্ষমা করা না করা আল্লাহ্ পাকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন।

দ্বিতীয় রেজিষ্টার যার কোন গুনাহ মাফ করা হবে না তা হলো শেরক। শেরকের গুনাহ কোন অবস্থাতেই মাফ করা হবে না। পবিত্র কোরআনের আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাঁর সাথে শেরক করাকে মাফ করবেন না, এর কম হলে মাফ করতেও পারেন"।

আর তৃতীয় রেজিষ্টারে মানুষের পরস্পরের হক্ব বিনষ্ট করার কথা রয়েছে। আল্লাহ পাক বন্দার হক্ব মাফ করবেন না তবে বন্দা যদি নিজে তার হক্ব মাফ করে দেয় তবে ভাল। যদি বন্দা মাফ না করে তবে অবশ্যই বদলা দিতে হবে। (আহমদ, হাকেম)

তেবরানী এ মর্মের হাদীস সংকলন করেছেন যার বর্ণনাকারী হলেন হযরত সালমান (রাঃ) এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)।

হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন একজন ঘোষক আরশের তলদেশে থেকে এ ঘোষণা করবেঃ হে উম্মতে মোহাম্মদ! নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক সকল মোমেন নারী পুরুষের গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন, তোমরা পরস্পর একে অন্যের হক্ব মাফ করে দাও। আর আমার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ কর। (বগবী)

হযরত উসামা এবনে সোরায়েক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সহযাত্রী হয়ে হজ্জ করতে বের হলাম। লোকেরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বিভিন্ন প্রশ্ন করছিল। কেউ বলছিল ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তওয়াফের আগে সাঈ করে ফেলেছি। আর কেউ বলেছে আমি অমুক কাজ আগে করে ফেলেছি বা পরে করেছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাব দিয়েছিলেন, এতে কোন গুনাহ নেই। তবে গুনাহ সে

ব্যক্তির যে অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের অর্থ-সম্পদ হজম করে ফেলেছে। সে পাপে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয় (অর্থাৎ অসন্তুষ্ট করে), দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের লা'নত রয়েছে আর আল্লাহ্ পাক তাদের জন্যে অত্যন্ত অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। যারা মুসলমান নারী পুরুষকে কোন বিনা অপরাধে কষ্ট দেয় তারা নিজেদের উপর সুস্পষ্ট পাপের বোঝা তুলে নেয়"।

এ আয়াতে উভয় প্রকার কবীরা গুনাহর বর্ণনা রয়েছে। প্রথম আয়াতে কুফর বা আল্লাহর নাফরমানীর কথা, দ্বিতীয় আয়াতে মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচারের কথা। আলোচ্য আয়াতে প্রথমে অন্যায়ভাবে কারো অর্থ সম্পদ হজম না করার এবং পরস্পরকে হত্যা না করার তাগিদের মাধ্যমে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের প্রতি জুলুম তা অর্থ সম্পদের ব্যাপারেই হোক অথবা মানুষের জীবনের ব্যাপারেই হোক উভয়টিই অত্যন্ত বড় পাপ। যে সব হাদীসে কবীরা গুনাহর উল্লেখ রয়েছে সেখানে বিশেষভাবে মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচার এবং আল্লাহর সাথে শেরকের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কবীরা গুনাহ্ হলো আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, মিথ্যা শপথ গ্রহণ করা।

এবনে মরদবিয়া হযরত আনাসের (রাঃ) বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলছেনঃ কবীরা গুনাহ্ ৭টি। তন্মধ্যে পূর্বোল্লেখিত হাদীসে চারটির উল্লেখ করা হয়েছে। আর তিনটি হলো কোন সতী নারীর প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়া, এতীমের অর্থ সম্পদ হজম করা, সুদখোরী, আর জেহাদ থেকে পলায়ন করা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ৭টি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে আত্মরক্ষা কর। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, সেগুলো কি কি? তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা, যাদু করা, এমন লোককে হত্যা করা যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ পাক

অবৈধ ঘোষণা করেছেন, সুদখোরী, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা, জেহাদের দিন জেহাদ থেকে পলায়ন করা, মোমেনা সতী নারীর প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়া। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আরজ করলো ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্‌টি? তিনি এরশাদ করলেনঃ কোন কিছুকে আল্লাহর ন্যায় মনে করা অথচ তোমাকে আল্লাহ্ পাকই সৃষ্টি করেছেন। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো এরপর কি? তিনি এরশাদ করলেনঃ নিজের সন্তানকে এজন্যে হত্যা করা যে, সে তোমার রুজিতে অংশীদার হবে। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো এরপর কোন্ অপরাধটি বড়? তিনি এরশাদ করলেনঃ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যাভিচার করা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একথার সত্যায়ন করেছেন আল্লাহ্ পাক এভাবে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ

"এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে উপাস্য হিসেবে ডাকে না, যারা এমন কোন লোককে হত্যা করে না যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ পাক হারাম করে দিয়েছেন, আর যারা ব্যাভিচার করেনা"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সব চেয়ে বড় গুনাহর মধ্যে একটি হলো নিজের পিতা মাতাকে গালি দেয়া। একজন প্রশ্ন করলো পিতা-মাতাকে কিভাবে গালি দেয়া হয়? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষ কোন লোকের পিতাকে গালি দেয় তখন সেও তার পিতাকে গালি দেয়। মানুষ কারো মাকে গালি দেয় সেও তার মাকে গালি দেয়। (বগভী)

হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি কি তিনটি সবচেয়ে বড় গুনাহর কথা বলবো না? সাহাবা আরজ করলে, ইয়া রসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা। পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া। একথাগুলো এরশাদ করার সময় তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। এরপর উপবিষ্ট হলেন এবং এরশাদ করলেন, তোমরা শ্রবণ কর, আর মিথ্যা কথা বলা। শ্রবণ কর, মিথ্যা কথা বলা, শ্রবণ কর মিথ্যা কথা বলা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথাটিকে তিন বার এরশাদ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন তখন আমাদের ধারণা হলো প্রিয়নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এখন নীরব হবেন। কেননা, কথাটি আমরা সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করেছি। (বোখারী)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিথ্যা কথা বলা সম্পর্কে যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন এর কারণ হলো, মিথ্যাবাদীতা শুধু একটি মহা পাপই নয়; বরং বহু মহা পাপের কারণ এবং উপকরণ এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর সাথে শেরক করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, মিথ্যা শপথ করা, ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়া, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাণী সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা প্রভৃতি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কথা বলে সে যেন দোযখে তার ঠিকানা করে নেয়। (বোখারী শরীফ) কোন ফাসেক ব্যক্তির প্রশংসা করাও এক প্রকার মিথ্যাবাদীতা। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন কোন ফাসেক ব্যক্তির প্রশংসা করা হয় তখন আল্লাহ্ পাক রাগান্বিত হন এবং তাঁর আরশে কম্পন সৃষ্টি হয়। (বায়হাকী)

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, মোমেন ব্যক্তি মানুষের প্রতি দোষারোপকারী হয়না, কারো প্রতি অভিশাপ দেয় না, অশ্লীল কথা বলেনা, নির্লজ্জ্ব হয় না। (তিরমিজী)

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হয় মোমেন কি কাপুরুষ হয়? তিনি এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, মোমেন কি কৃপণ হয়? তিনি এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ, হয়। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, মোমেন কি মিথ্যাবাদী হয়? তিনি এরশাদ করলেনঃ না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মুনাফেকের তিনটি নিদর্শন যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে।

১. কথা বলার সময় মিথ্যা বলে,

২. অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে,

৩. তার নিকট আমানত রাখা হলে সে খেয়ানত করে (মুসলিম ও বোখারী)।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, চারটি বিষয় যার মধ্যে রয়েছে সে খাঁটি মুনাফেক হবে। যার মধ্যে তার একটি কথা থাকবে তার মধ্যে নেফাকের একটি চরিত্র থাকবে যে পর্যন্ত না সে উক্ত চরিত্র বর্জন করে। যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় তখন তাতে সে খেয়ানত করে আর মিথ্যা কথা বলে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং ঝগড়ার সময় অশ্লীল কথা বলে।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, তোমরা এমন কিছু কাজ কর যা তোমাদের নিকট চুলের চেয়েও সরু (তথা ক্ষুদ্র) কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা এমন কাজকেও অত্যন্ত বড় বিপজ্জনক মনে করতাম। (বোখারী) এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, কবীরা গুনাহ শুধু সাতটিই নয়; বরং অনেক বেশী। যে ব্যক্তি কোন গুনাহকে সগীরাহ মনে করে তাতে লিপ্ত থাকে তা কবীরায় পরিণত হয়।

এবনে আবি হাতেম লিখেছেন, সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করেছেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কবীরা গুনাহ কি শুধু সাতটিই? তিনি বলেছিলেন, সাতশ'র কাছাকাছি। কিন্তু যদি তওবা এস্তেগফার করা হয়, আল্লাহ পাক যদি তা কবুল করেন তবে কবীরা আর কবীরা থাকে না। পক্ষান্তরে যদি কেউ নিত্য সগীরা গুনাহ করতে থাকে তবে তা সগীরা থাকে না; বরং কবীরাহে রূপান্তরিত হয়। তিনি আরো বলেছেন, যে আমল দ্বারা আল্লাহর নাফরমানী করা হয় তাই কবীরা গুনাহ। অতএব, যে এমন কোন আমল করে তার কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা এস্তেগফার করা। কেননা, করুণাময় আল্লাহ পাক এ উম্মতের কাউকে সর্বদা দোযখে রাখবেন না। তবে যে দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয় অথবা যে কোন ফরজ কাজের ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করে, অথবা তকদীরকে না মানে তার কথা আলাদা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথা বলেছেন যে, এস্তেগফার করা হলে কবীরা গুনাহ মাফ হয়। এতদ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো সেই কবীরা গুনাহর কথা যার সম্পর্ক আল্লাহ পাকের হক্বের সঙ্গে, আর যে সব কবীরা গুনাহর সম্পর্ক মানুষের হক্বের সঙ্গে সেগুলো থেকে ক্ষমা লাভের জন্যে শুধু তওবা এস্তেগফার করা যথেষ্ট নয়, বরং যাদের হক্ব তাদের নিকট তা আদায় করা এবং কারো প্রতি জুলুম করা হলে মজলুমকে রাজী করাও একান্ত জরুরী।[১]

বস্তুতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এরশাদ করেছেনঃ

كلكم خطاؤن وخير الخطائين التوابون

অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকেই গুনাহগার তবে ভাল গুনাহগার সে যে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা এস্তেগফার করে। এতদ্বারা তওবা এস্তেগফার করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং একই মজলিশে একশ' বার পর্যন্ত এস্তেগফার পড়তেন অথচ তিনি ছিলেন

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৩-৬০

সম্পূর্ণ নিঃষ্পাপ। একথা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, তিনি এ আমল করতেন উম্মতকে শিক্ষা দিতে তথা তওবা এস্তেগফার করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে। এ পর্যায়ে তাঁর আরও একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এরশাদ করেছেনঃ শপথ সেই পবিত্র সত্তার যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! যদি তোমরা গুনাহ্ না কর তবে আল্লাহ্ পাক এমন লোকদের সৃষ্টি করবেন যারা গুনাহ্ করবে এবং ক্ষমা প্রার্থী হবে এবং আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন। এই হাদীস দ্বারাও তওবা এস্তেগফারের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

মূলতঃ সমস্ত পাপাচারের বুনিয়াদ হলো মনের কঠোরতা। মনের কঠোরতার কারণেই মানব অন্তর জিকর থেকে গাফেল হয় এবং কুপ্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ হয়। এতদ্বারাও মানবতা বিরোধী কাজ সম্ভব হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষের অভ্যন্তরে একটি গোশ্ত খণ্ড রয়েছে যদি ঐ খণ্ডটি ঠিক হয় তবে সারা শরীর ঠিক থাকে। পক্ষান্তরে যদি সেই গোশ্ত খণ্ডটি বিনষ্ট হয় তবে তার সারা শরীরই বিনষ্ট হয়ে যায়। মনে রেখ সে গোশ্ত খণ্ডটি হলো অন্তর।

আয়াতের মর্মকথা

যাহোক, এ আয়াতের অর্থ হলো যদি তোমরা কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাক তবে আমি তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুনাহ্ সমূহ তোমাদের থেকে দূর করে দেব তথা ক্ষমা করবো এবং তোমাদেরকে অতি সম্মানিত স্থানে তথা জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ দেব।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে অনেক হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তার মধ্যে দু' একটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। মসনদে আহমদে রয়েছে হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তুমি কি জান জুমআর দিনের তাৎপর্য কি? আমি আরয করলাম, এটি সেদিন যেদিন আল্লাহ পাক আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। তখন তিনি এরশাদ করেছেন শোন, আমি যা জানি তা এখন শোন। যে ব্যক্তি জুমআর দিন ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন করে জুমআর নামাজের জন্যে হাযির হয় এবং নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকে তার এ আমল পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত সংগঠিত গুনাহ্ সমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়, যদি সে হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকে।

এবনে জরীরে রয়েছে, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খোতবা দানের সময় এরশাদ করলেনঃ সেই আল্লাহর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, কথাটি তিনি তিনবার বললেন। এরপর তাঁর মাথা মোবারক নীচু করে রাখলেন, আমরা সকলেই মাথা নীচু করে ফেললাম। অনেক লোক ক্রন্দন করতে লাগলো।

আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হলাম যে, আল্লাহই জানেন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন্ কথার প্রতি শপথ করলেন, আর কেনইবা নীরব হয়ে রইলেন। একটু পরে তিনি মাথা মোবারক উত্তোলন করলেন। তখন তাঁর চেহারা মোবারক অত্যন্ত আনন্দিত হল। তার আনন্দ দেখে আমরাও এত আনন্দিত হলাম যে, যদি আমরা লাল বর্ণের উট পেতাম তবে এত আনন্দিত হতাম না।

এরপর তিনি এরশাদ করলেনঃ যে বন্দা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, রমজানের রোজা রাখে এবং যাকাত আদায় করে এবং সাতটি কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে (এ সাতটি কবীরা গুনাহর উল্লেখ ইতিপূর্বে হয়েছে) তবে জান্নাতের সকল দ্বার উম্মুক্ত করা হবে। আর তাকে বলা হবে শান্তিপূর্ণ ভাবে যে দ্বারে ইচ্ছা প্রবেশ কর।[১]

বর্ণিত আছে যে, বিদায় হজ্জে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহর ওলী সে ব্যক্তি যে নামাজী, যে পাঁচ ওয়াক্ত নিয়মিত নামাজ আদায় করে, রমজান শরীফের রোজা রাখে এবং ফরজ মনে করে সওয়াবের নিয়তে সন্তুষ্ট চিত্তে যাকাত আদায় করে এবং সমস্ত কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে যেসব গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল ইয়া রসূলাল্লাহ! কবীরা গুনাহ কি? তিনি এরশাদ করলেন, (১) শেরক করা (২) হত্যা করা (৩) জেহাদের রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করা (৪) এতিমের মাল ভক্ষণ করা (৫) সুদখোরী (৬) চরিত্রবান ব্যক্তির প্রতি অপবাদ দেয়া। (৭) পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া (৮) বায়তুল্লাহ শরীফের সম্মান বিনষ্ট করা যা জীবন মরণে তোমাদের কেবলা। শ্রবণ কর যে ব্যক্তি মৃত্যু পর্যন্ত এসব গুনাহ থেকে দূরে থাকে এবং নামাজ ও যাকাত নিয়মিত আদায় করে সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জান্নাতে স্বর্ণ নির্মিত মহলে বাস করবে। হযরত তাইল্সা এবনে বেনয়াস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমার দ্বারা একটি গুনাহ হয়েছিল, আমি তাকে কবীরা গুনাহ মনে করতাম। আমি হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর নিকট তার উল্লেখ করলে তিনি বললেনঃ কবীরা গুনাহ নয়টি (১) আল্লাহর সাথে শেরক করা, (২) কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা (বৈধ কারণ ব্যতীত) (৩) যুদ্ধ ক্ষেত্রে ইসলামের দুশমনকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা, (৪) সতী নারীর প্রতি অপবাদ দেয়া, (৫) সুদখোর, (৬) এতিমের সম্পদ অন্যায় ভাবে কুক্ষিগত করা, (৭) বায়তুল্লাহ শরীফে কুফর ও শেরক প্রচার করা, (৮) যাদুকে বৈধ মনে করা, (৯) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। হযরত তাইল্সা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এ বর্ণনার পরও হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫ খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩

দেখলেন যে, আমার ভয় এখনও কমেনি। তখন তিনি বললেন, তোমার অন্তরে দোযখের অগ্নির ভয় এবং জান্নাতের আকাঙ্খা রয়েছে কি? আমি বললাম জ্বী-হ্যাঁ, অনেক বেশী, তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত? আমি বললাম শুধু মাতা জীবিত আছেন, তিনি বললেন, তুমি তোমার মাতার সঙ্গে বিনম্রভাবে কথা বল এবং তাঁকে খাবার পৌঁছাতে থাক এবং পূর্বে উল্লেখিত কবীরা গুনাহ্ সমূহ থেকে আত্মরক্ষা করতে থাক, নিশ্চয় তুমি জান্নাতে যাবে।[১]

তাই আল্লাহ পাক পরবর্তী বাক্যে এরশাদ করেছেনঃ

نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا

অর্থাৎ যদি তোমরা কবীরা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা কর তবে আমি তোমাদের ক্ষুদ্র গুনাহ সমূহ দূরীভূত করব তথা মাফ করে দেব। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জুমআর নামাজ আরেক জুমআ পর্যন্ত যত সগীরা গুনাহ হয়, নামাজের বরকতে মাফ হয় যদি সে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে। (মুসলিম শরীফ)

(আর তোমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবো।)

আলোচ্য আয়াতের মর্ম এই যে, যারা কবীরা গুনাহ বা মহা পাপ সমূহ পরিহার করে নিজেকে অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে, যেমন পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۞ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى

"অতঃপর তার প্রতিপালকের দরবারে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং রিপুর তাড়না চরিতার্থতায় নিজেকে বিরত রাখে, বেহেশতই হবে তার ঠিকানা"।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ

শানে নুযুল

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে মুজাহেদ (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) আরয করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ! পুরুষ লোকেরা তো জেহাদ করে

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫ খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৪

আমরা জেহাদ করিনা, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষের হক্ব আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ, যদি আমরা পুরুষ হতাম তবে আমরাও জেহাদ করতাম এবং আমাদের উত্তরাধিকারও তাদের সমান হতো, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (তিরমিজী)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, যখন উত্তরাধিকার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হলোঃ

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

স্ত্রীলোকরা বলতে লাগলো, পুরুষরা শক্তিশালী আমরা দুর্বল, আমাদের প্রয়োজন তাদের চেয়ে অধিক, আমাদের চেয়ে তাদের রোজগারের শক্তি অধিকতর, এজন্যে উত্তরাধিকারের অধিকার আমাদের বেশী হওয়া উচিত, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

কাতাদা এবং সুদ্দী বলেছেন, যখন

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

আয়াতখানি নাযিল হয় তখন পুরুষরা বলতে লাগলো, আমরা আশা করি আখেরাতে আমাদের সওয়াবও স্ত্রীলোকদের নেক আমলের দ্বিগুণ হবে যেভাবে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে স্ত্রীলোকদের চেয়ে দ্বিগুণ অংশ দান করেছেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক যদি নিজ দয়ায় কাউকে কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব এবং বৈশিষ্ট্য দান করেন তবে তোমরা তাতে লোভ করোনা। কেননা, এমন লোভ-লালসা অন্যায় অবৈধ। অতএব, নিন্দনীয় আর পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ এর কারণ। এতদ্ব্যতীত এমন লোভ-লালসায় আল্লাহ পাকের বিচার বিবেচনার পরোক্ষ প্রতিবাদ থাকায় তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রত্যেকের কর্তব্য হল সৎ-কাজে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করা। আল্লাহর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হওয়া, শুধু এভাবে আখেরাতে সওয়াব বৃদ্ধি পাবে।

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে যেমন কাজ করবে তেমন ফল ভোগ করবে, এতে কোন কমতি হবে না। কার প্রাপ্য কম পেল এমন কোন অভিযোগের সুযোগ থাকবে না। প্রত্যেককে তার প্রাপ্য দেয়া হবে একথা চির সত্য। কারো হক্ব কম হবে না। এরপর আল্লাহ পাক যদি স্বীয় দান স্বরূপ কাউকে কোন শ্রেষ্ঠত্ব এবং বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন তবে তাতে কারো অভিযোগ করার কিছুই থাকে না। মূলতঃ পুরুষদের জন্যে তাদের আমলের সওয়াব নির্দিষ্ট এবং স্ত্রীলোকদের জন্যে তাদের আমলের সওয়াব নির্ধারিত। পুরুষরা আল্লাহর রাহে জেহাদ করে এবং গনীমতের তথা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ লাভ করে, ব্যবসা-বাণিজ্য করে তার লাভ অর্জন করে। এমনিভাবে স্ত্রীলোকেরা

স্বামীদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং সন্তান-সন্ততি প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করে। প্রত্যেকের জন্যে তার আমলের সওয়াব বা শুভ পরিণতি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে নির্দিষ্ট রয়েছে। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হল আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা।

وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ পাকের নিকট তাঁর দানের জন্যে প্রার্থনা কর। আল্লাহ্ পাকের দান অনন্ত অসীম। আল্লাহ্ পাক একটি নেকীর সওয়াব ১০ থেকে ৭০০শ' গুণ পর্যন্ত দান করে থাকেন। বরং তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে বে-হিসাব দিয়ে থাকেন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দুনিয়ার রিয্ক বৃদ্ধি করে দেন, রিয্কে বরকত দান করেন। অতএব, রিয্ক বৃদ্ধির পন্থা হিংসা-দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা নয়, বরং আল্লাহ্ পাকের দরবারে কামনা করা।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا

আল্লাহ্ পাক খুব ভালভাবেই জানেন কে কত পরিমাণের যোগ্য, আর সে যোগ্যতা আনুসারেই তিনি দান করে থাকেন। অতএব, এ পর্যায়ে অভিযোগ করা বা মনক্ষুন্ন হওয়া নিজেদের জ্ঞানের দৈন্য এবং বিচার বিবেচনা হীনতারই বহিঃপ্রকাশ।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক খুব ভালভাবেই জানেন কাকে সম্পদশালী করা উচিত আর কাকে দরিদ্র রাখা উচিত। কে আখেরাতের নেয়ামতের যোগ্য, আর কে শাস্তির উপযুক্ত। তাই আল্লাহ্ পাক তাঁর বিচার মোতাবেক প্রত্যেককে দান করে থাকেন।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫ খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৯

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ
الْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝ اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ
بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ
فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِيْ
تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

তরজমা

(৩৩) পিতা মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্যে আমি উত্তরাধিকারী করেছি, এবং যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদের অংশ দাও, আল্লাহ্ পাক সব কিছুই প্রত্যক্ষকারী।

(৩৪) পুরুষগণ নারীদের উপর ক্ষমতাবান। কেননা, আল্লাহ্ পাক তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ স্ত্রীদের জন্যে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। অতএব, নেককার স্ত্রীগণ (তাদের স্বামীদের) অনুগত হয়, তারা স্বামীদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্ তায়ালার সংরক্ষিত বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং যে সব স্ত্রীদের অবাধ্যতা সম্পর্কে তোমরা আশঙ্কা কর তাদেরকে উপদেশ দান কর এবং তাদেরকে দূরে রাখ শয্যাস্থান থেকে এবং তাদেরকে মৃদু প্রহার কর। অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করোনা, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মহান, শ্রেষ্ঠতম।

তফসীরুল কোরআন

উত্তরাধিকার সম্পর্কে

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে।

(১) পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে প্রত্যেকেরই যথাযোগ্য উত্তরাধিকার নির্ধারিত রয়েছে। অতএব, কারো ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ নেই। এমন অবস্থায় প্রশ্ন হবে ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী কারা? তার জবাবেই পরবর্তী বাক্যটি এরশাদ হয়েছে।

অর্থাৎ ওয়ারিশ হলো পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজন। (২) অথবা এর অর্থ হলো পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যা কিছু পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে রেখে যায়, তার প্রত্যেকটির জন্যেই আমি ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী করে দিয়েছি।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ এ আয়াতের অর্থ হলো হে লোক সকল! তোমাদের পরলোকগত পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন যে ধন-সম্পদ রেখে যায় তাতে তোমাদের প্রত্যেককে আমি ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী করেছি। আর তোমরা কারো সাথে চুক্তি সূত্রে আবদ্ধ হও বা কারো সঙ্গে অঙ্গীকার কর তথা কাউকে কথা দিয়ে থাক, তবে সে অঙ্গীকার অবশ্যই পালন কর এবং প্রত্যেকের প্রাপ্য যথাযথভাবে পৌঁছে দাও।[২] প্রাক-ইসলামী যুগে পরস্পরের মধ্যে এমন অঙ্গীকার করা হতো যে, আমি যার সাথে লড়াই করব তুমিও তার সাথে লড়াই করবে। আমি যার সাথে চুক্তি করব তুমিও তার সাথে চুক্তি করবে। এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের কারণে তারা একে অন্যের ওয়ারিশ হিসেবে পরিগণিত হতো।

ইসলামের প্রথম যুগের সমস্যা

ইসলামের প্রথম যুগে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে মানুষ একাকী হাযির হয়ে ইসলাম কবুল করতেন। তখন তিনি তাদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের কথা ঘোষণা করতেন। এভাবে তারা একে অন্যের সাথে ভ্রাতৃত্ব সূত্রে গ্রথিত হতেন এবং একে অন্যের ওয়ারিশ হতেন।[৩]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বোখারী শরীফের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তাঁর মতে আলোচ্য আয়াতের مَوَالِىَ শব্দটির অর্থ হলো ওয়ারিশ। আর

وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ

এর অর্থ হলো মদীনা মোনাওয়্যারায় হিযরতের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসী মুসলমান তথা আনসারদের সাথে মুহাজেরদেরকে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তখন প্রত্যেক মুহাজের তাঁর আনসার ভ্রাতার উত্তরাধিকারী হতো। অবশ্য এ আয়াত দ্বারা সে বিধান বাতিল হলো। আদেশ হলো ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী শুধু আত্মীয়-স্বজনই হবে, আর যাদের সাথে বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্বভাব রাখ বা অঙ্গীকারাবদ্ধ থাক তাদের উপকার কর, তাদেরকে

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৮৪
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৯
৩। খোলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৮০

সাহায্য কর। তাদের কল্যাণ সাধন কর কিন্তু ওয়ারিশ তারা হবে না। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করা হয়েছে, তাদেরকে সাহায্য করা এবং তাদের পক্ষে ওসিয়ত করা যায়।

হযরত এবনুল মুসাইয়্যেব (রঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াত সেসব লোকদের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে যারা নিজেদের সন্তান ব্যতীত অন্যদেরকেও সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে এবং নিজের বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে বরণ করে নিত। আল্লাহ পাক এ আয়াত দ্বারা তাদের অংশকে ওসিয়তের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী করেছেন আত্মীয়-স্বজনকে। যাদেরকে শুধু মৌখিক সন্তান বলে ডাকা হতো তাদের উত্তরাধিকারী হিসাবে গ্রহণ না করার কথা এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। ইমাম এবনে জরীর (রঃ) বলেছেন, উত্তম কথা হলো এই, যাদেরকে আপন করে গ্রহণ করার অঙ্গীকার করা হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য কর কিন্তু তাদেরকে ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী করা হবে না।[১]

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানবী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, যে ধন-সম্পদ পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজন রেখে যায় আমি তাতে উত্তরাধিকারী নিদৃষ্ট করে দিলাম। আর যখন আত্মীয়-স্বজনকে শরীয়ত মোতাবেক উত্তরাধিকারী নির্ধারিত করা হল তখন যাদের সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার ছিল তাদেরকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ো না; বরং তাদের অংশ দিয়ে দাও তাহলো এক ষষ্ঠাংশ আর একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ পাক সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন। অতএব, তাদেরকে সমস্ত সম্পত্তি না দেয়ার কি হেকমত রয়েছে তা তিনি ভালভাবেই জানেন। আর কে তাঁর এ বিধানের উপর আমল করে আর কে করে না তা তিনি ভাল ভাবেই জানেন।

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ

শানে নুযুল

মোকাতেল বর্ণনা করেন, এ আয়াত নাযিল হয় সা'দ এবনুর রবী এবনে ওমর এবং তাঁর স্ত্রী হাবীবাহ্ বিনতে যায়েদ এবনে আবি জোহাইর সম্পর্কে। আর কালবী বলেছেন, সা'দের স্ত্রীর নাম হলো খাওলাহ্ বিনতে মোহাম্মদ এবনে মোসলেমা। ঘটনার বিবরণ এই যে, সা'দের স্ত্রী তার মর্জির খেলাফ কোন কাজ করেছিল, এ জন্যে সা'দ তাকে একটি চাপড় মারে। স্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়ে স্বীয় পিতাকে এ সম্পকে অবগত করে। পিতা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ সম্পর্কে অভিযোগ করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীকে প্রতিশোধ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫ খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২

গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন, ঠিক এমন সময় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সা'দের স্ত্রীকে প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বারণ করে এরশাদ করেনঃ আমি চেয়েছিলাম এক কিন্তু আল্লাহ্ পাকের মর্জি অন্য। আর আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাই যে সর্বোত্তম এতে কোন সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই। এ ঘটনা বর্ণনার পর আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, একটি বর্ণনায় রয়েছে আয়াতখানি নাযিল হয়েছে জামিলা বিনতে আবদুল্লাহ্ এবং তাঁর স্বামী সাবেত এবনে কায়েস সম্পর্কে।

এবনে আবি হাতেম হাসানের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেনঃ একজন স্ত্রীলোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করে যে, সে তাকে প্রহার করেছে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ স্বামীর নিকট থেকে প্রতিশোধ নিতে পার, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

এবনে মরদবিয়া হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনার উল্লেখ করেছেনঃ একজন আনসারী সাহাবী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করে যে, সে আমাকে এত বেশী প্রহার করেছে যে, আমার চেহারায় এখনও তার চিহ্ন রয়ে গেছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এভাবে প্রহার করার কোন অধিকার তার নেই। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব

আয়াতের মর্মকথা হলো, নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। কেননা, আল্লাহ্ পাক একের উপর অন্যকে তথা নারীর উপর পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাধান্য দান করেছেন। এ শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাধান্য নিতান্ত আল্লাহ্ পাকের দান। আর এ শ্রেষ্ঠত্ব সৃষ্টিগত। পুরুষকে ধী-শক্তি, চেষ্টা-তদবীরের ক্ষমতা, জ্ঞানের প্রশস্ততা, দৈহিক শক্তি এবং যোগ্যতা বিশেষভাবে প্রদান করা হয়েছে। আর এসব নেয়ামত এভাবে নারীদেরকে প্রদান করা হয়নি। এ কারণেই পুরুষকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে যা নারীকে দেয়া হয়নি, যেমন নবুওয়্যত, ইমামত, হুকুমত বা রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচার ক্ষমতা, বিচক্ষণতা, জেহাদ ওয়াজিব হওয়া, জুমআ ওয়াজিব হওয়া, দু' ঈদের নামাজ, আজান, খোতবা, নামাজের জামায়াত, উত্তরাধিকারে অধিকতর অংশ লাভ, বিয়ে করার ক্ষমতা, একাধিক বিয়ে করার অধিকার, তালাক প্রদানের এখতিয়ার, সমগ্র রমজানের রোজা রাখার সুযোগ, সকল অবস্থায় সমস্ত নামাজ ফরজ হওয়া প্রভৃতি।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৩-২৪
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৫-৬৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২১
তফসীরে কবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৮৮
খোলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৮১

এসব বৈশিষ্ট্য এবং প্রাধান্যের কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি আমি কাউকে সেজদা করার আদেশ দিতাম তবে স্ত্রীলোককে আদেশ দিতাম যেন তার স্বামীকে সেজদা দেয়। (আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ)

অতএব, আল্লাহ্ পাক গুণে জ্ঞানে, সাধনায় নারী অপেক্ষা পুরুষকে অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাধান্য দান করেছেন। দ্বিতীয়তঃ স্বামী স্ত্রীর জন্যে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে, স্ত্রীর দেন মোহর আদায় করে, তার খোর পোষের ব্যবস্থা করে তথা স্ত্রীর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব স্বামী বহন করে।

স্ত্রীর কর্তব্য

এমনি অবস্থায় স্ত্রীর কর্তব্য হল স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে চলা। এটিই আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা। স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে চলার এ বিধান অমান্য করলে সমূহ অকল্যাণ এবং অমঙ্গলের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে।

পুরুষের প্রাধান্য

ইমাম রাযী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেনঃ পুরুষকে প্রাধান্য দেয়ার বিধান রয়েছে তার বহু কারণ থাকলেও আমরা সেগুলোকে দু'টি বিষয়ের মধ্যে সীমিত করতে পারি (১) এলম (২) শক্তি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ পাক পুরুষকে নারীর চেয়ে বেশী জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন, আর একথাও সন্দেহাতীত রূপে বলা যায় যে, কঠিন দায়িত্ব পালনের শক্তি পুরুষেরই রয়েছে। আর এ দু'টি কারণেই নারীর উপর নরের প্রাধান্য বিস্তার হয়েছে। পুরুষদের ওপর আল্লাহ্ পাক নারীদেরকে নির্বাচন করেছেন। আল্লাহর দ্বীনের আলেমও হয়েছেন পুরুষগণ। সমাজের নেতৃত্ব বা ইমামত পুরুষদেরই বৈশিষ্ট্য। রণাঙ্গনে জেহাদ পুরুষরাই করেন। মসজিদে এ'তেকাফ পুরুষরাই করেন। তাই পুরুষদের প্রাধান্য যুক্তিযুক্ত ও সর্বজনস্বীকৃত। মওলানা মোহাম্মদ তাহের সাহেব তাঁর 'রমণীর মান' গ্রন্থে এ পর্যায়ে অতি মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। আমরা এ পর্যায়ে তাঁর পরিবেশিত তথ্য সমূহ তুলে দিচ্ছি। এতে পবিত্র কোরআনের ঘোষণার সত্যতা আরো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে।

পাশ্চাত্য গবেষকগণ এ তথ্যও পরিবেশন করেছেন যে, নারীর দৈহিক উচ্চতা পুরুষের দৈহিক উচ্চতার তুলনায় গড়ে ১২ সেন্টিমিন্টার কম। সভ্য-অসভ্য, প্রাচ্য প্রতীচ্য, যুবক-শিশু এবং পরিণত বয়স্ক নির্বিশেষে সর্বত্রই নর-নারীর এ পার্থক্য বিদ্যমান।

নর-নারীর দৈহিক ওজনেও এ তারতম্য অনস্বীকার্য। পুরুষের ওজন যেখানে ৪৫ কিলো নারীর ওজন সেখানে গড়ে পাঁচ কিলো কম, অর্থাৎ ৪০ কিলো।

একটুখানি গভীর মনোনিবেশ সহকারে বিচার করলে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নর-নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন পদ্ধতি, ওজন, শক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বৈষম্য হিসেবে নারী পেয়েছে ১/৩ ভাগ। পেশীর দ্রুত স্পন্দন ও সংকোচনের বেলায়ও এ সত্য অতি সুস্পষ্ট। পুরুষের মাংস পেশীর স্পন্দন, নারীর তুলনায় দ্রুত, তীব্র ও শক্তিশালী।

হৃদপিন্ড ঃ মানব জীবনের মূল কেন্দ্র হৃদযন্ত্রের বেলায়ও নর-নারীর তারতম্য অবিসংবাদিত সত্য। পুরুষের হৃদযন্ত্র অপেক্ষা নারীর হৃদযন্ত্র গড়ে ৬০ গ্রাম ছোট।

শ্বাস-প্রশ্বাসঃ শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুততায় নর-নারীর পার্থক্য অত্যন্ত বেশী। পুরুষ যেখানে ঘন্টায় গড়ে ১১ গ্রাম কার্বন জ্বালায় নারী সেখানে জ্বালায় মাত্র ছয় গ্রাম। এতে এ তথ্য প্রতীয়মান হয় যে, নারীর স্বাভাবিক উত্তাপ পুরুষের তুলনায় বহু পরিমাণে কম, প্রায় আধাআধি।

প্রখ্যাত দার্শনিক মিঃ গাউডন বলেন– নারীর বুদ্ধি যেমন পুরুষের বুদ্ধি অপেক্ষা দুর্বল তেমনি তার অনুভূতিও পুরুষের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে কমজোর। নৈতিক শক্তি ও দুর্বলতা হিসেবেও তাদের তারতম্য অনুরূপ। কোন বিষয়ের বিচারে এ কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নর-নারীর মতের মিলন হয়না। নর-নারীর মধ্যে এই যে বৈষম্য, এই যে তারতম্য এটি সাময়িক নয়, সৃষ্টিগত, চির শ্বাশ্বত, চিরন্তন সত্য।

যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের উপর মানুষের মেধা, বুদ্ধির পূর্ণতা ও পরিণতি নির্ভর করে তাতেও নানাবিধ বৈষম্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। সৃষ্টিগত ভাবে যেখানে নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান রয়েছে, এতে নারীর প্রতি অবিচার হয়নি; বরং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধির, সৃষ্টির কল্যাণ কামনার পরিকল্পনার অনুসারেই তা হয়েছে। সুপণ্ডিত নিকোলাস ও বেলী সাহেব এ তথ্য প্রমাণ করেছেন যে, নারীর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই পুরুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় অপেক্ষা যথেষ্ট দুর্বল। পুরুষের তুলনায় নারী ৩ ভাগের ১ ভাগ শক্তি ধারণ করে। অর্থাৎ গড়ে পুরুষের শক্তি নারীর দ্বিগুণ।

ঘ্রাণ শক্তিঃ যে পরিমাণ সুগন্ধি এক নিদিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব থেকে নারী অনুভব করতে পারে পুরুষ ঐ পরিমাণ সুগন্ধি এর দ্বিগুণ পরিমাণ দূরত্ব থেকে অনুভব করতে পারে। যে পরিমাণ সুগন্ধি পুরুষ স্বাচ্ছন্দে অনুভব করতে পারে, পরিমাণে দ্বিগুণ হলে তবে নারী তা অনুভব করে থাকে। অতি হাল্কা ব্রাসিকের গন্ধ যে পরিমাণ দূরত্ব থেকে নারী অনুভব করতে পারে পুরুষ তা অনুভব করতে পারে এর দ্বিগুণ দূরত্ব থেকে- এ সত্য বহু পরীক্ষিত।

স্বাদ ও শ্রবণ শক্তিঃ পুরুষের তুলনায় নারীর স্বাদ এবং শ্রবণ শক্তি অনেক দুর্বল। এনসাইক্লোপেডিয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, নারীর এ দুর্বলতার কারণেই

স্বাদ-বিস্বাদ ও সুর ও সুরের পরীক্ষক, পিয়ানো রাগিনীর সমালোচক মানেই পুরুষ। আজ পর্যন্ত একজন নারীও এ বিষয়ে নিজেকে সুদক্ষ বলে প্রমাণ করতে পারেনি।

অনুভব শক্তিঃ প্রফেসর লুমব্রোজ সুর্জি প্রমুখ পণ্ডিতগণের সম্মিলিত অভিমত এই যে, "নারীর স্পর্শ শক্তিও পুরুষের তুলনায় কম জোর। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নারীকে যে অসহ্য যন্ত্রণা ও জীবন মরণ সমস্যায় উপনীত হতে হয় এবং সে তা সহ্য করে থাকে, পুরুষের মত তীক্ষ্ণ এবং তীব্র অনুভূতি থাকলে নারী সে কষ্ট কোনভাবেই সহ্য করতে পারত না। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়, প্রসব যন্ত্রণায় নারীর ধৈর্য ও সহ্য শক্তিই এর জলন্ত নিদর্শন। প্রকৃতপক্ষে নারীর অনুভব শক্তিকে দুর্বল করে দিয়ে মানব জাতির উপর বিশেষভাবে করুণা করা হয়েছে। নতুবা মানব জাতির এহেন সংকটময় মুহূর্তে, এহেন প্রাণান্তকর কর্তব্য সম্পাদন কিছুতেই সম্ভব হতো না"।

ব্রেইন বা দেমাগঃ মানুষের ধী-শক্তি, মেধা, বুদ্ধি এবং জ্ঞানের আধার তার ব্রেইন বা দেমাগ। ব্রেইনের ওজন, পরিমাণ এবং জ্ঞান বুদ্ধিতেও রয়েছে তারতম্য। মনোবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, নর-নারীর ব্রেইন আকারে-ওজনে, পরিমাপে, শক্তিতে একে অন্যের চাইতে স্বতন্ত্র। উভয়ের ব্রেইন বা দেমাগের মধ্যে অনেক পার্থক্য। পুরুষের ব্রেইনের ওজন নারীর ব্রেইনের তুলনায় ১০০ গ্রাম বেশী। পুরুষের ব্রেইনের শক্তি তার দেহের তুলনায় ৪০ ভাগের ১ ভাগ। পক্ষান্তরে, নারীর ব্রেইন তার দেহের তুলনায় শক্তিতে ৪৫ ভাগের একভাগ। মস্তিস্ক কোষের শিরা, উপশিরা, আঁক ও রেখার প্রভাব মানুষের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার উপর অনস্বীকার্য সত্য। মস্তিস্ক কোষের শিরা উপশিরার আঁকা বাঁকা রেখার প্রাচুর্যেই বুদ্ধি-বিচক্ষণতার প্রাচুর্য; এটি যত কম হবে বুদ্ধি-বিচক্ষণতাও তেমনি কম হবে।

মনোবিজ্ঞান ঘোষণা করেছে, নারীর মস্তিষ্ক কোষের শিরা উপ শিরা, আঁকা বাকা রেখা পুরুষের মস্তিষ্ক কোষ অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে যেমন কম তেমনি নারীর মস্তিষ্ক কোষের পর্দা বা আবরণ সমূহও অপরিণত।

প্রখ্যাত বুদ্ধিমান এবং শ্রেষ্ঠতম আহাম্মকের ব্রেইন পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, প্রথম জনের ব্রেইনের ওজন যেক্ষেত্রে ৬০ আউন্স অপর জনের ওজন সেখানে মাত্র ২৩ আউন্স।

অনুরূপভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে- পুরুষের ব্রেইনের ওজন গড়ে সাড়ে ৪৯ আউন্স। পক্ষান্তরে নারীর ব্রেইনের ওজন মাত্র ৪৪ আউন্স। ২৭৮ জন পুরুষের ব্রেইন ওজন করে দেখা গেছে তন্মধ্যে বৃহত্তম ব্রেইনের ওজন ৬৫ এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ব্রেইনের ওজন ৩৪ আউন্স। পক্ষান্তরে ২৯১ জন নারীর ব্রেইনের ওজন করে তন্মধ্যে

বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ব্রেইনের ওজন পাওয়া গেছে যথাক্রমে ৫৪ এবং ৩১ আউন্স।[১]

এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, সৃষ্টিগত ভাবেই পুরুষকে আল্লাহ পাক প্রাধান্য দিয়েছেন এবং নারীদেরকে পুরুষের অনুগত থাকার আদেশ দিয়েছেন।

নেককার স্ত্রীদের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

"অতএব যারা নেককার স্ত্রীলোক, তারা তাদের স্বামীদের অনুগত হয় এবং স্বামীদের অনুপস্থিত কালে তার ধন-সম্পদ ও স্বীয় ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করে"।

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ কোন নারী সে পর্যন্ত নেককার বা পূণ্যবতী হতে পারেনা যে পর্যন্ত সে তার স্বামীর অনুগত এবং তাবেদার হয়। দ্বিতীয়ত পূণ্যবতী নারীর আরেকটি কর্তব্য হল স্বামীর অনুপস্থিতিতে বা তার দৃষ্টির আড়ালে তার বিষয়-সম্পত্তির হেফাজত করা, নিজের আচার-আচরণকে সংযত রাখা, স্বামীর মর্জি এবং অভিরুচি অনুসারে জীবন যাপন করা এবং নিজের ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করা।[২]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

خير النساء ان نظرت اليها سرتك وان امرتها اطاعتك وان غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها وتلا هذه- الاية

অর্থাৎ উত্তম স্ত্রী সে, যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তুমি আনন্দিত হবে, আর যাকে আদেশ দিলে সে আদেশ মেনে চলবে এবং যখন তুমি অনুপস্থিত থাকবে তখন সে তোমার ধন-সম্পদ ও নিজের ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করবে।

بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ বাক্যটির তফসীরে বলেছেন যে, এর অর্থ হল আল্লাহ্ পাক স্ত্রীদেরকে হেফাজতের আদেশ দিয়েছেন এবং তৌফিক দিয়েছেন।

১। রমণীর মান, পৃষ্ঠা-৫৮-৬২
২। তফসীরে কবীর খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৮৯

পূর্ববর্তী বাক্যে হেফাজতের সম্পর্ক ছিল স্ত্রীদের সাথে কেননা, হেফাজত বা সংরক্ষণ তাদের দায়িত্ব, আর এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হয়। আর এ বাক্যটিতে হেফাজতের সম্পর্ক আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে কেননা, মূলত সবকিছুর স্রষ্টাই আল্লাহ্ পাক, তিনিই তাদেরকে হেফাজত বা সংরক্ষণের শক্তি দান করেছেন। অথবা এ আয়াতের অর্থ হল যেহেতু আল্লাহ্ পাক স্ত্রীদের অধিকারের হেফাজত করেছেন, তাদের দেনমোহর, খোরপোষ এবং তাদের হেফাজতের দায়িত্ব স্বামীদের উপর অর্পণ করেছেন, তাই স্বামীদের অনুপস্থিতিতে তাদের ধন-সম্পদের হেফাজত করা এবং নিজেদের ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত করা স্ত্রীদের একান্ত কর্তব্য। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে স্ত্রীলোক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সঠিকভাবে আদায় করে, রমজানের রোযা রাখে, নিজের ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত করে এবং স্বামীর অনুগত থাকে সে জান্নাতের যে কোন দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। হযরত সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যদি কোন স্ত্রীলোক এমন অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় যে, তার স্বামী-তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।[১] (তিরমিজী শরীফ)

ঈমানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত

এ পর্যায়ে হযরত ওমর (রাঃ)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিত হবে না যা ইমাম বায়হাকী লিখেছেন, মানুষের জন্যে ঈমানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত সে স্ত্রী, যে হবে খোশ মেজাজ, মধুর ব্যবহার যার বৈশিষ্ট্য, স্বামী প্রেমিক, যার দ্বারা সন্তান-সন্ততি লাভ হয়। আর মানুষের জন্যে কুফরের পর সর্বশ্রেষ্ঠ বিপদ হলো এমন স্ত্রী যার ব্যবহার মন্দ। কঠোর কর্কষ যার ভাষা, যে চরিত্রহীনা।

হযরত ওমর (রাঃ) আরও বলেছেনঃ স্ত্রীলোক তিন প্রকার (১) সতী সাধ্বী পূণ্যবতী, মধুর ব্যবহারকারী, স্বামী নিবেদিতা, তার সন্তান-সন্ততিও অনেক। বিপদের সময় স্বামীকে সাহায্য করে, বিপদ বৃদ্ধির কারণ হয় না, এমন স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক কম। (২) সে স্ত্রীলোক যার দ্বারা শুধু সন্তান পাওয়া যায়, আর কিছুই নয়। (৩) সে স্ত্রীলোক যার অন্তর হিংসা-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। আল্লাহ্র ইচ্ছায় যার জীবনকে সে দুর্বিযহ করে তোলে আর আল্লাহ্র মর্জি হলেই সে তখন বিপদ থেকে মুক্তি পায়। সে ব্যক্তি রাখতেও পারে না ছাড়তেও পারে না।

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৭-৬৮

স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে

পূর্ববর্তী আয়াতে পূণ্যবতী, স্বামীর তাবেদার স্ত্রীলোকদের কথা ছিল, আর এ আয়াতে সে সব স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে বিধান রয়েছে, যারা তাদের স্বামীর অবাধ্য হয়। এরশাদ হয়েছেঃ

যে সব স্ত্রীলোকের অপ্রিয় ব্যবহারে, অবাধ্যতায় স্বামী অধৈর্য হয়ে ওঠে তাদের কর্তব্য হলো সর্বপ্রথম স্ত্রীকে উপদেশ দেয়া, নসিহত করা, আল্লাহর আযাবের ভয় দেখানো, তার প্রতি অর্পিত দায়িত্বের কথা স্মরণ করানো। যদি হেদায়েত নসিহত কার্যকর না হয় তথা সে অনুগত না হয় তবে তাকে শয্যা থেকে সরিয়ে দাও। যদি এ শাস্তি দ্বারাও সে নসিহত হাসিল না করে বরং অবাধ্য থাকে তবে হালকা প্রহারের মাধ্যমে তাকে শাস্তি দাও। কেননা, হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে এরশাদ করেছেন, তোমরা স্ত্রী জাতির হক্ব সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদেরকে আল্লাহ পাকের আমানত স্বরূপ গ্রহণ করেছ। আর আল্লাহর হুকুমেই তাদেরকে তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।[১]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) কয়েকখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার শয্যায় ডাকে, স্ত্রী তাতে অস্বীকৃতি জানায় তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার প্রতি লা'নত প্রেরণ করতে থাকে।

মুসলিম শরীফে সংকলিত এ মর্মের আরো একখানি হাদীসে রয়েছে, যে রাত্রে কোন স্ত্রী রাগান্বিত থাকার কারণে স্বামীর ডাকে সাড়া না দেয়, আল্লাহর রহমতের ফেরেশতাগণ সকাল পর্যন্ত তার প্রতি লা'নত প্রেরণ করতে থাকে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ প্রশ্ন করা হয় যে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কি হক্ব? তিনি এরশাদ করেন, যখন তুমি আহার কর, তাকেও আহার দাও, যখন নিজের লেবাসের ব্যবস্থা কর তখন তার লেবাসেরও ব্যবস্থা কর। তাকে তার মুখমণ্ডলে প্রহার করোনা। তাকে গালি দিওনা। তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিওনা। রাগান্বিত অবস্থায় যখন তুমি তার সঙ্গে কথোপকথন বন্ধ রাখ তখনও তাকে বাড়ী থেকে বের করোনা। অতঃপর এরশাদ করেন, এরপরও যদি সঠিক পথে না আসে তবে তাকে ধমক দিতে পার। হালকা প্রহারের মাধ্যমে তাকে সঠিক পথে আনতে

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৮
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৬ পারা-৫, পৃষ্ঠা-২২
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭০

পার। হযরত আবদুল্লাহ এবনে জোময়াহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে গোলামদের মত বেত্রাঘাত না করে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে তার স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করে। আমি আমার পরিবারবর্গের সাথে তোমাদের সবার চেয়ে অধিকতর ভাল ব্যবহার করি। তিরমিজী, দারমী, এবনে মাজাহ শরীফে এই হাদীস সংকলিত হয়েছে। বর্ণনাকারী হলেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)।

فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا

যদি স্ত্রীলোকরা শুরু থেকেই তোমাদের অনুগত থাকে, অথবা নসিহত করার পর বা পৃথক শয়নের ব্যবস্থার পর বা হালকা শাস্তি ভোগের পর তাদের অপ্রিয় ব্যবহার পরিহার করে তওবা করে এবং তোমাদের বাধ্য ও অনুগত হয়ে চলে, তবে এমন অবস্থায় তাদের ছিদ্রান্বেষণ করোনা, অকারণে তাদের প্রতি দোষারোপ করোনা, সামান্য দোষে কঠোর শাস্তি দিও না।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ আল্লাহ পাক সবার উপরে। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, যারা তোমাদের কর্তৃত্বাধীন রয়েছে তোমরা তাদের প্রতি জুলুম করোনা, তোমরা যে আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন একথা ভুলে যেয়োনা।

অথবা এর অর্থ এই যে, আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে থাকেন। এভাবে তোমরাও স্ত্রীদের অপরাধ মাফ করে দাও।

স্বামীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী

এ বাক্যের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ বাক্যে স্বামীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, যেন তারা স্ত্রীদের প্রতি কোন অবস্থাতেই নির্যাতন না করে। কেননা, যদিও স্ত্রী স্বামীর নিকট নিতান্ত দুর্বল, স্বামীর জুলুম থেকে আত্মরক্ষার কোন শক্তি তার নেই কিন্তু মনে রেখো, আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, সবার উপরে তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা। তিনি তোমাদের বিচার করবেন এবং তোমাদের নিকট থেকে তাদের হক্ব আদায় করিয়ে দেবেন। অতএব, তোমরা আত্ম-প্রবঞ্চিত হয়োনা যে, তাদের উপর তোমাদের বিরাট ক্ষমতা রয়েছে।

(২) অথবা এর অর্থ হলো যদি স্ত্রীরা তোমাদের অনুগত হয় তবে তোমাদের ক্ষমতা আছে বলেই তাদের প্রতি বাড়াবাড়ি জুলুম করোনা, মনে রেখো আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

(৩) যেভাবে আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও তোমাদেরকে সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না।

(৪) অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও যখন কোন পাপী ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করেন, ঠিক এমনিভাবে স্ত্রী যখন পূর্বকৃত অন্যায়ের জন্যে তওবা করে তখন তোমরাও তাদেরকে ক্ষমা কর।[১]

﴿٣٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا
بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا
فَخُورًا ﴿٣٦﴾ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ
مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾

তরজমা

(৩৫) এবং যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কলহ দ্বন্দ্ব, ঝগড়া ফাসাদের আশঙ্কা কর তবে স্বামীর বংশ থেকে একজন এবং স্ত্রীর বংশ থেকে একজন বিচারক নিযুক্ত কর। যদি বিচারকদ্বয় সংশোধনের আশা করে তবে আল্লাহ তায়ালা উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও মহব্বতের তৌফিক দান করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।

(৩৬) এবং তোমরা শুধু আল্লাহ পাকেরই বন্দেগী কর, আর তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করোনা, আর পিতা মাতার সাথে এহসান কর এবং আত্মীয়-স্বজন, এতীম মিসকীন, নিকটতম প্রতিবেশী ও দূরের প্রতিবেশী, পথিক এবং তোমাদের গোলামদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ পাক এমন লোকদের পছন্দ করেন না যারা আত্মাভিমানে মত্ত এবং যারা অহংকারী।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৯১

(৩৭) আর যারা কার্পণ্য করে এবং অন্যদেরকেও কার্পণ্য করার পরামর্শ দেয় এবং আল্লাহ তায়ালার স্বীয় কৃপায় যা কিছু দান করেছেন তাকে গোপন করে, আর আমি (এমন) নাফরমানদের জন্যে অত্যন্ত অপমানজনক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, যখন স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হয় তখন স্বামীর প্রথম কর্তব্য হলো তাকে সদুপদেশ দেয়া। আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন সে বিষয়ে তাকে সতর্ক করা। যদি এতে সে স্বামীর অনুগত ও তাবেদার হয় তবে ভাল কথা, কিন্তু যদি সে উপদেশের মাধ্যমে পথে না আসে তবে স্বামী তাকে শয্যা থেকে দূরে রাখবে। যদি এতে সে পথে আসে তবে ভাল কথা, কিন্তু এরপরও যদি সে অবাধ্য থাকে তবে হালকা প্রহারের মাধ্যমে তাকে পথে আনার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু এরপরও যদি সে অবাধ্য থাকে তবে যে পন্থা অবলম্বন করা দরকার তারই শিক্ষা রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

সালিশ নিয়োগের নির্দেশ

এরশাদ হয়েছেঃ যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ দ্বন্দ্ব দেখতে পাও এবং নিজেদের মধ্যেকার বিরোধ মীমাংসা করতে পারবে না বলে আশঙ্কা কর তবে স্বামীর আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকে একজন সালিশ স্থির কর। কেননা, তাদের সঠিক অবস্থা সম্পর্কে আত্মীয়-স্বজনরাই অধিকতর ওয়াকেফহাল আর তাদের প্রতি বেশী দরদীও। অবস্থা বিচার বিশ্লেষণের পর যদি দেখা যায় যে, স্বামীর দোষে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তখন সালিশদের কর্তব্য হলো যথা নিয়মে স্ত্রীকে রাখার এবং তার প্রতি ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া। পক্ষান্তরে যদি অনুসন্ধানের পর দেখা যায় যে, স্ত্রীর অবাধ্যতার কারণেই যত অশান্তি তবে সালিশদের কর্তব্য হলো স্বামীর অনুগত হওয়ার জন্যে স্ত্রীকে নির্দেশ দেয়া।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আলী (রাঃ)-এর খেদমতে একজন স্বামী এবং স্ত্রী তাদের মুরুব্বী ও পৃষ্ঠপোষকসহ হাযির হয়। হযরত আলী (রাঃ) এ নির্দেশ দান করেন যে, উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজন থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত কর। তাঁর এ নির্দেশ পালন করা হয়।

হযরত আলী (রাঃ) সালিশদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ তোমরা কি জান তোমাদের কর্তব্য কি? তোমাদের কর্তব্য হলো তাদের উভয়ের মধ্যে যদি মিল মহব্বত হওয়ার সম্ভাবনা দেখ তবে তাদেরকে একত্রিত করে দাও আর যদি এ অবস্থা না হয় তবে তাদের বিচ্ছেদ করে দাও। তখন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমার অভিমত কি? সে বললো আমার লাভ হোক কি ক্ষতি আমি আল্লাহর কিতাবের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তুত। অতঃপর যখন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন সে বলে বিচ্ছেদ হবে না তবে এতদ্ব্যতীত যা কিছু করণীয় তা সালিশগণ করতে পারেন। হযরত আলী (রাঃ) তখনই বললেনঃ আল্লাহর শপথ, তুমি ভুল কথা বলেছ। সালিশদের কাজ সে পর্যন্ত শুরু হবেনা যে পর্যন্ত তুমি এ সম্পর্কে এমনি অঙ্গীকার কর যেভাবে অঙ্গীকার করেছে তোমার স্ত্রী।

সালিশদের অধিকার

আর এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত যে, এমন অবস্থায় সালিশদের উভয় অধিকার রয়েছে। এমনকি হযরত ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) বর্ণনা করেন, যদি সালিশগণ ইচ্ছা করেন তবে দু' বা তিন তালাক পর্যন্ত দেয়ার ইচ্ছা করতে পারেন। ইমাম মালেক (রঃ)-এরও এ মত। তবে হযরত হাসান (রঃ) বলেন, সালিশদের অধিকার আছে তাদেরকে একত্রিত করে দেয়ার। তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করার অধিকার নেই। হযরত কাতাদা এবং যায়েদ এবনে আসলাম (রঃ)-এরও এ অভিমত। ইমাম আহমদ (রঃ), আবু সাওর এবং দাউদেরও এ মত। তাদের দলিল হলো اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا এ আয়াত। এ আয়াতে বিচ্ছেদের কোন উল্লেখ নেই।

আর অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, সালিশগণ যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। তাদের দলিল হলো কোরআন করীমে আল্লাহ্ পাক 'হাকাম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, আর যে "হাকাম" হবেন তার সিদ্ধান্তে কেউ সন্তুষ্ট হোক কি অসন্তুষ্ট তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। অতএব, সালিশদের কর্তব্য হলো স্বামী স্ত্রী উভয়কে কল্যাণের নির্দেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। যদি কোন এক পক্ষ তার জেদ বজায় রাখতে চায় তবে সালিশদের কর্তব্য হলো শাসনকর্তার নিকট তাদের অনুসন্ধানের রিপোর্ট পেশ করা এবং স্বামীকে যথানিয়মে স্ত্রীকে রাখার নির্দেশ দেয়া, আর স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি অনুতপ্ত হওয়ার আদেশ দেয়া।[১]

اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭১-৭২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫ খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৩
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৭

অর্থাৎ (১) যদি উভয় সালিশ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার ইচ্ছা করে তবে আল্লাহ্ পাক তাদের মহৎ প্রচেষ্টার বদৌলতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনি-বনাও করে দেবেন, তিনি সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন, কিভাবে বিরোধের অবসান ঘটে, কিভাবে মিলনের উপকরণ আসে সবই তাঁর জানা, সবই তাঁর নখদর্পণে। (২) অথবা এ বাক্যটির অর্থ হলো এই, যদি সালিশদ্বয়ের উদ্দেশ্য হয় মজলুমের সাহায্য করা, কোন এক পক্ষকে সমর্থন না করা তবে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ঐক্যমতে পৌঁছাবেন এবং সমস্যার একটি সন্তোষজনক সমাধান হবে (৩) অথবা এ বাক্যটির অর্থ হলো, যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ে আন্তরিক ভাবে নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করতে ইচ্ছুক হয় তবে আল্লাহ্ পাক তাদের মধ্যে মিল মহব্বত সৃষ্টি করে দেবেন এবং এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের তৌফিক দান করবেন যা উভয়ের জন্যে হবে উত্তম। (৪) অথবা অর্থ হলো যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করার ইচ্ছা করে, তবে আল্লাহ্ পাক সালিশদ্বয়ের মীমাংসা করে দেয়ার তওফিক দান করবেন। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি খালেছ নিয়মে তথা আন্তরিকতার সঙ্গে কেউ কোন কাজ করে তবে আল্লাহ্ পাক তাকে সে কাজে সফল করেন।

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মানুষের মনের গহনের সকল কথার খবর রাখেন এবং মানুষের চেষ্টার ফলাফল কি হবে তাও তিনি জানেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কে হক্কের উপর রয়েছে আর কে অন্যায় পথে রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ অবগত।[১]

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে স্বামী স্ত্রী উভয়ের সম্পর্কে পরস্পরের প্রতি মধুর ব্যবহার এবং একে অন্যের প্রতি দায়িত্ব পালনের তাগিদ করা হয়েছে। যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় তবে তা দূর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদি পরস্পরের মতবিরোধ কলহ দ্বন্দ্বে পরিণত হয়, আর নিজেরা মীমাংসা করতে সক্ষম না হয় তবে এমন অবস্থায় উভয় পক্ষের দু' জন সুবিচারক সালিশ যেন তাদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৯৪

আর এ আয়াতে নৈতিক গুণ অর্জনের তাগিদ করে প্রত্যেককে তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকার এবং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করার তাগিদ করা হয়েছে।

মানুষের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব

প্রতিটি মানুষের উপর যে সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাকে দু' ভাগে বিভক্ত করা যায় (১) হক্কুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্ পাকের প্রতি দায়িত্ব। (২) হক্কুল এবাদ বা বন্দার প্রতি দায়িত্ব।

আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার দায়িত্ব পালনের তাগিদ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ এবং তোমরা এক আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন স্বরূপ তাঁর বন্দেগী কর। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যটির অর্থ বলেছেনঃ তোমরা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস কর। তাঁর তৌহিদে একীন কর। তিনি যে এক, তাঁর যে কোন শরীক নেই একথার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ পাকই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ও সৃষ্টি করেছেন সমগ্র বিশ্ব জগতকে এবং তিনি লালন পালন করছেন সকলকে। মানব জাতিকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাধান্য দান করেছেন আর সমগ্র সৃষ্টি জগতকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। অতএব, মানুষের প্রধানতম কর্তব্য হলো এক আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা। কেননা, আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ

(নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক শেরকের গুনাহ্ মাফ করবেন না। অন্যান্য গুনাহ্ তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করতেও পারেন।)

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন শেরক দু' প্রকার। (১) শেরকে জেহরী তথা প্রকাশ্য শেরক। (২) শেরকে খফী অর্থাৎ গোপন শেরক।

গোপন শেরক সম্পর্কে সতর্কবাণী

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গোপন শেরক সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেনঃ হে লোক সকল! আমি তোমাদের ব্যাপারে ক্ষুদ্র শেরক সম্পর্কে ভয় করছি। সাহাবাগণ আরয করলেন, ক্ষুদ্র শেরক কি? তিনি এরশাদ করলেনঃ রিয়াকারী বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করা। যারা মানুষকে দেখানোর জন্যে সৎ কাজ করে তাদেরকে কেয়ামতের দিন বলা হবে

তোমরা দুনিয়াতে যাদেরকে দেখাতে সৎ কাজ করেছিলে তাদের নিকট যাও, যদি তাদের নিকট তোমাদেরকে দেয়ার মত কিছু থাকে তবে তা গ্রহণ কর।

এখলাস অর্থাৎ শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে সৎ কাজ কর। যদি সৎ কাজে এখলাস না থাকে তবে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তা কবুল হয় না। রিয়াকারী বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে যদি সৎ কাজ করা হয় তবে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য হয়না।

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎ কাজ করে তাদের দৃষ্টান্ত হলো, যদি কেউ তার টাকার থলে পথের কংকর দিয়ে পরিপূর্ণ করে রাখে তবে মানুষ মনে করবে তার নিকট অনেক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু তাতে তার কোন উপকার হয় না। ঠিক এমনিভাবে যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎ কাজ করে লোকেরা তাকে নেককার পরহেযগার মনে করে। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের দরবারে তার কোন সওয়াব বা শুভ পরিণতি নেই। সাতটি জিনিস অপর সাতটি ব্যতীত বেকার।

(১) যে আল্লাহকে ভয় করার দাবী করে অথচ গুনাহ্ থেকে বাঁচে না তার দাবী অকার্যকর।

(২) যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে সওয়াবের আশা করে অথচ নেক আমল করে না তার আশা বেকার।

(৩) যার নেক কাজের আকাঙ্খা থাকে অথচ সংকল্প থাকে না এমন অবস্থায় সে আকাঙ্খা বেকার হয়।

(৪) যে নেককার হওয়ার জন্যে চেষ্টা করে না এমন অবস্থায় তার দোয়া বেকার হয়। কেননা আল্লাহ্ পাক মানুষকে তাঁর চেষ্টার ফলই দান করেন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থাৎ যারা আমার পথে সাধনা করে আমি তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করি।

(৫) কৃত অন্যায়ের জন্যে লজ্জিত অনুতপ্ত না হয়ে শুধু মৌখিক এস্তেগফার পাঠ করা বেকার। কেননা, যার দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হয়ে যায় এবং সে অন্যায়ের জন্যে সে আল্লাহ্ পাকের দরবারে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে এমন অন্যায় কাজ না করার সংকল্প করে এবং কৃত অন্যায়ের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হয় তখন আল্লাহ্ পাক তার তওবা কবুল করেন। আর মনের এ অবস্থা না হলে শুধু মৌখিক এস্তেগফার বেকার।

(৬) অন্তরের সংশোধন না করে শুধু লোক দেখানো নেক কাজ বেকার।

(৭) এখলাস ব্যতীত সংকল্প বেকার।

একজন সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলেন, আমি অত্যন্ত নীরবতা এবং গোপনীয়তার সঙ্গে সৎ কাজ করি। কিন্তু লোকেরা এ বিষয় অবগত হয়। এতে আমি খুশী হই। এ নেক আমলের জন্যে আমি কি কোন সওয়াব পাব? (কেননা প্রকাশ্যে এ অবস্থা এখলাসের খেলাফ) তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ দ্বিগুণ সওয়াব দান করা হবে।

(১) গোপনে নেক আমল করার। (২) যে গোপন নেক আমল প্রকাশিত হয় অর্থাৎ গোপনে নেক আমল করা এখলাসের নিদর্শন। আর এ এখলাসের জন্যে রয়েছে বিশেষ সওয়াব। আর ঐ নেক আমলের কথা প্রকাশিত হওয়ার কারণে অন্যরাও তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে। ফলে তারাও সে নেক আমল করতে পারবে আর এজন্যে তাকে সওয়াব দান করা হবে।

মুসলিম শরীফে একখানি হাদীস রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ سَنَّ فِى الْاَسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُمَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন উত্তম পন্থা জারী করে সেজন্যে সে সওয়াব পাবে, আর যারা তার পরে সে আমল করে তাদের সওয়াবও সে পাবে।

অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি এ আকাঙ্খা করে যে, আমার আমলের প্রচার হোক অথবা এমন চেষ্টা করে তবে তা হবে এখলাসের খেলাফ। এক বুজর্গকে যখন এ প্রশ্ন করা হলো, মোখলেস কে? তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার সৎ কাজকে এভাবে গোপন রাখে যেভাবে তার মন্দ কাজকে রাখে। আর তার আলামত বা চিহ্ন হলো মানুষ যদি তার প্রশংসা করে তবে সে উক্ত প্রশংসাকে অপছন্দ করে। এ হলো গোপন শেরক বা রিয়াকারীর কথা।

আয়াতের দুটি কথা

আলোচ্য আয়াতের দুটি কথা বিশেষভাবে এরশাদ হয়েছে (১) তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগী কর। (২) আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা। শেরক প্রকাশ্যে হোক অথবা গোপনে– সকল প্রকার শেরক বর্জন কর। এক আল্লাহর বন্দেগী করার তাৎপর্য সম্পর্কে সুফীগণের মত হলো, এখানে এবাদতের তাৎপর্য হচ্ছে এই, যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রাখা হয় এবং গোসল দেয়া হয় তখন মৃত

ব্যক্তির যেভাবে কোন বক্তব্য বা পছন্দ অপছন্দ থাকে না ঠিক তেমনি বন্দা আল্লাহ পাকের দরবারে পড়ে থাকবে, তার সকল হুকুম পালন করবে। সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ পাক তাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন বন্দা ঠিক সেভাবেই আছে। বন্দার তাতে পছন্দ অপছন্দের কোন প্রশ্ন ওঠেনি। ঠিক সেভাবে আল্লাহ পাকের সকল হুকুম বন্দা মেনে চলবে, আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করে রাখবে, বন্দার পছন্দ-অপছন্দের কোন বালাই থাকবে না।

এ পর্যায়ে তফসীরকারগণ বিখ্যাত সাহাবী হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পেছনে উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করেছিলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ হে মাআজ! তুমি কি জান, বন্দার প্রতি আল্লাহর কি হক্ব রয়েছে? আমি আরয করলাম, আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলই জানেন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ বন্দাদের প্রতি আল্লাহর হক্ব হলো তাঁর এবাদত করা এবং কোন কোন কিছুকে তাঁর শরীক না করা। হে মাআজ! তুমি কি জান আল্লাহর প্রতি বন্দার কি হক্ব রয়েছে যদি বন্দা তার দায়িত্ব পালন করে? (অর্থাৎ যদি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে) আমি আরয করলাম, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই জানেন। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাকের প্রতি বন্দার হক্ব হলো এমন লোকদেরকে শাস্তি না দেয়া। আমি আরজ করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি কি মানুষকে একথার সুসংবাদ দেব? তিনি এরশাদ করলেনঃ তাদেরকে আমল করতে দাও (যদি এ সুসংবাদ দেয়া হয় তবে তারা আল্লাহর রহমতের আশায় তাঁর প্রতি ভরসা করে থাকবে, আমল পরিত্যাগ করবে)। (বগবী) বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফেও এই হাদীস সংকলিত হয়েছে।[১]

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালনের তাগিদ

এবং তোমরা পিতা মাতার সাথে এহসান কর অর্থাৎ পিতা-মাতার সেবা যত্ন কর। তাদের সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলোনা। পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির কারণ হয়োনা, তাদের প্রয়োজনের আয়োজন কর। পিতা-মাতার সেবা যত্নের প্রতি আল্লাহ পাক কত বেশী গুরুত্বারোপ করেছেন তা বোঝা যায় পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলী দ্বারা।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭৩-৭৪
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪
খুলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৮৪

কেননা, আল্লাহ পাকের বন্দেগী করার নির্দেশের পরই বন্দার হক্বের ব্যাপারে তাগিদ করা হয়েছে এবং বন্দার হক্বের মধ্যে সর্বপ্রথম পিতা-মাতার হক্ব আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাকের বন্দেগীর পাশাপাশি পিতা-মাতার হক্ব আদায়ের তাগিদ বিশেষ তাৎপর্যবহ। শুধু এ আয়াতেই নয়; বরং পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতেও এভাবেই আল্লাহর বন্দেগীর তাগিদের পরই পিতা-মাতার হক্ব আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

"(অর্থাৎ) আপনার পরওয়ারদেগার এই আদেশ দিয়েছেন তোমরা শুধু এক আল্লাহর বন্দেগী কর, আর পিতা-মাতার সাথে এহসান কর"। এমনিভাবে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ

(যেন তোমরা শোকর আদায় কর আমার এবং তোমার পিতা-মাতার, আর আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।) এতে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতার তা'যিম করা, তাদের সেবা যত্ন করা তথা তাদের হক্ব আদায় করা প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য। পিতা-মাতার প্রতি আদব রক্ষা করে চলার এবং তাদের সাথে মধুর ব্যবহার করার তাগিদ দিয়ে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

"আর পিতা-মাতাকে কোন সময় উফ! বলোনা এবং তাদেরকে কোন অবস্থাতেই ধমক দিও না। আর তাদের সাথে অতি উত্তম এবং বিনম্রভাবে কথা বল"। আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে আরো এরশাদ করেছেনঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا

এবং আমি মানুষকে আদেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি এহসান করার, এমনকি পিতা-মাতা যদি কাফের হয় এমন অবস্থায় যা করণীয় সে সম্পর্কেও নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কোরআনেঃ

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا

পিতা-মাতা অমুসলিম হলে যা করণীয়

যদি তোমার পিতা মাতা এই চেষ্টা করে যে, তুমি আমার সাথে শেরক কর যার এলম তোমার নেই তবে তুমি তাদের কথা মেনে চলবে না, আর দুনিয়াতে তাদের সাথে ভালভাবে বসবাস কর। অর্থাৎ পিতা-মাতা যদি কাফের হয়, তারা যদি সন্তানকে কুফর ও শেরকের প্রতি আহ্বান জানায় তবে এমন আহ্বানে সাড়া দিওনা। এমন অন্যায় কাজে তাদের প্রতি আনুগত্য জরুরী নয় কিন্তু তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে যেতে হবে। কাফের হলেও পিতা-মাতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অনুমতি নেই।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে ইয়ামন থেকে এক ব্যক্তি হাযির হলো এবং জেহাদে শরীক হওয়ার অনুমতি চাইল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়ামনে তোমার কেউ আছে কি? সে বললোঃ পিতা মাতা আছেন। তিনি বললেনঃ তারা কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? সে বললো না। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি ফিরে যাও তাদের কাছে এবং তাদের অনুমতি নাও। যদি তোমাকে অনুমতি দেয়া হয় তবে জেহাদে শরীক হয়ো; অন্যথায় তাদের খেদমতে মশগুল থাক।[১] পিতা-মাতার দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনেক তাগিদ করেছেন। হযরত মাআজ (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দশটি কথার নসিহত করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা। যদিও তোমাকে এজন্যে কতল করা হয় অথবা জ্বালিয়ে ফেলা হয় এবং পিতা মাতার অবাধ্য হয়োনা। যদিও তারা তোমার স্ত্রী এবং ধন-সম্পদ ছেড়ে দেয়ার আদেশ দেন।

وَبِذِى الْقُرْبٰى

আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ

এবং ভাল ব্যবহার কর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে। হযরত সালমান এবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ গরীব দুঃখী মিসকিনকে খয়রাত দেয়া শুধু খয়রাতই হয় কিন্তু গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দেয়া একদিকে খয়রাত অন্যদিকে সেলায়ে রহমী (অর্থাৎ এতে দ্বিগুণ সওয়াব)। −(নেসায়ী, তিরমিজী)

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতা ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যদি দারিদ্র-পীড়িত হয় তবে তাদেরকে সাহায্য করা কর্তব্য।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৯৫

وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ

এতিম মিসকিনের প্রতি কর্তব্য

অর্থাৎ এতিম মিসকিনদের সাথে ভালো ব্যবহার কর, তাদেরকে যাকাত দেয়া কর্তব্য। যাকাত ব্যতীত দান খয়রাত করাও উচিত। হযরত সাহাল এবনে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতে আমি এবং এতিমের সেবক এভাবে কাছাকাছি থাকবোঃ তিনি তখন তাঁর হাত মোবারকের শাহাদতের আঙ্গুল এবং তার পার্শ্বের আঙ্গুল দেখিয়ে ছিলেন। দু' আঙ্গুলের মধ্যে সামান্য ফাঁক রেখেছিলেন। (বোখারী)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এতিমের মাথায় হাত রেখেছে (তথা তাকে মায়া করেছে) তবে সেই এতিমের মাথার প্রতিটি চুলের বিনিময়ে তাকে দশটি নেকী দেয়া হবে।

وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ

প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব পালন

অর্থাৎ "ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী"। অর্থাৎ আত্মীয়তার সূত্রে যারা ঘনিষ্ঠ অথবা স্থান হিসেবেও ঘনিষ্ঠ হতে পারে। প্রতিবেশী হওয়ার মাধ্যমে যে ব্যক্তি আত্মীয় অনাত্মীয় প্রতিবেশীর তুলনায় তার হক্ব অধিকতর। এমনিভাবে দূরে অবস্থানকারী প্রতিবেশীর তুলনায় নিকটে অবস্থানকারী প্রতিবেশীর অগ্রাধিকার থাকবে। এমনিভাবে যারা পার্শ্বে উপবেশনকারী তারা হলো যেমন সহযাত্রী, সহকর্মী বা একই শিক্ষকের ছাত্র-সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো স্ত্রী কেননা, স্ত্রীইতো স্বামীর পার্শ্বে থাকে। এ পর্যায়ে হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রতিবেশী তিন প্রকারঃ ১। এমন প্রতিবেশী যার তিনটি হক্ব, প্রতিবেশী হিসেবে হক্ব, আত্মীয় হিসেবে হক্ব এবং মুসলমান হিসেবে হক্ব। ২। দ্বিতীয় প্রতিবেশী সে ব্যক্তি যার দুটি হক্ব রয়েছে প্রতিবেশী হওয়ার হক্ব এবং মুসলমান হিসেবে হক্ব ৩। আর তৃতীয় প্রতিবেশী হলো সে ব্যক্তি যার শুধু প্রতিবেশী হিসেবেই হক্ব রয়েছে। যেমন অমুসলিম প্রতিবেশী।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীস বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে। একবার তাঁর জন্যে একটি বকরী জবেহ করা হয়েছিল। তিনি তখন তাঁর গোলামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ তুমি আমার ইহুদী প্রতিবেশীকে হাদিয়া

দিয়েছ? কথাটি তিনি দু'বার বলেছিলেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যে, জীব্রাইল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীর হক্ব সম্পর্কে এত তাগিদ করেছেন যে, আমি চিন্তা করেছিলাম হয়তো প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী করা হবে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একজন আনসারী সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে দেখলেন তিনি এক ব্যক্তির সঙ্গে দন্ডায়মান অবস্থায় কথা বলছেন এবং এ অবস্থায় অনেক সময় অতিবাহিত হলো। এমনকি আমার আশঙ্কা হলো যে, এতক্ষণ দন্ডায়মান থাকার কারণে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এ চিন্তায় আমি খুব অস্থির হলাম। এর বহুক্ষণ পর তিনি আমার নিকট আগমন করলেন। আমি আরয করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! এ ব্যক্তি আপনাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। তিনি এরশাদ করেছেন ঃ তুমি কি তাঁকে দেখেছ? আমি আরজ করলামঃ জ্বি-হ্যাঁ ভাল ভাবেই দেখেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, জান সে কে ছিল? ইনি ছিলেন জীব্রাঈল (আঃ)। আমাকে প্রতিবেশীর হক্ব সম্পর্কে তাগিদ করেছিলেন এবং আমার খেয়াল হচ্ছিল যে, হয়তো প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকার দেয়া হবে। (মসনদে আহমদ)

وَابْنِ السَّبِيْلِ

প্রবাসী মুসাফিরের প্রতি কর্তব্য

অর্থাৎ মুসাফির, প্রবাসী, পথিক, মেহমান– এসবই এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে আল্লাহ পাকের এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে তার প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করা উচিত। আর যে আল্লাহ পাক ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে তার মেহমানের আদর আপ্যায়ন করা উচিত। যে আল্লাহ পাক ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তার রসনা থেকে ভাল কথা আসবে অথবা সে নীরব থাকবে।

হযরত আবু শোরাইহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে আল্লাহ পাক ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার কতর্ব্য হলো মেহমানের এক দিন রাত্র মেহমানদারী করা আর মেহমানদারীর হুকুম তিন দিনের। এরপর হলো খয়রাত। মেজবানকে কষ্ট দেয়ার জন্যে তার নিকট পড়ে থাকা মেহমানের জন্যে বৈধ নয়।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৮
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭৫

শ্রমিকের অধিকার

وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

অর্থাৎ গোলাম বাঁদী-তথা পরিচারক পরিচারিকা, খাদেম খেদমতগারের সাথেও ভাল ব্যবহার কর। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ গোলাম-বাঁদীদের পানাহারের দায়িত্ব তাদের মনিবের উপর অর্পিত। তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কাজের কষ্ট না দেয়াও মনিবের কর্তব্য। (মুসলিম শরীফ)

আর হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ গোলাম বাঁদী (চাকর-চাকরানী) তারা তোমাদের ভাই বোন। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। অতএব, আল্লাহ্ পাক যার অধীনে তার ভাইকে এনে দিয়েছেন তার কর্তব্য হলো যা নিজে খাবে তাই তাকে খাওয়াবে। আর যা নিজে পরিধান করবে, তাই তাকে পরিধান করাবে। তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ তার দ্বারা নেবে না, যদি কোন কাজ তার সাধ্যাতীত হয় তবে নিজেও সে কাজে তাকে সাহায্য করবে। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আমার গোলামকে প্রহার করছিলাম, এমন সময় পেছন থেকে কার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করলাম। "তোমার যে শক্তি এ গোলামের উপর রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তি আল্লাহ পাকের রয়েছে তোমার উপর"। আমি পেছনের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলাম, স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে আরয করলাম "সে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত"। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ যদি তুমি তা না করতে তবে অগ্নি তোমার নিকট পৌঁছেই গিয়েছিল। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর এন্তেকালের পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় এরশাদ করেছিলেন, তোমরা নামাজ এবং গোলাম-বাঁদীর হক্বের প্রতি খেয়াল রেখো।
(আবু দাউদ, আহমদ)

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তিনটি কথা এমন যার মধ্যে তা পাওয়া যাবে, আল্লাহ পাক তার মৃত্যু সহজ করে দেবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

(১) দুর্বলদের সঙ্গে বিনম্র ভাষায় কথা বলা।

(২) পিতা-মাতার সঙ্গে বিনয়ী ভাব প্রকাশ করা।

(৩) গোলাম বাঁদীর (চাকর-চাকরানী) সাথে ভাল ব্যবহার করা। (তিরমিজী)

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা খাদেমদেরকে দৈনিক কতবার ক্ষমা করব? একথা শ্রবণ করে তিনি নীরব রইলেন। সে ব্যক্তি পুনরায় সে প্রশ্ন করলো। এবারও তিনি নীরব রইলেন। যখন লোকটি তৃতীয়বারও এ প্রশ্ন করলো তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ দৈনিক ৭০ বার মাফ কর। (তিরমিজী)

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) এবং হযরত সাহাল এবনে হানজালা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদিন পথিমধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি দুর্বল উষ্ট্র দেখলেন যার পেট পিঠের সঙ্গে লেগে আছে। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমরা এ বে-জবান জন্তুগুলো সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। যদি এগুলো আরোহনের যোগ্য হয় তবে আরোহন কর আর যদি ছেড়ে দেয়ার যোগ্য হয় তবে ছেড়ে দাও (আরোহন করোনা)। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি কি বলবো তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ লোক কে? মন্দ সে ব্যক্তি যে একাই তার সম্পদ ভোগ করে, যে গোলামকে বেত্রাঘাত করে এবং কোন লোককে কিছু দেয় না।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

আয়াতের মর্মকথা

পূর্ববর্তী আয়াতে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ পাকের প্রতি, এরপর মানুষের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের আদেশ রয়েছে। শুধু মানুষই নয়; সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতি কর্তব্য পালনের কঠোর নির্দেশ রয়েছে এ আয়াতে। কিন্তু যেসব মানুষের অন্তর অহংকারে পরিপূর্ণ, যাদের স্বভাবে আত্ম গরিমা ও ঔদ্ধত্য রয়েছে তারা মানবতার মান রক্ষা করে না, মানুষের প্রতি অন্য মানুষের যে কর্তব্য রয়েছে তা পালন করেনা। তাই এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক এমন লোকদেরকে পছন্দ করেন না যারা আত্ম গরিমায় লিপ্ত, আত্মাভিমানে মগ্ন, যারা অহংকারী। বস্তুতঃ যারা অহংকারী যারা নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করে তারা আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং গরীব-দুঃখীর প্রতি দয়াদ্র হয়না। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি অহংকারের কারণে নিজের পোষাক জমিনের উপর দিয়ে টেনে নেয় (যে টাখনুর নীচে পোষাক পরিধান করে) কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার প্রতি রহমতের নজরে দেখবেন না। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত ইয়াজ (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা পরস্পর বিনয় প্রকাশ কর, একে অন্যের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করোনা, বাড়াবাড়ি করোনা। (মুসলিম)

হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হে মুসলমানগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জান্নাতের খুশবু হাজার বছরের দূরত্ব থেকেও উপলব্ধি করা যাবে (অর্থাৎ যে পথ অতিক্রম করতে হাজার বছর সময় দরকার এতদূর থেকে বেহেশতের খুশবু পাওয়া যাবে) কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান তা পাবে না। আত্মীয়তার বন্ধন বিনষ্টকারী, বৃদ্ধ ব্যাভিচারী, যে অহংকারের কারণে নিজের পরিধেয় বস্ত্র মাটিতে টেনে নিয়ে যায় সে এ খুশবু পাবে না। অহংকার শুধু বিশ্ব প্রতিপালককেই মানায়। (তেবরানী)

اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হাই এববে আখতাব, রোফা এবনে যায়েদ এবনে তাবুত, উসামা এবনে হাবীব, নাফে এবনে আবি নাফে, বাহারী এবনে আমর নামক ইহুদীদের সম্পর্কে। এ ইহুদীরা মদীনাবাসী মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করতো এবং তাদেরকে পরামর্শ দিত যে, যেসব কল্যাণকর কাজে তোমাদেরকে অর্থ সম্পদ ব্যয় করার কথা বলা হয় তোমরা তাতে ব্যয় করোনা। তোমাদের দরিদ্র হওয়ার আশঙ্কা আমরা করি। তোমরা জাননা ভবিষ্যতে কি হবে (এবনে এসহাক, এবনে জরীর)।[১] যেহেতু ইহুদীরা মুসলমানদেরকে কৃপণতা অবলম্বনের জন্যে কুপরামর্শ দিত তাই তাদের সম্পর্কে এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ যারা নিজেরা কৃপণ, যারা আল্লাহর প্রদত্ত ধন-সম্পদ লুকিয়ে রাখে, মানুষের মধ্যে বিতরণ করেনা, এমনকি অন্য মানুষকেও কৃপণতার দুর্নীতি অবলম্বনের পরামর্শ দেয় আল্লাহ্ পাক শুধু যে তাদেরকে পছন্দ করেন না তাই নয়, বরং এমন কাফেরদের জন্যে অত্যন্ত অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দানবীর ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, জান্নাতের নিকটবর্তী

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭৯

থাকে এবং মানুষেরও কাছে থাকে তথা জনপ্রিয় হয় আর দোযখ থেকে দূরে থাকে। আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ পাক থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং দোযখের নিকটবর্তী থাকে।

আর জাহেল দানবীর আল্লাহ পাকের দরবারে কৃপণ এবাদতকারী থেকে অধিক প্রিয়। (তিরমিজী)

হযরত আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ জান্নাতে প্রবেশ করবে না প্রতারক, অশান্তি সৃষ্টিকারী কৃপণ এবং কারো প্রতি উপকার করে সে উপকারের কথা যে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে ইহুদীদের সম্পর্কে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন, যেসব ইহুদী তৌরাতে বর্ণিত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী প্রকাশে কার্পণ্য করতো এবং তাঁর প্রশংসা এবং গুণাবালীর কথা গোপন রাখতো তাদের সম্পর্কেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ পাক এমন কাফেরদের জন্যে অত্যন্ত অপমানজনক শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন।[১]

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ۝
وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ
اللّٰهُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ
وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

তরজমা

(৩৮) এবং যারা শুধু লোক দেখানোর জন্যে স্বীয় ধন-দৌলত দান করে এবং আল্লাহ পাক ও কেয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস করে না, আর যার সাথী হয় শয়তান, অত্যন্ত নিকৃষ্ট সাথী তার।

(৩৯) যদি তারা আল্লাহ তায়ালা ও কেয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস করতো এবং আল্লাহ তায়ালা যে রিয্ক দান করেছেন তা যদি তাঁর রাস্তায় ব্যয় করতো তবে

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৯৮

তাদের কি ক্ষতি হতো? এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমস্ত বিষয়ে অবগত আছেন।

(৪০) নিশ্চয় আল্লাহ পাক এক বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেন না। আর যদি কোন নেক কাজ থাকে তবে তার সওয়াব দ্বিগুণ প্রদান করেন এবং তাঁর নিকট থেকে শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার দান করেন।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে মুনাফেকদের সম্পর্কে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে দান করতো না; বরং দান করতো শুধু লোক দেখানোর জন্যে। ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেন, এ আয়াত সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকারের মত হলো এই, আয়াতখানি নাযিল হয়েছে মক্কার কোরায়শদের সম্পর্কে যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতো।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক আদেশ দিয়েছেন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, অনাথ-বিপদগ্রস্ত, পাড়া-প্রতিবেশী, পথিক-মুসাফির, গোলাম-বাঁদী তথা সকলের জন্যে দান করতে, সকলকে সাহায্য করতে, যারা এ আদেশ অমান্য করে তারা দু' দল, একদল যারা কৃপণতার কারণে এ আদেশ পালন করেনি তাদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ........عَذَابًا مُّهِيْنًا

আর দ্বিতীয় দল সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, তারা পূর্ববতী দলের ন্যায় গরীব দুঃখীকে দান করা থেকে বিরত থাকে না; বরং দান করে কিন্তু আল্লাহর হুকুম পালনের উদ্দেশ্য দান করে না; বরং শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করে। যারা আল্লাহর রাহে দান করতে চির বিমুখ, আর যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করতে অভ্যস্ত এদের পরিণাম শোচনীয় কেননা, আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান নেই এবং আখেরাতের প্রতিও তাদের ঈমান নেই। এজন্যে তারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং আখেরাতের সওয়াব লাভের আশায় ব্যয় করে না, অথচ আল্লাহ পাকের নির্দেশ হলো হক্কদারদের হক্ক আদায় কর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্য অর্জনের আশায়। কিন্তু মুনাফেক, ইহুদী তথা কাফেররা হয় আল্লাহর পথে ব্যয় থেকে বিরত থাকতো

অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করতো, উভয় পন্থাই নিন্দনীয়, মহাপাপ এবং গুরুতর অপরাধ। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন সৎ কাজ করাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গোপন শেরক বলে অভিহিত করেছেন এবং এমন অন্যায় কাজ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিশেষভাবে তাগিদ করেছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমি শেরক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, যদি কেউ এমন কাজ করে যাতে আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করে তবে আমি তার শেরক মিশ্রিত আমলকে ছেড়ে দেব। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট। সে ব্যক্তির আমল তারই জন্যে হবে যার জন্যে সে তা করেছে। (মুসলিম)

হযরত মাআজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, লোক দেখানোর সামান্য ইচ্ছাও শেরকের অন্তর্ভুক্ত। সুদ্দীর (রঃ) মতে আয়াতখানি মুনাফেকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আয়াতখানি মক্কার মুশরেকদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দুশমনীতে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করত।[১]

লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দানের ব্যর্থতা

আলোচ্য আয়াতে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান না করার বিশেষ নির্দেশ রয়েছে। কেননা, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করলে শুধু যে দানের সাধনা ব্যর্থ হবে তাই নয়, বরং তার ভয়াবহ পরিণামও ভোগ করতে হবে। এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) কয়েকখানি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। এই হাদীস বিশেষভাবে এ যুগের জন্যেও তাৎপর্যবহ। কেননা, বর্তমান যুগেও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করতে দেখা যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তিকে হাযির করানো হবে। একজন দানবীর, যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করতো তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি কি সৎ কাজ করে এসেছ? সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার রাহে অনেক দান করে এসেছি। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ তুমি তো এজন্যে দান করেছ যেন মানুষ তোমাকে দানবীর বলে আর তারা তা বলেছে। অতএব, আমার নিকট তোমার কোন বিনিময় নেই। অতঃপর আল্লাহ পাক তাকে দোযখে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দান করবেন। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হাযির করানো হবে সে একজন আলেম। জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কি করে এসেছ? সে জবাব দেবে, হে আল্লাহ! সারা জীবন আপনার কথা প্রচার করে এসেছি। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ তুমি তো তা এজন্যে করেছ যেন দুনিয়ার মানুষ তোমাকে বড় আলেম বলে, আর তা বলা হয়েছে।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৯৯-১০০
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮০

অতএব, আমার নিকট তোমার কোন বিনিময় নেই। এ ব্যক্তিকেও দোযখে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়া হবে।

এরপর হাযির করা হবে একজন শহীদকে। জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি কি আমল নিয়ে এসেছ? সে বলবে, হে আল্লাহ! আপনার রাহে নিজের প্রাণ বিলীন করে এসেছি। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, তুমি তো তা এজন্যে করেছ যেন দুনিয়ার মানুষ তোমাকে বীর পুরুষ বলে আর তা বলেছ। অতএব, আমার নিকট তোমার কোন বিনিময় নেই। এরপর তাকেও দোযখে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়া হবে।

দান কবুল হওয়ার জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয় আবদুল্লাহ এবনে জাদআন আরবের একজন বিখ্যাত দানবীর ব্যক্তি ছিলেন। সে ফকীর মিসকীনদের অনেক দান করেছে এবং অনেক গোলাম আজাদ করেছে। সে কি তার এ আমলের দ্বারা উপকৃত হবে?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ না, কেননা সে একদিনও একথা বলেনি, হে আল্লাহ! আমাকে কেয়ামতের দিন মাফ করে দিও। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এজন্যেই তো আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

যারা লোক দেখানোর জন্যে দান করে তারা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করেনা। এরপর এরশাদ হয়েছে যে, এরা শয়তানের ফাঁদে পড়েছে। আর শয়তান তাদের সাথী হয়েছে এবং শয়তান হলো অত্যন্ত নিকৃষ্ট সাথী। আর কবি বলেছেনঃ

عن المرء لا تسأل .... يقتدى

(কোন মানুষ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করোনা; বরং তার সাথীদের অবস্থা জানতে চেষ্টা কর কেননা, প্রত্যেক সাথীই তার অন্য সাথীর অনুসারী হয়।)[১]

অতঃপর আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫ খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৭

(আর তাদের কি ক্ষতি হতো যদি তারা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান আনতো?) অর্থাৎ যদি তারা কৃপণতা এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করার এ অন্যায় পন্থা পরিহার করতো, আর আল্লাহ পাক ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করতো তবে তাদের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি তো হতোই না, বরং তারা বিশেষভাবে লাভবান হতো।

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ

(আর যে অর্থ-সম্পদ আল্লাহ পাক দান করেছেন তা থেকে কিছু অংশ আল্লাহর রাহে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যয় করলে কি ক্ষতি হতো?)

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, কিছু অংশের দ্বারা যাকাতের অর্থ বোঝানো হয়েছে যা ৪০ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা ২.৫০ টাকা। আর তাও নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হলে এবং সে সম্পদ এক বছর মালিকের নিকট থাকলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ৪০ টাকায় এক টাকা আল্লাহর রাহে দান করা। আর এটি কোন কঠিন কাজ নয়।

আলোচ্য আয়াতের একটি বাক্য বিশ্ব মানবের চক্ষু উন্মীলিত করার জন্যে যথেষ্ট। বাক্যটি হলো

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ

(আর তারা যদি ব্যয় করতো সে সম্পদ থেকে যা আল্লাহ পাক তাদেরকে দান করেছেন উপজীবিকা হিসেবে।) এ বাক্যে সুস্পষ্ট ভাষায় এ বিস্মৃত সত্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পৃথিবীতে যার কাছে যা আছে সবই আল্লাহ পাকের দান, আল্লাহ পাক দান করেছেন বলেই তোমরা পেয়েছ। অতএব, তোমরা ঐ সম্পদের মূল মালিক নও, এর মূল মালিক স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন। অতএব, আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ থেকে তাঁর রাহে ব্যয় করার ব্যাপারে কার্পণ্য করা বা ইতঃস্তত করা অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করা সবই গুরুতর অপরাধ। মানুষ যদি এ সত্যটি স্মরণ রাখে যে, ইতিপূর্বে এ পৃথিবীতে আমি ছিলাম না এবং কিছুদিন পরে থাকবোও না। শুধু কয়েক দিনই এ পৃথিবীতে আমার অবস্থান। এমনিভাবে এ ধন-সম্পদও আমার ছিল না এবং কিছুদিন পর থাকবেও না। শুধু কয়েক দিনই আমাদের কাছে আল্লাহর দান স্বরূপ এসেছে। অতএব, আল্লাহর রাহে দান করার ব্যাপারে কার্পণ্য করা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। তবে সে ব্যক্তির জন্যে আল্লাহর রাহে দান করা কঠিন হবে না; বরং আল্লাহর রাহে দান করাকে সৌভাগ্য মনে করবে এবং দান করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করবে, যে প্রকৃত মোমেন হবে।

وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيمًا

আর আল্লাহ্ পাক তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। কে আল্লাহর রাহে কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যয় করে তা আল্লাহর অজানা নয়। তাই যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাহে দান করে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ১০ থেকে ৭০০শ' গুণ পর্যন্ত সওয়াব দান করেন। পক্ষান্তরে যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করবে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে শাস্তি দেবেন। কেননা, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। মানুষের কর্মের নিয়ত অনুসারেই তাকে ফল দেয়া হবে। আল্লাহ্ পাক সুবিচার করেন। জুলুম করেন না। আর এজন্যে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক কারো প্রতি বিন্দুমাত্রও জুলুম করেন না, কারো কণামাত্রও হক্ব বিনষ্ট করেন না। কাফেরদের যে শাস্তি হবে তা তাদের অন্যায় অনাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই অন্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ الاية

(যে বিন্দুমাত্র সৎ কাজ করবে সে অবশ্যই তার শুভ পরিণতি লাভ করবে। আর যে বিন্দুমাত্র মন্দ কাজ করবে অবশ্যই তাকে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে।) এজন্যেই কাফেরদের জন্যে আল্লাহ্ পাক যে শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন তা জুলুম নয়; বরং সুবিচার। বরং যদি তাদেরকে শাস্তি না-ও দেয়া হয় তবে তা হবে অবিচার।

আল্লামা বগবী লিখেছেন, হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোমেনের কোন নেক আমলের সওয়াব কম করা হবেনা। দুনিয়াতে তার বদৌলতে তাকে অধিক রিয্ক দেয়া হবে আর আখেরাতে তার জন্যে রয়েছে উত্তম বিনিময়।

কাফেরের সৎ কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই হয়

পক্ষান্তরে, কাফের যদি দুনিয়াতে কোন সৎ কাজ করে তবে তাকে রিয্কের আকৃতিতে দুনিয়াতেই তার বদলা দেয়া হবে। আখেরাতে তার কোন নেকী থাকবেনা যার সওয়াব পেতে পারে। (আহমদ, মুসলিম)

নাজাতপ্রাপ্ত মোমেনের আরযী

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন মোমেন ব্যক্তি দোযখ থেকে নাজাত পেয়ে নিশ্চিন্ত হবে তখন তার যে সব আত্মীয়-স্বজনকে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়েছে

তাদের সম্পর্কে আল্লাহ দরবারে আরযী পেশ করতে থাকবে। হে আল্লাহ্! তারা আমাদের ভাই, আমাদের সঙ্গে নামাজ আদায় করতো, রোজা রাখতো, হজ্ব করতো। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ যাও যাদেরকে চিনতে পার তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে নিয়ে আস। মোমেনগণ যাবে এবং যাদের পরিচয় পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে কেননা, তাদের চেহারা অগ্নিদগ্ধ হবে না। কারো পায়ের কিছু অংশ অগ্নিদগ্ধ হবে। তখন মোমেনগণ আরজ করবে হে আমাদের প্রতিপালক! যাদেরকে বের করার হুকুম তুমি দিয়েছিলে তাদেরকে আমরা বের করেছি। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ তোমরা পুনরায় যাও এবং যাদের অন্তরে সামান্যতম ঈমানও থাকে তাদেরকে বের করে নিয়ে আস। মোমেনগণ সে হুকুম পালন করবে। আল্লাহ পাক পুনরায় আদেশ করবেন যার অন্তরে কণা মাত্র ঈমান থাকবে তাকেও বের করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ্ পাকের এ হুকুম পালন করা হবে।

বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি এ সত্য উপলব্ধি করতে অপরাগ হয় তবে সে যেন আলোচ্য আয়াত পাঠ করেঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ الاية

“নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক কারো এক তিলার্ধ পরিমাণ হক্বও বাকী রাখেন না, কারো প্রতি বিন্দুমাত্রও জুলুম করেন না। যদি কারো নেক আমল থাকে তবে তার সওয়াব দ্বিগুণ বর্ধিত করেন, আর নিজের কাছ থেকেও বিরাট সওয়াব দান করে থাকেন”।

এরপর মোমেনগণ আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরয করবেনঃ হে পরওয়ারদেগার! তুমি যাদেরকে দোযখ থেকে বের করার আদেশ দিয়েছ আমরা তাদের সকলকে বের করেছি। এখন আর এমন কেউ নেই যার অন্তরে এতটুকু কল্যাণ রয়েছে। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ ফেরেশতাগণ সুপারিশ করেছে, আম্বিয়ায়ে কেরাম সুপারিশ করেছে এবং মোমেনগণ সুপারিশ করেছে তবে এখনও আরহামার রাহিমীন বাকী রয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ অতঃপর আল্লাহ্ পাক দোযখ থেকে এক মুষ্টি কি দু' মুষ্টি এমন লোকদের বের করবেন যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে কোন সময় নেক কাজ করেনি এবং তারা দোযখের অগ্নিতে পুড়ে কয়লায় পরিণত হয়ে গেছে।। তাদেরকে এনে আবে হায়াতে ফেলা হবে। ফলে বন্যার কারণে যে কাদা সৃষ্টি হয় তাতে যেভাবে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় ঠিক সেভাবে তারাও নব জীবন লাভ করবে এবং তাদের দেহ মুক্তার মত চমকাতে থাকবে, তাদের ঘাড়ে মোহর লাগানো থাকবে যে, তাদেরকে আল্লাহ্ পাক মুক্তি দিয়েছেন (অর্থাৎ তাদের নিজেদের কোন নেক আমল ছিল না)। আল্লাহ্ পাক হুকুম

দেবেন তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের যা আকাঙ্খা তা তোমরা পাবে আর যে বস্তুর প্রতি তোমরা দৃষ্টিপাত কর তা তোমাদের হবে। তারা আরয করবে হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদেরকে এমন কিছু দান করেছ যা হয়তো কাউকে দান করোনি। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ আমার নিকট তোমাদের জন্যে এর চেয়ে বড় নেয়ামত রয়েছে। তারা আরয করবে হে পরওয়াদেগার তা কি? আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ তা হলো আমার সন্তুষ্টি। অতএব, আমি আর তোমাদের প্রতি রাগ করবো না। (বগবী)

ইমাম বোখারী ও মুসলিম (রঃ) এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তবে তাতে হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) একথাটি নেই যে– "যদি কেউ এর সত্যতা উপলব্ধি না করে সে যেন এ আয়াত পাঠ করে"।[১]

আখেরাতের দৃশ্য

হযরত এবনে আমর এবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে (কেয়ামতের দিন) জন সম্মুখে হাযির করা হবে। তার আমলনামার ৯৯টি দফতর খোলা হবে। প্রত্যেকটি দফতর এত লম্বা হবে যে, যতদূর মানুষের দৃষ্টি পৌঁছে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ আমলনামায় তোমার যে বিবরণ রয়েছে তার কোনটি কি তুমি অস্বীকার কর? অথবা আমলের বিবরণ লেখকরা তোমার প্রতি কি কোন প্রকার জুলুম করেছে?

বন্দা আরয করবে, আমার প্রতি কোন জুলুম করা হয়নি এবং আমি কোন বিবরণকে অস্বীকারও করিনি। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ কোন গুনাহর জন্যে তুমি কি কোন ওজর-আপত্তি পেশ করবে? বন্দা হতভাগ্য অবস্থায় আরয করবে, না এমন কিছু নেই। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ আমার নিকট তোমার একটি নেকী আছে। আজ তোমার প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। এরপর কাগজের একটি ছোট্ট টুকরা বের করা হবে। তাতে লিপিবদ্ধ থাকবে–

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

(অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বন্দা এবং রসূল।) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ যখন তোমার আমলের পরিমাপ হবে তখন তুমি উপস্থিত থাকবে। বন্দা আরয করবে, হে আমার মালিক, এই ছোট্ট কাগজের টুকরাটি ঐ বড় বড়

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮১-৮২

দফতরের মোকাবেলায় কি গুরুত্ব পাবে? আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ তোমার প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না। অতঃপর সমস্ত দফতরগুলোকে একটি পাল্লায় রাখা হবে, আর ঐ কাগজের টুকরাটি অন্য পাল্লায় রাখা হবে। তখন যে পাল্লায় দফতর থাকবে তা উপরে উঠে যাবে এবং যে পাল্লায় ছোট্ট কাগজের টুকরাটি থাকবে তা ভারী হবে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের নামের মোকাবেলায় কোন জিনিষই ওজনদার হবে না। (এবনে মাজাহ, এবনে হাব্বান, হাকেম)

বস্তুতঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাকের এ ঘোষণা এভাবেই ঘটনায় পরিণত হবে। জুলুম আল্লাহ পাক কারো প্রতি কোন সময়ই করেন না, করবেন না। ইহকালেও না, পরকালেও না। বন্দা সর্বদাই গুনাহ করে থাকে অথচ আল্লাহ্ পাক সর্বদা দয়া করে থাকেন। এজন্যে এরশাদ হয়েছেঃ

غَلَبَتْ رَحْمَتِىْ عَلٰى غَضَبِىْ

(আমার রহমত আমার গজবের উপর প্রাধান্য পেয়েছে।)

কোন কোন আলেমের মতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ্ পাক কারো প্রতি কারো হক্ব রাখবেন না। আর কারো কণা মাত্রও এমন হক্ব রাখবেন না, যার বিনিময় না দেয়া হয় বরং কারো যদি কোন নেক আমল থাকে তবে তার বহু গুণ সওয়াব দান করবেন। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا

যদি কারো কোন নেক আমল থাকে তবে আল্লাহ্ পাক তার কয়েক গুণ সওয়াব দান করবেন। এজন্যে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) শপথ করে বলেছেন, আমি স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ এতে কোন সন্দেহ নেই, আল্লাহ্ পাক একটি নেকীকে বাড়িয়ে হাজার হাজার নেকীতে পরিণত করবেন। (এবনে জরীর, এবনে আবি শায়বা)

وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا

আর আল্লাহ্ পাক নিজের তরফ থেকে তথা নিজের দয়া ও মেহেরবানীতে যার একটি নেকী রয়েছে তার জন্যে নির্ধারিত সওয়াব দান করার পর মহান বিনিময় দান করবেন। এ বাক্যটি সম্পর্কে আল্লামা বগবী (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ পাক যখন "আজরে আজীম" শব্দটি ব্যবহার করেছেন তখন কত সওয়াব দান করবেন তা কল্পনাতীত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক পূর্বাপর সমস্ত লোককে একত্রিত করবেন এবং একজন ঘোষক এ ঘোষণা করবে, খবরদার! সকলে হুশিয়ার হও এবং যার যে হক্ব আছে তা গ্রহণ করার জন্যে হাযির হও। তখন সকলে খুশি হবে। পিতা বা ভ্রাতা বা অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন যার কাছে যা হক্ব আছে তা পাওয়া যাবে এবং প্রত্যেককে তলব করা হবে এবং একজন ঘোষক ঘোষণা করবে এই ব্যক্তি অমুক, যদি কারো তার প্রতি হক্ব থাকে তবে তা গ্রহণের জন্যে সে হাযির হোক। আর তাকে বলা হবে তুমি লোকদের হক্ব আদায় কর। সে ব্যক্তি আরয করবে, হে আমার পরওয়ারদেগার! দুনিয়া শেষ হয়ে গেছে এখন আমি কোথা থেকে তাদের হক্ব আদায় করবো? আল্লাহ পাক তখন ফেরেশতাদের আদেশ দেবেন তার আমল দেখ, আর সে আমল দ্বারা হক্বদারের হক্ব আদায় কর। যখন এ বন্দার সামান্য আমলই বাকী থাকবে তখন ফেরেশতাগণ আরয করবে, হে আমাদের মালিক, এ ব্যক্তির অতি সামান্য আমলই বাকী রয়ে গেছে। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ আমার বন্দার জন্যে এ নেক আমলকে কয়েক গুণ করে দাও এবং আমার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করাও। একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণই রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। পক্ষান্তরে যদি এ বন্দা বদ নসীব হয় তবে ফেরেশতাগণ বলবে, হে আমাদের মা'বুদ, এ ব্যক্তির সমস্ত নেক আমল শেষ হয়ে গেছে অথচ তার হক্বদার এখনও বাকী রয়েছে গেছে। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ হকদারের গুনাহগুলো নিয়ে তার গুনাহকে আরো বাড়িয়ে দাও। অতঃপর দোযখে পৌঁছে দাও (এবনে আবি হাতেম, আবু নাঈম, বগভী, এবনে মোবারক)।

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾

তরজমা

(৪১) তখন তাদের কি অবস্থা হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে সাক্ষী হাযির করবো? (হে রসূল!) আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী উপস্থিত করব।

(৪২) সেদিন যারা কাফের হয়েছে এবং (আমার) রসূলের কথা অমান্য করেছে তারা আকাঙ্খা করবে হায়! যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেতে পারতো, আর তারা আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে কোন কথাই গোপন রাখতে পারবে না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক কারো প্রতি জুলুম করবেন না এবং প্রত্যেক জালেম থেকে মজলুমের হক্ব নিয়ে দেবেন। এমনি বিপজ্জনক মুহূর্তে কাফেরদের কি অবস্থা হবে? যারা আল্লাহ পাকের হক্ব আদায় করেনি এবং বন্দার হক্বও আদায় করেনি। তাই এ আয়াতে এ প্রশ্ন তোলা হয়েছে–

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক যখন প্রত্যেক উম্মতের আচার-আচরণ ও আমল বর্ণনা করার জন্যে একজন সাক্ষী পেশ করবেন তখন এ কাফেরদের কি অবস্থা হবে? বর্ণিত আছে, প্রত্যেক উম্মতের পয়গম্বরকেই তাঁর উম্মতের আমলের সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হবে এবং সমস্ত উম্মতের সাক্ষী হিসেবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পেশ করা হবে।

প্রতিদিন উম্মতের আমল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে পেশ করা হয়

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মোবারক (রঃ) সাঈদ এবনে মোসাইয়্যেব (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রতি দিন সকাল সন্ধ্যায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উম্মতের আমল পেশ করা হয়। তিনি বিশেষ চিহ্নের মাধ্যমে সে আমল সমূহের পরিচয় পান, আর এজন্যেই তিনি কেয়ামতের দিন সমগ্র উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন। কোন কোন তফসীরকারের মতে আলোচ্য আয়াতে

هٰؤُلَاءِ

শব্দটি আম্বিয়ায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। তখন এ অর্থ হবে প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতের আমল সম্পর্কে সাক্ষী হবেন। আর সমস্ত নবীগণের সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষী হবেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, এ উম্মতের ঈমানদারগণ অন্য নবীগণের সম্পর্কে এ সাক্ষ্য দেবেন যে, তারা সত্য বলেছেন। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মোমেনদের এ সাক্ষ্যকে সত্যায়িত করবেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাক্ষী হবেন সকল নবীর সত্যতার ব্যাপারে

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত একখানি হাদীস সংকলন করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা

করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করে আমাকে শোনাও। আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! পবিত্র কোরআন তো আপনার প্রতিই নাযিল হয়েছে। আর আমি তা আপনাকে পাঠ করে শোনাব? তিনি এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ। আমি তাঁর হুকুম মোতাবেক সূরা নেছা তেলাওয়াত করি। যখন আমি

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا

পর্যন্ত পৌঁছি তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ এ পর্যন্তই শেষ কর। আমি তখন দেখলাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নয়ন যুগল থেকে অশ্রু ঝরছে।[১]

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ

কেয়ামতের সেই কঠিন দিনে যারা কাফের, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবাধ্য হয়েছিল তারা এ আকাঙ্খা করবে, যদি তারা মাটির সঙ্গে মিশে যেতো কত ভাল হতো! যেভাবে মৃতকে দাফন করার পর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয় অথবা যেভাবে চতুঃষ্পদ জন্তুকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয় তাদের আর পুনরুত্থান হয় না, আর যেভাবে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا

"সেদিন কাফেররা বলবে, "হায় আক্ষেপ! যদি আমরা মাটি হতাম" অর্থাৎ মাটি হলে এ কঠিন কঠোর আযাবের সম্মুখীন হতাম না।

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا

"স্মরণ কর সেদিনকে, যেদিন তোমাদের প্রত্যেকেই তার ভাল-মন্দ কাজকে চোখের সম্মুখে দেখতে পাবে। সেদিন সে ইচ্ছা করবে যদি তার ও তার কার্যাবলীর মধ্যে দূরত্ব হতো তবে খুবই ভাল হতো"।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮৫
তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১০৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৯
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৪

কাফেরদের আকাঙ্খা

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াতের অর্থ হলো, যারা পৃথিবীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর হুকুমকে অমান্য করেছে সেদিন তারা এ আকাঙ্খা করবে, যদি জমিন ফেটে যেতো এবং আমরা তাতে প্রবেশ করতাম অথবা মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যেতাম তবে কত ভাল হতো! এ ব্যাখ্যা করেছেন কাতাদা এবং আবু ওবায়দা। আর কালবী বলেছেন, সেদিন কাফেররা আকাঙ্খা করবে যেভাবে চতুঃস্পদ জন্তুকে আল্লাহ পাক আদেশ দেবেন তোমরা মাটি হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে তারা মাটি হয়ে যাবে, যদি এমন আদেশ তাদেরকেও দেয়া হতো তবে কত ভাল হতো!

وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا

(আর তারা আল্লাহ পাকের নিকট থেকে কোন কথা গোপন রাখতে পারবে না।)

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর অর্থ হলো কাফেররা আকাঙ্খা করবে যদি তারা মাটির সঙ্গে মিশে যেতো পারতো তবে ভাল হতো, আর যদি তারা দুনিয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে সব গুণাবলী তওরাতে উল্লেখিত হয়েছে সেগুলো গোপন না করতো তবে কত ভাল হতো!

এ আয়াতের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই, কাফের মুশরেকরা যখন কেয়ামতের দিনের কঠিন মসিবত দেখবে এবং মুসলমানদেরকে আল্লাহ পাক ক্ষমা করছেন এবং কাফেরদের আল্লাহ পাক ক্ষমা করছেন না তাও দেখবে, তারা শপথ করে বলবে আমরা মুশরেক ছিলাম না। তারা এ আশায় মিথ্যা বলবে যে, হয়তো আল্লাহ পাক একথা বললে তাদেরকে ক্ষমা করবেন। তারই জবাবে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ সেদিন আল্লাহ পাকের নিকট তারা কোন কথা গোপন রাখতে পারবে না। এমনকি আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অর্থাৎ আজকের দিনে আমি তাদের রসনাকে মোহরাঙ্কিত করে দেব, তাদের হাতগুলো আমাদের সঙ্গে কথা বলবে। তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে তাদের পদযুগল সাক্ষ্য দেবে। অতএব, কেয়ামতের দিন কোন কথাই গোপন রাখা যাবে না।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮৬

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَ
لَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى
اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ
فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ
اَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

তরজমা

(৪৩) হে মোমেনগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাক তখন নামাজের নিকটবর্তীও হয়োনা, যে পর্যন্ত না তোমরা ভালভাবে বুঝতে পার যা তোমরা মুখে বল এবং নাপাক অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়োনা, যে পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর (তথা পবিত্র হও) আর যদি তোমরা অসুস্থ থাক অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীজনকে স্পর্শ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তৈয়ম্মুম কর। (উক্ত মাটি দ্বারা) স্বীয় চেহারা এবং হাতগুলো মুছে ফেল। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক পাপ মোচনকারী ও অতীব ক্ষমাশীল।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

মদ্যপান হারাম হওয়ার পূর্বে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে দুটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

(১) বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) কয়েকজন বিখ্যাত সাহাবীকে তাঁর বাড়ীতে দাওয়াত করলেন। তখনও মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়নি। তাই আহারের পর মদ্যপানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর মাগরেবের নামাজের সময় হলো। তাঁদের একজনের ইমামতিতে নামাজ আদায় করলেন। যেহেতু নেশাগ্রস্ত ছিলেন তাই সূরা ভুল পড়লেন।

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ এর স্থলে اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ পাঠ করলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হলো। এরপর নামাজের পূর্বে তাঁরা মদ্যপান করতেন না। যদি কেউ করতেনও তবে এশার নামাজের পর, যাতে করে ফজর পর্যন্ত নেশা দূর হয়ে যায়। মদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হবার পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থাই বিদ্যমান ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) যখন এ ঘটনার সংবাদ পেলেন তখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! মদ্যপানের কারণে মানুষ বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, আমাদেরকে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করুন। তখন সূরা মায়েদার আয়াত নাযিল হয়।

(২) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরামের একটি দল সম্পর্কে মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পূর্বে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তখন তাঁরা মদ্যপান করতেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামাজ আদায়ে হাযির হতেন। এ আয়াত দ্বারা তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।[১]

আবু দাউদ, তিরমিজী হযরত আলী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) আমাদের জন্যে খাবার তৈরী করান এবং পানাহারের পর আমাদেরকে মদ্য পান করান। এ ঘটনা মদ হারাম হবার পূর্বের। আমরা তখন নেশাগ্রস্ত হই। এমন অবস্থায় নামাজের সময় হয়। আমাকে লোকেরা ইমাম নির্বাচন করে। আমি নামাজে 'সূরা কাফেরুন' পড়ি এবং ভুল পড়ি, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[২]

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى

(হে মোমেনগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের কাছেও যেয়োনা যে পর্যন্ত না তোমরা ভাল ভাবে বুঝতে পার যা মুখে বল।) এ আয়াত নাযিল হবার পর মুসলমানগণ মদ্যপান থেকে বিশেষভাবে নামাজের সময় বিরত থাকতেন। অবশেষে যখন সূরা মায়েদার আয়াত নাযিল হবার মাধ্যমে মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় তখন সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমরা আর কখনও মদ্যপান করবো না।

য্যাহাক এবনে মোজাহেমের মতে আলোচ্য আয়াতে নেশার অর্থ নিদ্রার নেশা। অর্থাৎ তন্দ্রাহত অবস্থায় নামাজ আদায়ে বিরত থাকার নির্দেশ রয়েছে এ আয়াতে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নামাজের মধ্যে কেউ যদি তন্দ্রাহত হয় তার উচিত একটু ঘুমিয়ে

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১০৭-০৮
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮৭

নেয়া। কেননা, তন্দ্রাহত অবস্থায় হয়তো সে আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার ইচ্ছা থাকলেও ঘুমের ঘোরে গালি দিয়ে বসবে। (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, এবনে মাজাহ)

নামাজে সতর্কতা অবলম্বন

এ আয়াতে একথার তাগিদ রয়েছে যে, নামাজী মাত্রকে অত্যন্ত মনযোগ সহকারে নামাজ আদায় করতে হয়। যা কিছু তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছে তা যেন সে বুঝতে পারে এবং অর্থও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। আর যেসব জিনিস তার মনকে এদিক সেদিক করে তা থেকে যেন সে বিরত থাকে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে যাহ্যাকের মতামত লিপিবদ্ধ করার পর বলেছেন যে, সত্য হলো এ আয়াত মদ্যপান সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আরবী ভাষায় اَلسُّكْرُ বা নেশা বলতে মদ্যপানের নেশাকেই বোঝানো হয়। অতএব, আয়াতের এ অর্থই গ্রহণযোগ্য হবে। আর এ মতের সমর্থন করে আল্লামা কুরতবীও বলেছেন যে, এখানে নেশা অর্থে মদ্যপানের নেশাকেই বোঝানো হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, যাহ্যাক ব্যতীত আর সকলেরই এ মত।[২]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত মনসুখ হয়েছে সূরা মায়েদার এ আয়াত দ্বারাঃ

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا

আর মুজাহেদ বলেছেন, এ আয়াত মনসুখ হয়েছে মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা সম্পর্কীয় আয়াত দ্বারা।

وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا

আর যখন তোমাদের গোসলের প্রয়োজন হয় (ফরজ হয়) তখন গোসল না করা পর্যন্ত নামাজের কাছে যেয়োনা। আলোচ্য আয়াতে মূল বক্তব্য এ দুটি কথা (১) তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ আদায় করোনা, (২) এমনিভাবে যানাবতের অবস্থায় অর্থাৎ কামাচার বা স্বপ্নদোষের কারণে যদি দেহ অপবিত্র হয় তবে এ অবস্থায়ও নামাজ আদায় করোনা। কেননা, নেশাগ্রস্ত হওয়া, মাতলামী করা বিনয় ও তন্ময়তার প্রতিবন্ধক অথচ নামাজে বিনয় ও তন্ময়তা বা খুশু খুজু অত্যাবশ্যক। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১০৯-১০
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮৮

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ۝ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

"নিশ্চয় সে মোমেনগণই সফলকাম হয়েছে যারা তাদের নামাজে ভীত সন্ত্রস্ত এবং বিনীত অবস্থায় হাযির হয়"।

এমনিভাবে যানাবতের অবস্থায় যখন মানুষের উপর গোসল ফরজ হয়, যখন মানব দেহ অপবিত্র অপরিচ্ছন্ন হয় তখনও নামাজ আদায় করা নিষিদ্ধ। কেননা, নামাজের জন্যে পবিত্রতা অর্জন পূর্ব শর্ত।

অতএব, নেশাগ্রস্ত হওয়ার পর যতক্ষণ না নিজের কথা নিজে বুঝতে পারে তথা হুশ ফিরে না আসে এবং গোসল ফরজ হলে, যে পর্যন্ত না গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে ততক্ষণ নামাজ নিষিদ্ধ। কেননা, বিনয় ও তন্ময়তার অভাবে এবং অপবিত্রতার কারণে নামাজের মহান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ

অর্থাৎ যখন গোসল ফরজ হয় তখন গোসল না করে নামাজ আদয় করোনা কিন্তু যদি তোমরা ভ্রমণরত থাক আর সফরের অবস্থায় পানি না পাওয়া যায় অথবা অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহারের সাধ্য না থাকে, তবে তৈয়ম্মুম করে নামাজ আদায় করতে হবে।

তৈয়ম্মুমের বিধান

এ পর্যায়ে হযরত আসলা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমত করতাম। উষ্ট্রের পৃষ্ঠদেশে মালপত্র রেখে দিতাম। একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ দিলেন– "আসলা! উষ্ট্রের পৃষ্ঠে মাল পত্র রেখে দাও"। আমি আরজ করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার উপর গোসল ফরজ হয়ে গেছে অথচ শীতের রাত, শীতল পানি দ্বারা গোসল করলে মৃত্যু অথবা অসুস্থতার ভয় আছে। তখন জিব্রাঈল (আঃ) তৈয়ম্মুমের আয়াত নিয়ে আসেন। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে তৈয়ম্মুম করে দেখালেন। একবার পবিত্র মাটিতে হাত রেখে তা দ্বারা চেহারা মসেহ করলাম। অনুরূপভাবে আরেকবার উক্ত মাটির উপর হাত রেখে দু' হাতের কনুই পর্যন্ত মসেহ করলাম। এভাবে তৈয়ম্মুম শেষ করে আমি উষ্ট্রের পৃষ্ঠের উপর মালপত্র বেধে দিলাম। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত এমরান এবনে হোসায়েন (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যার উপর গোসল ফরজ হয়েছে কিন্তু গোসলের জন্যে পানি না পাওয়া অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তৈয়ম্মুম করার হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু যখন পানি পাওয়া গেছে তখন তাকে গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন।

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ

যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমাদের কেউ স্ত্রী গমন করে এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তৈয়ম্মুম কর। তোমাদের চেহারা এবং হাতকে মসেহ কর। যে অসুস্থ সে পানি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়না। আর যে সফরে থাকে সে পানি পায় না এমনি অবস্থায় তৈয়ম্মুম করে নামাজ আদায়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

কিন্তু পরে যদি পানি পাওয়া যায় তবে পুনরায় নামাজ আদায় করা জরুরী হবে না। হযরত আবুজর (রাঃ) "রবজা" নামক স্থানে অবস্থান করতেন। সেখানে কিছুদিন পানি পাওয়া যেত না। হযরত আবুজর (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমার জন্যে মাটি যথেষ্ট। যদি দশ বছরও পানি না পাওয়া যায়। মুলতঃ ইসলাম পবিত্রতা অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। যে কোন মূল্যে যে কোন অবস্থায় পবিত্রতা অর্জন করার নির্দেশ রয়েছে ইসলামে, এর ফজিলত ও মাহাত্ম বর্ণনাতীত।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, মুসলমান যখন অজু করার সময় মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার চেহারার সমস্ত গুনাহ বিধৌত হয়ে দূরীভূত হয়।

হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার অজুর ন্যায় অজু করে দু' রাকাআত নামাজ আদায় করে এবং সেই নামাজে অন্য কোন প্রকার ওয়াস ওয়াসা বা খেয়াল না আসে তবে এর বরকতে আল্লাহ পাকের রহমতে বিগত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

তৈয়ম্মুমের বিধান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য

যদি পবিত্রতা অর্জনের জন্যে পানি না পাওয়া যায় তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তৈয়ম্মুম করবে, এটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চতম মর্যাদার কারণে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত। কেননা, মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি আর কোন উম্মতকে প্রদান করা হয়নি।

বায়হাকী সঠিক সূত্রে হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন। এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমাকে কয়েকটি কারণে ফজিলত দান করা হয়েছে (১) সারা পৃথিবীর জমিনকে আমার এবং আমার উম্মতের জন্যে মসজিদ এবং পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ হিসেবে বানানো

হয়েছে। এখন কোন ব্যক্তি নামাজ পড়তে চাইলে জায়নামাজ যদি না থাকে তবে জমিনকে জায়নামাজ হিসেবে পাবে এবং মাটিকে পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ হিসেবে পাবে। (২) সমগ্র মানব জাতির জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রেরিত হওয়া। আর দু' মাসের পথের দূরত্ব থেকে দুশমনের ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া এবং (৩) মালে গনিমত তথা যুদ্ধ লব্ধ সম্পদকে হালাল ঘোষণা করা। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমাকে পাঁচটি এমন জিনিস দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কোন নবীকে দেয়া হয়নি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ পাঁচটি জিনিসের মধ্যে একটি বলেছেন যে, জমিনকে আমার জন্যে মসজিদ এবং পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।[১]

এ পর্যায়ে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, যদি কেউ এমন স্থানে উপস্থিত হয় যেখানে পানি না থাকে যদ্বারা অজু বা গোসল করা যায়। আর যদি পবিত্র মাটিও না পাওয়া যায় যদ্বারা তৈয়ম্মুম করবে যেমন বিমান যোগে আকাশ পথে ভ্রমণের সময় এমন অবস্থা হয়- এ পরিস্থিতিতে নামাজ কিভাবে আদায় করা হবে?

আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেনঃ যেহেতু অজু বা তৈয়ম্মুমের কোন ব্যবস্থা হয় না সেজন্যে ঐ সময় নামাজ ছেড়ে দেবে এবং পরে কাজা আদায় করবে। ইমাম মালেক (রঃ)-এর মতে নামাজ ছেড়ে দেবে আর কাজা ওয়াজিব হবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, এভাবেই নামাজ আদায় করে নেবে, আর যখন পানি পাওয়া যায় তখন অজু করে পুনরায় সে নামাজ আদায় করবে। আর ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে, এভাবেই নামাজ আদায় করে নেবে, পরে পুনরায় আদায় করাও জরুরী হবে। হানাফী মাযহাবের দলিল হলো আলোচ্য আয়াত কেননা, এতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا

এ আয়াতে গোসল ফরজ হলে নামাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ নিষিদ্ধ অবস্থার অবসান ঘটবে পানি পাওয়া গেলে গোসলের মাধ্যমে। এখন যে ব্যক্তি গোসলের জন্যে পানি এবং তৈয়ম্মুমের জন্যে মাটিও পেল না তার নামাজের নিষিদ্ধ অবস্থার অবসান ঘটলো না। অতএব সে ঐ সময় নামাজ পড়বে না, পরে কাজা করবে।[২]

তৈয়ম্মুমের হেকমত

এ আয়াতের তফসীরে বিশেষ করে তৈয়ম্মুমের হেকমত সম্পর্কে আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) লিখেছেনঃ হতে মুখে মাটি দ্বারা মসেহ করলে

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১১১
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১১৮

নিঃসন্দেহে তাতে বিনয় এবং হীনতা প্রকাশ পায়। তৈয়ম্মুমের এ পন্থার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের দরবার থেকে মাগফেরাত লাভ সহজ হয়। যেহেতু দেহ মনের পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে মাটির প্রভাব অনস্বীকার্য আর পানির স্থলে অন্য যে কোন বস্তু অপেক্ষা মাটি অধিকতর সহজলভ্য, তাই অজু গোসলের প্রয়োজনে যে পানি ব্যবহার করতে পারে না তার জন্যে মাটি দ্বারা তৈয়ম্মুমের পন্থা নির্বাচন একান্ত যুক্তিযুক্ত। এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, মানুষ নিজেই মাটি দ্বারা প্রস্তুত, মাটিই মানুষের মূল উপকরণ। অতএব, তৈয়ম্মুমের আদেশের মাধ্যমে মানুষকে তার মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করার একটি পন্থা অবলম্বনের তা'লিম দেয়া হয়েছে। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, পানির অভাবে তৈয়ম্মুমের অনুমতি দান করা এবং মাটিকে পানির স্থলাভিষিক্ত করা মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের মহান দান।[১]

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

নিশ্চয় আল্লাহ পাক পাপ মোচনকারী, অতীব ক্ষমাশীল। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজে পবিত্র কোরআন ভুল পড়ার যে অপরাধ হয়েছিল এ বাক্যে আল্লাহ পাক তার মাগফেরাতের সুস্পষ্ট আশ্বাস দিয়েছেন। কেননা, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং পাপ মোচনকারী। এ বাক্য দ্বারা যেন একথা এরশাদ হয়েছে যে, ইতিপূর্বে যা কিছু করেছ তা মাফ করে দিলাম কিন্তু হুশিয়ার হও! ভবিষ্যতের জন্যে কোন দিন যেন এমন অন্যায় না হয়।

প্রণিধানযোগ্য কয়েকটি বিষয়

আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য (১) এ আয়াতে لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ শব্দটির অর্থ হলো যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, এর তাৎপর্য হলো শুধু স্পর্শ করা, আর এ অভিমতই পোষণ করতেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে, এর অর্থ হলো স্ত্রীকে শুধু স্পর্শ করা নয়; বরং স্বামী-স্ত্রীর মিলন। আর এ অভিমতই পোষণ করতেন হযরত আলী (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ), আবু মূসা (রাঃ) এবং হাসান (রঃ) ও কাতাদা (রঃ)। স্ত্রীকে শুধু স্পর্শ করলে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে অজু বিনষ্ট হয় না, ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) মতে অজু বিনষ্ট হয়।[২]

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১০৯
২। খোলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৯০-৯১

فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً

(২) (যদি তোমরা পানি না পাও) পানি না পাওয়ার তাৎপর্য ব্যাপক। পানি যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়া অথবা পানি পাওয়ার পরও ব্যবহারের সাধ্য না থাকা যেমন শত্রুর ভয় থাকা অথবা যার পানি তার তরফ থেকে ব্যবহারে বাধা দেয়া অথবা পানি এত সামান্য যে, তা যদি অজু গোসলে ব্যবহার করা হয় তবে পিপাসায় মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। অথবা রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা হয় অথবা শীতল পানি ব্যবহারে অসুস্থ হবার আশঙ্কা থাকা প্রভৃতি।

আর পানি না পাওয়ার আরও একটি পন্থা হলো পানি এত মাইল দূরে থাকা অথবা পানির মূল্য দ্বিগুণ বা তার চেয়ে বেশী হওয়া, বা পানি আছে কূপে কিন্তু কূপ থেকে পানি তোলার জন্যে উপকরণ তথা বালতি রশি নেই– এসবই পানি না পাওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

طَيِّبًا

(৩) এর অর্থ হলো পবিত্র। অর্থাৎ তৈয়ম্মুম করতে হবে পবিত্র মাটি দ্বারা। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে, যদি নিয়ত ব্যতীত অজু করা হয় তবে তা নামাজের জন্যে যথেষ্ট কিন্তু সওয়াব পাওয়া যাবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, নিয়ত ব্যতীত অজু করলে তা অজুই হবে না। কিন্তু তৈয়ম্মুমের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফার (রঃ)-এর নিকটও নিয়ত শর্ত। কেননা, পানিই হলো পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ। পানির অভাবে যখন তৈয়ম্মুম করা হয় তখন তাতে নিয়ত শর্ত হবে। এতদ্ব্যতীত তৈয়ম্মুম শব্দটির অর্থ হলো ইচ্ছা করা। তাই তৈয়মম শুদ্ধ হবার জন্যে নিয়ত শর্ত।

(৪) যেহেতু তৈয়ম্মুম অজুর স্থলে তাই যেসব কারণে অজু বিনষ্ট হয় তৈয়ম্মুমও সেসব কারণে বিনষ্ট হবে। আর যেভাবে একটি অজু কয়েক নামাজের জন্যে যথেষ্ট হয় ঠিক এমনিভাবে একই তৈয়ম্মুম কয়েক নামাজের জন্যে যথেষ্ট হবে। যদি বালু উড়ে এসে গায়ে মুখে পড়ে, আর সে বালু দ্বারা যথানিয়মে মসেহ না করা হয় তবে তৈয়ম্মুম হবে না। কিন্তু যদি বালু উড়ে এসে শরীরে পড়ে এবং কেউ পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করে তা দ্বারা মসেহ করে তবে তৈয়ম্মুম হবে। আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য তাহলো গোসল বা অজুর পরিবর্তে তৈয়ম্মুম করা হলে তৈয়ম্মুম একই নিয়মে হবে, এতে কোন পার্থক্য হবে না। আর অজু এবং গোসল উভয়ের ক্ষেত্রে একই তৈয়ম্মুম যথেষ্ট হবে।

তৈয়ম্মুমের অনুমতি

পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পানির অভাব হলে অথবা পানির ব্যবহার সম্ভব না হলে ইসলামী শরীয়ত তৈয়ম্মুমের বিধান পেশ করেছে। এর পেছনে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হাদীস শরীফে উল্লেখিত রয়েছে। মসনদে আহমদ রয়েছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত আসমা (রাঃ) (হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বড় বোন) থেকে একটি হার ফেরত দেয়ার কথা দিয়ে নিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে হারটি সফরে কোথাও হারিয়ে যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সে হারটির খোঁজে কয়েকজন লোককে নির্দেশ দেন। অবশেষে হার পাওয়া যায় কিন্তু হার অনুসন্ধানের সময় নামাজের সময় হয়ে যায় অথচ তাঁদের নিকট ছিল না পানি। এ অবস্থায় তাঁরা অজু ব্যতীতই নামাজ আদায় করেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ অবস্থার বিবরণ দান করেন। তখন তৈয়ম্মমের আদেশ নাযিল হয় (যদি তোমরা পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তৈয়ম্মুম কর)। সে সময় হযরত উসায়েদ এবনে হোজায়ের (রাঃ) বললেন, হে আয়েশা! আল্লাহ পাক তোমাকে সওয়াব দান করুন। আল্লাহ পাকের শপথ করে বলছি, যখনই তোমার কোন কষ্ট হয় তখন তোমার এবং মুসলমানদের জন্যে কল্যাণ সাধিত হয়। বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা কোন এক সফরে ছিলাম। বিদায়েন অথবা জাতুল যায়শ নামক স্থানে আমার হারটি কোথাও পড়ে যায়। হার অনুসন্ধানের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর কাফেলার যাত্রা থেমে যায়। তখন আমাদের নিকটও পানি ছিল না এবং সে ময়দানে কোথাও পানির খোঁজ পাওয়া গেল না। তখন লোকেরা এসে আমার আব্বা হযরত আবু বকরের (রাঃ) নিকট অভিযোগ করতে লাগলো দেখুন, তাঁর জন্যে আমরা কি বিপদে পড়ে গেছি। তখন আব্বাজান আমার নিকট আসলেন। সে সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার উরুর উপর মাথা মোবারক রেখে ঘুমিয়ে ছিলেন। আব্বাজান এসেই আমাকে বললেন, তুমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য লোকদেরকে সফর থেকে বিরত রেখেছ অথচ তাঁদের নিকট পানি নেই, আর কোথাও পানির সন্ধান পাওয়াও যাচ্ছে না। যাহোক আব্বাজান আমাকে অনেক ধমক দিলেন। রাগান্বিত হয়ে আরো কত কথা বললেন। এমনকি আমার পায়ে নিজের হাত দিয়ে চাপড় মারলেন। কিন্তু আমি এতটুকুও নড়াচাড়া করলাম না। যাতে করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিশ্রামের ক্ষতি না হয়। রাত অতিবাহিত হলো। সকালে লোকেরা জাগ্রত হলো কিন্তু পানি ছিল না। তখন আল্লাহ পাক তৈয়ম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন এবং সবাই তৈয়ম্মুম করলো। এই সময় হযরত উসায়েদ এবনে হোজায়ের (রাঃ) এ মন্তব্য করেছিলেন (যা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি)।

এরপর যখন আমাদের উটকে উঠানো হলো যার উপর আমি আরোহন করেছিলাম তার নিচেই হার পাওয়া গেল।

এবনে জরীর বর্ণনা করেন, ইতিপূর্বে হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি রাগান্বিত হয়ে অনেক কথা বলেছিলেন কিন্তু তৈয়ম্মুমের বিধান নাযিল হবার পর অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁর কন্যা হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট আসলেন এবং বললেন, তুমি অত্যন্ত মোবারক, তোমার কারণেই মুসলমানদেরকে এত বড় সহজ বিধান প্রদান করা হলো।[১]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا
نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا
السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ
وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا
بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَ
اسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ
بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

তরজমা

(৪৪) তোমরা কি তাদেরকে দেখোনি? যাদেরকে (আসমানী) কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে (তবুও) তারা গোমরাহীকে ক্রয় করে নিয়েছে, আর তারা কামনা করে যে তোমরাও গোমরাহ হয়ে যাও।

(৪৫) এবং আল্লাহ পাক তোমাদের শত্রুদেরকে ভাল ভাবেই জানেন, আর বন্ধু হিসেবে, সহায়করূপে (তোমাদের জন্যে) আল্লাহ পাক যথেষ্ট।

(৪৬) ইহুদীদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর পাকের পবিত্র কালামকে তার নিদৃষ্ট স্থান থেকে পরিবর্তন করে এবং বলে আমরা শুনলাম, তবে অগ্রাহ্য করলাম এবং

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৬-৩৭

তারা বিকৃত মুখে ধর্মের উপর দোষারোপ করার মানসে বলে, শোনা যায় না শোন, আর এ শব্দটিও বলে থাকে যে, "রায়েনা" এবং যদি তারা বলতো যে, আমরা শুনেছি এবং অনুসরণ করেছি এবং আমাদের কথা শোন, আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর তবে তা অবশ্যই তাদের জন্যে ভাল এবং সুসঙ্গত হতো কিন্তু তাদের কুফরীর দরুণ আল্লাহ পাক তাদের উপর লা'নত করেছেন। পরিণামে তাদের অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনবে।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

মোহাম্মদ এবনে এসহাক হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ইহুদীদের একজন সরদারের নাম ছিল রোফা এবনে যায়েদ এবনে তাবুত। সে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বলতো তখন তার জিভ টেনে কথাকে বিকৃত করে এমনভাবে বলতো যেন তার কথা এবং তার কথার বিকৃত অর্থ অন্যরা বুঝতে না পারে এবং এভাবে সে বলতো যে, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি আমাদের প্রতি মনোনিবেশ করুন। এরপর সে ইসলামের উপর দোষারোপ করতো এবং ইসলামের সমালোচনা করতো। 'রায়েনা' এ বাক্যটির দুটি অর্থ। একটি হলো আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, আর অন্য কথাটি হলো হে আমাদের রাখাল! প্রকাশ্যে সে বলতো আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন কিন্তু মুখ বিকৃত করে এমনভাবে বলতো যেন তার অর্থ হয় হে আমাদের রাখাল! এমনভিাবে তারা বলতো

وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ

অর্থাৎ আপনি শুনুন, অপ্রিয় কথা যেন আপনাকে শুনকে না হয় অথচ তারা এ বাক্য দ্বারা একথা উদ্দেশ্য করতো যে, কিছুই যেন শুনতে না পাও। এ দূরাত্মা ইহুদীদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) দূরাত্মা ইহুদী রোফা এবনে যায়েদের সঙ্গে মালেক এবনে দোখশামের নামোল্লেখ করেছেন যে, তারা উভয়ে এ অন্যায় কাজটি করতো।

ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে মুনাফেক সরদার আবদুল্লাহ এবনে উবাইয়ের নামও উল্লেখ করেছেন।[২]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৪
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২০

ইহুদীদের জঘন্য প্রকৃতির নমুনা

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইহুদীদের দুর্নীতি, অনাচার এবং জঘন্য প্রকৃতির একটি নমুনা পেশ করেছেন। তারা হেদায়েতের বদলে গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতাকে ক্রয় করেছে। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ পাকের যে মহান বাণী নাযিল হয়েছে তাকেও তারা অস্বীকার করেছে। হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ গ্রন্থে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যেসব গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে সে সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো গোপন করেছে এবং অর্থ-সম্পদের হীন লিপ্সা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তৌরাতের বিবরণকে পরিবর্তন করেছে। তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তাই আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে সতর্ক করে বলেছেন, আল্লাহ পাক তোমাদের শত্রুদের খুব ভালভাবেই জানেন। তোমরা বরং তাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পার না। অতএব, আল্লাহ পাকের নির্দেশের উপর নিশ্চিত থাক এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। ইহুদীদের ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাক। মনে রেখো, তোমাদের কল্যাণ সাধনের জন্যে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। শত্রুর কথা চিন্তা না করে তোমরা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করতে থাক এবং দ্বীন ইসলামের উপর অটল অবিচল থাক।

يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ

(তারা ক্রয় করে গোমরাহীকে।)

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদীরা বলে বেড়াতো যে, অবশেষে সর্বশেষ নবী আগমন করবেন এবং তাঁর উসিলা ধরে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়াও করতো। কিন্তু যখন তাঁর আবির্ভাব হলো তখন তারা তাঁর নবুওয়্যতকে অস্বীকার করলো এবং ঈমানের স্থলে কুফরকে গ্রহণ করলো।

وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ

আর তারা শুধু যে নিজেরাই হেদায়েতের স্থলে গোমরাহী ক্রয় করেছে তাই নয়, বরং তারা (হে মোমেনগণ!) তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। যেভাবে তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করে ধ্বংসের পথ বেছে নিয়েছে ঠিক তেমনি দূরাত্মা ইহুদীরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে চায়। অতএব, তোমরা তাদেরকে কোন অবস্থাতেই কল্যাণকামী মনে করোনা; বরং তারা তোমাদের সবচেয়ে বড় দুশমন–

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ

(আর আল্লাহ পাক তোমাদের দুশমনকে তোমাদের চেয়ে বেশী জানেন।) তাই তিনি তাদের শত্রুতা সম্পর্কে তোমাদের অবগত করেছেন এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করছে সে সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। কোন কোন তফসীরকার এ বাক্যটির এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ পাক তোমাদের অবস্থা, তাদের দুর্নীতি এবং তাদের শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। অতএব, হে মোমেনগণ! তোমরা তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করোনা; বরং তাদেরকে এড়িয়ে চল।[১]

আল্লাহ পাকই মুসলমানদের অভিভাবক–

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا

আর অভিভাবক হিসেবে তোমাদের জন্যে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। তিনি তোমাদের উপকার করবেন, তিনিই তোমাদের মঙ্গল সাধন করবেন।

وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا

আর আল্লাহ পাকই তোমাদের সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট। তিনি তোমাদেরকে পরিপূর্ণ সাহায্য করবেন। তিনি তাদের সকল ষড়যন্ত্রকে বাতিল করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। অতএব, তোমরা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখ। আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নিকট সাহায্য কামনা করোনা।

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ

তৌরাতের বর্ণনাকে পরিবর্তন করা, তৌরাতে আল্লাহ পাকের যেসব বিধি-নিষেধ রয়েছে সেগুলোকে স্থানান্তরিত করা এবং তৌরাতের মধ্যে ভাষাগত ও মর্মগত পরিবর্তন করায় ইহুদীরা ছিল সিদ্ধহস্ত। যখনই তাদের নিকট তৌরাতের কোন বিধান স্বার্থহানিকর মনে হতো তখন তাতে তারা নিজেদের ইচ্ছা মাফিক পরিবর্তন করতো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তৌরাতে যে বিবরণ রয়েছে তাকেও তারা গোপন রাখতো। এ অন্যায় কাজ তারা হিংসার বশর্তী হয়েও করতো এবং লোভের কারণেও করতো। কেননা, যারা তাদের অনুগত ছিল তারা যদি ইসলাম কবুল করে তবে ইহুদী নেতাদের আয়-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৫

আল্লামা বগবী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতো এবং তিনি তাদের প্রশ্নের জবাব দিতেন প্রকাশ্যে। মনে হতো তারা সন্তোষজনক জবাব পেয়ে গেছে এবং তাঁর কথা তারা মেনে নিয়েছে। কিন্তু তারা সেখান থেকে উঠে গিয়ে তাঁর কথাকে পরিবর্তন করতো। এ বর্ণনার প্রেক্ষিতে একথা প্রমাণিত হয় যে, ইহুদীরা শুধু তৌরাতের ভাষাই পরিবর্তন করতো না, বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে যা বলতেন তাতেও তারা পরিবর্তন করতো।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, "তাহরীফে কালেমাত" অর্থাৎ কথার পরিবর্তনের আরও একটি ব্যাখ্যা হলো তারা আল্লাহর কালামের অর্থ তাদের নিজেদের ইচ্ছা মাফিক বর্ণনা করতো, যা প্রকৃত অর্থ নয় তাই বলতো, অথবা এর তাৎপর্য হলো, তারা এমন কথা বলতো যার অর্থ ভাল-মন্দ দু'ই হতে পারে।

وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাদের কোন নির্দেশ দিতেন তখন তারা বলতো শ্রবণ করলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুচ্চস্বরে বলতো আমরা মানি না। অথবা এর অর্থ হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা শ্রবণ করার পর তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে গিয়ে বলতো, আমরা শুনেছি তবে মানি না। এ দূরাত্মা ইহুদীরা সর্বদা একাধিক অর্থ বিশিষ্ট বাক্য ব্যবহার করতো। যেমনঃ

سَمِعْنَا

এর অর্থ হলো আমরা শুনেছি তথা কবুল করেছি। আরও এর আরও একটি অর্থ হলো আমরা শুনে নিলাম তবে মানলাম না। এরা প্রকাশ্যে প্রথম অর্থে এবং গোপনে দ্বিতীয় অর্থে এ বাক্যটি ব্যবহার করতো।

وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ

অর্থাৎ তারা বলতো, আমাদের কথা শ্রবণ করুন। এরপর বলতো শুনতে যেন না পাও। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলেম বলেছেন, এর অর্থ হলো তারা প্রকাশ্যে বলতো আমাদের কথা শ্রবণ কর আর মনে প্রাণে বলতো আল্লাহর হুকুম যেন হয় তুমি শ্রবণ না কর। এতদ্বারা তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বদ দোয়া দিত। মূলতঃ এ শব্দটি দু' অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে যথা তা'যীম এবং বদদোয়া। তা'যীমের অর্থে যখন বাক্যটি ব্যবহৃত হবে তখন তার অর্থ হবে আমাদের কথা শ্রবণ কর। আল্লাহ এ ব্যবস্থা করুন যেন তোমাকে কোন মন্দ কথা শ্রবণ করতে না হয়। আরেকটি অর্থ হলো, আমাদের কথা শ্রবণ কর, তুমি যেন বধির হয়ে যাও কিছুই যেন

তুমি শ্রবণ করতে না পার। এমনিভাবে তারা 'রায়েনা' শব্দটি ব্যবহার করতো। এ শব্দটিও দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন বা আমাদের প্রতি খেয়াল করুন।

দ্বিতীয়ত হিব্রু ভাষায় এটি একটি গালি। এর অর্থ হে আমাদের রাখাল! তারা এভাবে জিভ টেনে এমন ভঙ্গিতে বাক্যটি উচ্চারণ করতো যাতে সাধারণ মানুষ তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত না হয়। এরপর তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে একথা বলতো যে, যদি তিনি সত্য নবী হতেন তবে আমরা যে গোপন উদ্দেশ্যে এ বাক্যটি উচ্চাণ করছি তা তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন। আল্লাহ্ পাক তাদের সকল ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়েছেন এবং মুসলমানদেরকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাকের কালামই তাদের ষড়যন্ত্র এবং অভিসন্ধি ফাঁস করে দিয়েছে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

অর্থাৎ তারা যদি বলতো, আমরা শ্রবণ করেছি, মেনে নিলাম, আপনি শুনুন আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন তবে তাদের জন্যেই ভাল হতো। কিন্তু তাদের এ সৌভাগ্য হয়নি। নিজেদের অবিরাম কুফরী, দুষ্কৃতি, অন্যায় অনাচারের কারণে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি লা'নত দিয়েছেন। তারা অভিশপ্ত হয়েছে। তাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে জীবনকে ধন্য করতে পারেনি, শুধু হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে সালাম (রাঃ) এবং তাঁর কয়েকজন সঙ্গী ইসলাম গ্রহণ করে জীবনকে ধন্য করেছেন।[১]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا
فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ
اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا
دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا
عَظِيْمًا ۝ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ
يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝ اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ
الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৫

তরজমা

(৪৭) হে আহলে কিতাব! তোমরা ঈমান আন সেই কিতাবের উপর যা আমি নাযিল করেছি, যা সেই কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী যে কিতাব তোমাদের নিকট আছে। এর পূর্বে যে আমি বহু মুখমণ্ডলকে বিকৃত করবো এবং তাদেরকে উল্টো দিকে ফেরাবো অথবা শনিবারের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের যেভাবে আমি লা'নত করেছিলাম তাদেরকে সেরূপ লা'নত করার পূর্বে। আর আল্লাহ পাকের আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।

(৪৮) নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর সাথে শেরক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন, আর যে আল্লাহর সাথে শেরক করে সে অত্যন্ত মহাপাপে লিপ্ত হয়।

(৪৯) (হে রসূল!) আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি যারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে? বরং আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকেই পবিত্র হবার সুযোগ দেন এবং তাদের প্রতি নিতান্ত সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

(৫০) (হে রসূল!) দেখুন, তারা কিভাবে আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করছে, আর প্রকাশ্যে পাপ হিসেবে এটিই যথেষ্ট।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহ ইহুদীদের ইসলাম বিরোধী বিভিন্নধর্মী ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখিত হয়েছে। আর এ আয়াতে তাদের সেসব দুষ্কৃতি এবং দৌরাত্ম সম্পর্কে সতর্ক করতঃ তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

ইহুদীদের প্রতি সতর্কবাণী

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন কর। পবিত্র কোরআন তৌরাতের সত্যতা প্রমাণ করে, যা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে। যা তোমাদের নিকট আছে। মনে রেখো, এখনও সময় আছে। ইচ্ছা করলে তোমরা আত্মরক্ষার সুযোগের সদ্ব্যবহার কর। এক আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর, পবিত্র কোরআনের প্রতি এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আন। তোমাদের দৌরাত্ম-ষড়যন্ত্র, জুলুম-অত্যাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তোমাদের চেহারা বিকৃত করে পৃষ্ঠ দেশের দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার পূর্বে তোমরা ঈমান আন। যা কিছু করার অবিলম্বে কর। অথবা এমনও হতে পারে যেভাবে "আসহাবে সব্‌ত" তথা

যাদেরকে শনিবারে মাছ না ধরার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু তারা সে নির্দেশ অমান্য করে শনিবারে মাছ ধরেছিল। পরিণামে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে লা'নত দিয়েছিলেন। তারা বানরে রূপান্তরিত হয়েছিল। তোমাদের অবস্থাও তাদের মত হতে পারে। অতএব, তাদের মত শাস্তি হওয়ার পূর্বেই তোমরা আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও। আর আল্লাহ্ পাকের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হলো পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান। অতএব, তোমরা অবিলম্বে ঈমান আন।

তফসীরকারগণ লিখেছেন যে, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক যে শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন অর্থাৎ ইহুদীদের চেহারা বিকৃত হওয়া তা কেয়ামতের পূর্বে অবশ্যই হবে। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে, চেহারা বিকৃত হওয়ার এই আযাবের জন্যে শর্ত হলো ইহুদীরা যদি ঈমান না আনে। কিন্তু যেহেতু কিছু ইহুদী ঈমান এনেছে তাই তাদের চেহারা বিকৃত হওয়ার এ শাস্তি রহিত হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ইহুদীদের জন্যে দুটি শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। একটি হলো চেহারা বিকৃত করা, অপরটি হলো তাদের প্রতি লা'নত বা অভিশাপ দেয়া। যেহেতু তাদের প্রতি লা'নত দেয়া হয়েছে তাই চেহারা বিকৃত করার শাস্তি হয়নি। হযরত আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আমার মতে চেহারা বিকৃত করার সময় এখনও রয়ে গেছে। কেয়ামতের দিন ইহুদীদের চেহারা বিকৃত করা হবে।

এবনে এসহাক এবং খতিব হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআনের এ আয়াত–

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا

(সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে হাযির হবে) পাঠ করেন এবং এরশাদ করেন যে, আমার উম্মত (দাওয়াত) হাশরের দিন দশ দলে বিভক্ত হবে। এক দলের হাশর হবে বানরের আকৃতিতে। আর এক দলের হবে শুকরের আকৃতিতে, আর এক দলের হাশর হবে কুকুরের আকৃতিতে, আর এক দলের হাশর হবে গাধার আকৃতিতে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে সালামের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত নাযিল হবার সঙ্গে সঙ্গে যখন হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে সালাম (রঃ) এ আয়াত শ্রবণ করলেন তখন তিনি স্বগৃহে গমনের পূর্বে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন। চেহারা বিকৃত হওয়ার ভয়ে তাঁর হাত চেহারার উপর স্থাপন করে রেখেছেন। ঐ অবস্থাতেই তিনি আরয করলেন,

ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি অক্ষত অবস্থায় আপনার দরবারে হাযির হতে পারবো–এ আশা আমার ছিল না। একথা বলেই তিনি ইসলাম কবুল করলেন। এভাবে কা'বে আহবার সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগে এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্রই তিনি ইসলাম কবুল করেন, আর একথা বলতে শুরু করেনঃ হে আল্লাহ! আমি ইসলাম কবুল করেছি।

বর্ণিত আছে যে, কা'বে আহবার হেম্মাসের সফরে ছিলেন। সেখানে এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্রই তিনি ইসলাম কবুল করেন, এরপর স্বদেশ ইয়েমেনে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর পরিবারবর্গ সকলকে নিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হন।[১]

اَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ

(অথবা শনিবারের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের যেভাবে আমি লা'নত করেছিলাম তাদেরকে সেরূপ লা'নত করার পূর্বে) আসহাবু সাবতের ঘটনা হচ্ছে এই যে, সিরিয়ার কিছু ইহুদী সমুদ্রের তীরে এক বস্তিতে বসবাস করতো। তাদের পেশা ছিল মৎস্য শিকার। যেহেতু শনিবার দিন বনী ইসরাঈলের জন্যে বিশেষ এবাদতের দিন হিসেবে পরিগণিত, তাই এ দিন পেশাগত কাজ বা জাগতিক কাজ তাদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে শনিবার দিনই অধিক পরিমাণে মাছ ভাসমান দেখা যেতো। সপ্তাহের অন্যদিন এতটা হতো না। এদিকে ধর্মীয় বিধি-নিষেধের কারণে শনিবার মৎস্য শিকার করা সম্ভব হতো না। অবশেষে বনী ইসরাঈলের লোভ-লালসা চরিতার্থ করতে একটি ফাঁদ তৈরী করা হলো। সমুদ্রের তীর থেকে ইতঃস্তত দূরে তারা বড় বড় গর্ত করলো। সমুদ্র থেকে গর্ত পর্যন্ত নহর কেটে দিল। জোয়ারের সময় গর্তগুলোতে পানি আসতো, সঙ্গে আসতো মৎস্য। ভাটার সময় পানি চলে যেতো কিন্তু মৎস্য আটকা পড়তো। শনিবারে তারা মাছ শিকারে বিরত থাকতো ঠিকই কিন্তু রোববারে শনিবারের আটকা পড়া সমস্ত মাছ ধরে ফেলতো। সে যুগের যিনি নবী ছিলেন তিনি এবং দ্বীনদার লোকেরা আল্লাহর হুকুমের খেলাফ এ প্রতারণা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন কিন্তু তারা অবাধ্য হলো। কিছু লোক তাদেরকে সমর্থন করলো, আর কিছু লোক তাদের বিরোধিতাও করলো না সহযোগিতাও করলো না। অবশেষে আল্লাহর আযাব আসলো। পরিণামে যারা এ অন্যায় কাজে

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১২২
তফসীরে রুহুল মা'আনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৯-৫০
খোলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯৩
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১২৫-২৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা–৫ খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৯

লিপ্ত ছিল আর যারা এ অন্যায় কাজকে সমর্থন করেছিল এবং যারা এ ব্যাপারে বিরোধিতা না করে নীরব রইলো এদের সকলকে বানরে পরিণত করা হয়েছিল। যেসব নেককার লোক এ অন্যায়কে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন।

وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا

আর আল্লাহর আদেশ অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে। কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাকের পক্ষে কোন কাজই কঠিন নয়, তাঁর যে কোন আদেশ অবশ্যই কার্যকর হয়, এতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নেই। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনে যখনই আযাব নাযিল হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে তখনই তা নাযিল হয়েছে। অতএব, এ বাক্যটিতে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী এ মর্মে যে, তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত থাক।[১]

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ

শানে নুযুল

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে তেবরানী এবং এবনে আবি হাতেম হযরত আবু আনসারী (রাঃ)-এর একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে এ আরযী পেশ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার এক ভ্রাতঃষ্পুত্র নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত হয়না। তিনি এরশাদ করলেনঃ তার ধর্ম কি? সে ব্যক্তি বললো, নামাজ আদায় করে এবং আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসও করে। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তার নিকট থেকে তার ধর্মকে ক্রয় করে লও, সর্বপ্রথম তাকে বল, তুমি আমাকে তোমার ধর্মকে তোহফা হিসেবে দান কর। যদি অস্বীকার করে তবে তাকে বল তুমি তোমার নামাজ এবং অন্যান্য এবাদত আমার নিকট বিক্রি করে দাও। যদি তাতে অস্বীকার করে তবে একথা প্রমাণিত হবে যে, তার নিকট দুনিয়া থেকে দ্বীন অতি প্রিয়, এ ব্যক্তি হুকুম পালন করলো। কিন্তু তার ভ্রাতঃষ্পুত্র তার দ্বীনদারী বিক্রি করতে রাজি হলোনা। এমন অবস্থায় ঐ ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো এবং আরয করলোঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! তাকে আমি দ্বীনদারীর ব্যাপারে অত্যন্ত সুদৃঢ় পেয়েছি। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হলো।

১। তফসীরে মাজহারা খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১২৬-২৭
তফসীরে কবীর খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১২৩

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাঁর সাথে শেরক করাকে মাফ করবেন না। যদি কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুকে উপাস্য মেনে নেয় তবে তাকে মাফ করা হবে না। যদি কেউ মৃত্যু পর্যন্ত শেরক করতে থাকে তবে তাকে মাফ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু যদি কেউ শেরক থেকে তওবা করে এবং ঈমান আনে তবে আল্লাহ্ পাক তার অতীত জীবনের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করবেন। এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম একমত। যে গুনাহ্ থেকে তওবা করে সে বে-গুনাহ্ তথা নিঃষ্পাপ হয় যেমন কোরআনে করীমে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ

(হে রসূল!) আপনি কাফেরদেরকে বলুন, যদি তারা কুফর থেকে বিরত হয় তবে তাদের অতীত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।

وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

আর শেরক ব্যতীত অন্য গুনাহ্ আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেবেন। আর অন্য গুনাহ্ ক্ষুদ্রও হতে পারে বৃহৎও হতে পারে। ইচ্ছায় হতে পারে অনিচ্ছায়ও হতে পারে, আর যে তওবা ব্যতীত মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে তার ব্যাপারেও হতে পারে। কিন্তু মাগফেরাত আল্লাহ্ পাকের মর্জির উপর নির্ভর করে।

এবনে মুনজের এবং এবনে আবি হাতিম বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমরা ইতিপূর্বে কবীরা গুনাহ্কারীর জন্যে এস্তেগফার করতে বিরত থাকতাম। কিন্তু যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়ামাল্লামের নিকট এ আয়াত শ্রবণ করলাম-

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ

এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন যে, আমি আমার উম্মতের কবীরা গুনাহ্কারী লোকদের জন্যে শাফাআতের দোয়া সংরক্ষণ করেছি। তখন আমরা আমাদের ধারণা পরিত্যাগ করি এবং দোয়া করতে শুরু করি এবং কবুল হওয়ার আশাও করি।

ওয়াহ্শীর ইসলাম গ্রহণ

আল্লামা বগবী কালবীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, এ আয়াত ওয়াহ্শী এবনে হারব এবং তার সাথীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ওয়াহ্শী হযরত হামজা (রাঃ)-কে শহীদ

করেছিল। সে যে ব্যক্তির গোলাম ছিল সে বলেছিল, যদি তুমি হযরত হামজা (রাঃ)-কে শহীদ করতে পার তবে তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে। কিন্তু হযরত হামজা (রাঃ)-কে শহীদ করার পর তাকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছিল তা পূর্ণ করা হয়নি বলে মক্কায় এসে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয় এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ মর্মে চিঠি লেখে যে, আমরা আমাদের কৃত অন্যায়ের জন্যে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত। আমরা এখন মুসলমান হতে চাই, কিন্তু এ পথে সবচেয়ে বাধা হলো এ আয়াত–

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ-الاية

“যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মা’বুদ হিসেবে ডাকেনি, যারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেনি, যারা ব্যভিচার করেনি”। আমাদের দ্বারা এসব অন্যায় কাজ হয়েছে, যদি এ আয়াত না থাকতো তবে আমরা আপনার অনুসারী হতাম। তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا

(অর্থাৎ) কিন্তু যারা তওবা করে এবং নেক আমল করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত প্রেরণ করেন ওয়াহশী এবং তার সঙ্গীদের নিকট। তারা পুনরায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট লিখলোঃ এ শর্ত খুবই কঠিন, আমাদের ভয় হয়। কেননা, আমরা কোন নেক আমল করিনি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ

এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তাদেরকে প্রেরণ করেন। তখন তারা বললো, এ আয়াতে মাগফেরাতকে আল্লাহ পাকের মর্জির উপর ন্যস্ত রাখা হয়েছে। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে হয়তো আমরা সেসব লোকদের মধ্যে থাকবো না যাদের সম্পর্কে মাগফেরাতের মর্জি হবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

(হে রসূল!) আপনি আমার এ বাণী জানিয়ে দিন। বাণী হলোঃ “হে আমার বন্দাগণ, তোমরা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ তোমরা নিরাশ হয়োনা, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করবেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়”।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এ বাণী প্রেরণ করেন, তখন তারা মুসলমান হয় এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়। তিনি তাদের ইসলাম কবুল করেন, তখন তিনি ওয়াহশীকে জিজ্ঞাসা করেনঃ কিভাবে তুই হযরত হামজা (রাঃ)-কে হত্যা করেছিলি, তার বিবরণ পেশ কর। সে তখনকার অবস্থার বিবরণ পেশ করলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ "তোর মন্দ হোক", আমাকে তোর চেহারা দেখাবিনা। তখন ওয়াহশী সিরিয়া চলে যায় এবং আমৃত্যু সেখানেই থাকে।[১]

আল্লামা বগবী আবু মুসলিমের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন এ আয়াতঃ

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ

নাযিল হয় তখন এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়ে আরয করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাক সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন, কিন্তু কেউ যদি শেরক করে তবে তার কি অবস্থা হবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথার কোন জবাব দিলেন না। এরপর লোকটি দু' কি তিনবার দাঁড়িয়ে একই প্রশ্ন করল। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হলো।

সর্বাধিক আশাপূর্ণ আয়াত

আল্লামা বগবী একথাও লিখেছেন যে, পবিত্র কোরআনে সবচেয়ে আশাপূর্ণ আয়াত এটিই। আবু আলা এবং এবনে আবি হাতেম হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে বন্দা শেরক না করা অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার জন্যে মাগফেরাত বৈধ হলেও আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে আযাব ব্যতীত মাগফেরাত দিতে পারেন। অথবা ইচ্ছা করলে আযাব দেয়ার পর জান্নাতে প্রেরণ করতে পারেন।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক যদি কোন আমলের সওয়াব দানের অঙ্গীকার করে থাকেন, তবে অবশ্যই তিনি তা পূর্ণ করবেন। আর কোন ব্যক্তিকে যদি কোন আমলের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে থাকেন, তবে তাঁর ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিতে পারেন বা না-ও দিতে পারেন।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তেবরানী। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ একটি গুনাহ

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২৮-২৯

ক্ষমা করা হবে না। আর একটি গুনাহ তার বদল ব্যতীত ছেড়ে দেয়া হবেনা, আর একটি গুনাহ ক্ষমা করা হবে, যে গুনাহ ক্ষমা করা হবে না তা হলো শেরক। আর যে গুনাহ ক্ষমা করা হবে তাহলো আল্লাহ পাক এবং তাঁর বন্দার মধ্যকার হক্ব সম্পর্কীয় আর যে গুনাহ ছেড়ে দেয়া হবেনা তাহলো, যদি কোন বন্দার হক্ব বিনষ্ট করা হয়।

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا

আর যে আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করবে, সে অত্যন্ত বড় অপবাদ দিলো, তথা আল্লাহ পাকের শানে অত্যন্ত বড় মিথ্যারোপ করেছে। তফসীরকারগণ বলেছেনঃ

আলোচ্য আয়াতে শেরককে اِثْمًا عَظِيْمًا বলা হয়েছে। اِثْمًا অর্থ গুনাহ আর عَظِيْمًا অর্থ বড় তথা শেরক হলো অত্যন্ত বড় গুনাহ, আর এত বড় গুনাহ যার চেয়ে বড় গুনাহ আর নেই।

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, দুটি কথা অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কারণ হয়। লোকটি আরজ করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! কথা দুটি কি? তিনি এরশাদ করলেনঃ যে ব্যক্তি শেরক না করা অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে জান্নাতে গমন করল, আর যে শেরক করা অবস্থায় মারা গেল, সে দোযখে গমন করল। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হই তখন তিনি সাদা চাদর দেহ মোবারকে জড়িয়ে নিদ্রিত ছিলেন, দেখে আমি প্রত্যাবর্তন করলাম। এরপর আমি দ্বিতীয়বার হাযির হলাম। তখন তিনি জাগ্রত হয়েছিলেন, তিনি এরশাদ করলেনঃ যে বন্দা লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ বলল, অর্থাৎ (আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের প্রতি ঈমান আনল) আর এ অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হলো সে জান্নাতে যাবে। আমি আরয করলাম, যদি সে ব্যাভিচার এবং চুরির মত অপরাধে লিপ্ত হয়ে থাকে? তিনি এরশাদ করলেনঃ তবুও। আমি তিনবার আরয করলাম। তিনি প্রতিবারই একই উত্তর দান করলেন। অবশেষে তিনি এরশাদ করলেনঃ আবুজরের নাক মৃত্তিকা মিশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও (অর্থাৎ আবুজরের মর্জির খেলাফ হওয়া সত্ত্বেও সে জান্নাতে যাবে)।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ

শানে নুযুল

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ইহুদীরা তাদের শিশুদের উত্তম মনে করে তাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করত এবং শিশুদের পক্ষ থেকে কোরবানী দিতো। আর দাবী করত যে, আমাদের কোন গুনাহ

নেই। আমরা নিঃষ্পাপ। অর্থাৎ যেভাবে ইহুদীরা শিশুদেরকে নিঃষ্পাপ মনে করত ঠিক তেমনি নিজেদেরকেও নিঃষ্পাপ মনে করত, তখন এ আয়াত নাযিল হয়, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ

অর্থাৎ তুমি কি দেখেছ তাদেরকে যারা নিজেদেরকে নিঃষ্পাপ মনে করে? এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হতে পারে? কিন্তু কারো নিঃষ্পাপ দাবী করাতে সে নিঃষ্পাপ হয় না, বরং এতদ্বারা হীনমন্যতা প্রমাণিত হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) এবং সা'লাবী কালবীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কয়েকজন ইহুদী তন্মধ্যে বাহরী এবনে আমর, নোমান এবনে অওফা এবং মারহাব এবনে এজীদ গং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে তাদের শিশুদের নিয়ে হাযির হয়ে আরয করেছিল, "হে মোহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এই শিশুদের কোন গুনাহ হতে পারে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ না। তখন তারা বলল, আমরাওতো এদের মতো নিঃষ্পাপ। দিনে আমাদের দ্বারা যে পাপ কাজ হয় তা রাতে মাফ হয়ে যায়, আর রাতে যা পাপ হয় তা দিনে মাফ হয়ে যায়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। হাসান (রঃ) বর্ণনা করেন, যখন ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলল–

نَحْنُ اَبْنٰۤؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاۤؤُهٗ

অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্র পুত্র এবং প্রিয় (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)

আর তারা একথাও বলছে-

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْنَصٰرٰى

অর্থাৎ ইহুদী এবং খৃষ্টান ব্যতীত বেহেশতে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াত সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, ইহুদীরা একে অন্যকে পাপ পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র বলতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের বাড়ীতে গিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তার প্রশংসা করত এবং বলত আল্লাহর শপথ! আপনি এমন ব্যক্তি যে, আপনার কোন পাপ নেই, পাপাচার থেকে আপনি সম্পূর্ণ মুক্ত এবং পবিত্র। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

নবীগণ ব্যতীত কেউ নিঃষ্পাপ নয়

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আল্লাহর নবী ব্যতীত আর কাউকে নিঃষ্পাপ বা গুনাহ্ থেকে পবিত্র বলা শরীয়ত সম্মত নয়। মোমেন সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখার আদেশ রয়েছে কিন্তু পাপাচার থেকে মুক্ত এবং পবিত্র মনে করলে সে ব্যক্তির মনে অহংকার সৃষ্টি হতে পারে। তাই কোন ব্যক্তিকে এভাবে গুনাহ থেকে পবিত্র বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ

বরং আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র করেন, আর মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সকল অবস্থা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ পাকই অবগত।

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যদি আল্লাহ্ পাক দয়া করে কোন ব্যক্তিকে ওহী বা এলহাম দ্বারা গুনাহ্ থেকে পবিত্র হওয়ার কথা জানিয়ে দেন তবে অহংকার সৃষ্টি না হওয়ার শর্তে নিজের বা অন্যের সম্পর্কে এমন মন্তব্য করতে পারে, যেমন প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজের সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ আমি আদম সন্তানদের সরদার তথা সমগ্র মানব জাতির সরদার। আর আমার এ কথা গর্ব প্রকাশার্থে নয়।

যখন মুনাফেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বিতরণে সুবিচার না করার অপবাদ দিয়েছিল তখন তিনি এরশাদ করেছিলেনঃ আল্লাহর শপথ! আমার পরে তোমরা আমার চেয়ে অধিক সুবিচারক কোন ব্যক্তিকে পাবে না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আবু বকর এবং ওমর (রাঃ) জান্নাতের মধ্য বয়সী লোকদের সর্দার হবে, আর হাসান হোসাইন (রাঃ) জান্নাতের যুবকদের সর্দার। আর ফাতেমা (রাঃ) জান্নাতের স্ত্রীলোকদের সর্দার।

এমনিভাবে আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যেও 'এলহাম' এর মাধ্যমে জানতে পেরে কোন কোন ওলী এমন মন্তব্য করেছেন। যেমন হযরত গওসুল আযম (রঃ) বলেছিলেন, আমার কদম সকল ওলী আল্লাহর গর্দানের উপর স্থাপিত।

وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যাদেরকে পবিত্র করার ইচ্ছা করেন, তাদের পবিত্রতা অনুযায়ী সওয়াব প্রদান করা হবে এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে

না। অথবা এর অর্থ হলো, গুনাহ্ থেকে পবিত্র করার ব্যাপারে কোন প্রকার জুলুম করা হবে না। যে পবিত্র হওয়ার যোগ্য তাকে পবিত্র করা হবে, আর যে যোগ্য নয় তাকে পবিত্র করা হবে না। অথবা এর অর্থ হচ্ছে এই, যারা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবী করে, তাদেরকে তাদের অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হবে, তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবেনা।

انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ

অর্থাৎ (হে রসূল!) দেখুন তো এই ইহুদীরা আল্লাহ পাকের প্রতি কেমন মিথ্যারোপ করে, নিজেদেরকে আল্লাহর পুত্র এবং প্রিয় বলে দাবী করা এবং একথা দাবী করা যে, তাদের দিনের গুনাহ্ রাতে মাফ হয়ে যায় এবং রাতের গুনাহ্ দিনে মাফ হয়ে যায়! যে ইহুদীরা গো-বৎসের পূজা করেছিল, হযরত ওজায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করেছিল এবং যখন আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করলেন যে, শেরকের গুনাহ্ তিনি মাফ করবেন না, অন্যান্য গুনাহ্ ইচ্ছা করলে মাফ করতে পারেন তখন এ ইহুদীরা দাবী করল আমরাতো মুশরেক নই, আমরা নবীগণের বংশধর। একদিকে কুফর ও শেরকের নির্লজ্জ অভিযান, আল্লাহ্ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর বিরোধিতা, অন্যদিকে আল্লাহ্ পাকের সম্পর্কে মিথ্যা রটনা এমনকি আল্লাহর বন্ধুত্বের দাবী– এসবই ইহুদীদের অন্যায় আচরণ।

وَكَفٰى بِهٖ اِثْمًا مُّبِيْنًا

আর অন্যায় হিসেবে তাদের ধ্বংসের জন্যে এসবই যথার্থ, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।[১]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا
مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
هٰٓؤُلَآءِ أَهْدٰى مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ
اللّٰهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩০-৩২
তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১২৫-২৭
তফসীরে রুহুল মা'আনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৪

তরজমা

(৫১) (হে রসূল!) আপনি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি? যাদেরকে আসমানী কিতাবের কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে। তারা মূর্তি এবং শয়তানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আর তারা কাফেরদের সম্পর্কে বলে থাকে এরা মুসলমানদের চেয়ে অধিকতর সুপথগামী।

(৫২) এসব লোকের উপরই আল্লাহ তায়ালা লা'নত করেছেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা যার প্রতি লা'নত করেছেন (হে রসূল!) আপনি তার জন্যে কোন সাহায্যকারী পাবেন না।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুজুল

ওহোদের যুদ্ধের (৩য় হিজরীতে অনুষ্ঠিত) পর হাই এবনে আখতাব এবং কাব এবনে আশরাফ ৭০ জন ইহুদী সহ মক্কার কোরায়শদের নিকট উপস্থিত হয়। উদ্দেশ্য হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কোরায়শদের সাহায্য গ্রহণ এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোরায়শদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ইহুদীরা যে শান্তি চুক্তি করেছিল তা ভঙ্গ করাও এর লক্ষ্য। মক্কায় পৌঁছে তারা আবু সুফিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাত করলো এবং তাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার পর আবু সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীরা বললো, তোমরা হলে আহলে কিতাব। আব মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিকটও আসমানী কিতাব নাযিল হয়। অতএব, তোমরা পরস্পর কাছাকাছি এবং আমরা তোমাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারি না। এজন্যে প্রথমে তোমরা আমাদের মূর্তিগুলোকে সেজদা কর যাতে করে আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি এবং তোমাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারি। তখন তারা মূর্তিকে সেজদা করে। এরপর আবু সুফিয়ান তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের মতে আমরা সুপথ প্রাপ্ত নাকি মোহাম্মদ? (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তখন কাব জিজ্ঞাসা করে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কি বলেন? তারা বললো এক আল্লাহর এবাদত করতে আদেশ দেন, মূর্তি পূজা করতে নিষেধ করেন, আমাদের পূর্ব পুরুষের ধর্মকে বর্জন করার নির্দেশ দেন, তাই আমাদের পরস্পরের মধ্যে তাঁর কারণে পার্থক্য এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। তখন কাব বলে, তোমাদের ধর্ম কি? জবাবে আবু সুফিয়ান বলে, আমরাতো আল্লাহ্র ঘরের মোতাওয়াল্লী। হাজীদের পানাহারের ব্যবস্থা করি। তখন কা'ব বলে মুসলমানদের চেয়ে তোমরাই সুপথপ্রাপ্ত। এরপর তারা সিদ্বান্ত নেয়, ৩০ জন ইহুদী এবং ৩০ জন মক্কাবাসী কা'বা শরীফ স্পর্শ করে অঙ্গীকার করবে যে,

আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান করবো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]
আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا

অর্থাৎ- (হে রসূল!) আপনি কি দেখেননি যে, আল্লাহ্ পাক যাদেরকে আসমানী কিতাবের কিছু অংশ প্রদান করেছেন তারা মূর্তি এবং শয়তানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে? এতদ্বারা আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন দূরাত্মা ইহুদীদের অপকীর্তির এক বীভৎস চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তাদের অত্যধিক বিদ্বেষের কারণে মক্কার পৌত্তলিকদের সঙ্গে তারা মিতালী করতে প্রয়াসী হয় এবং তাদের মূর্তিগুলোর সম্মুখে অবনত মস্তকে ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদন করে। শুধু তাই নয়, একান্ত অসংকোচে মক্কার পৌত্তলিকদেরকে তারা বলে মুসলমানদের ধর্মের চেয়ে তোমাদের ধর্মই অধিকতর সত্য। অথচ তৌহিদের প্রতি বিশ্বাস, আসমানী কিতাবের প্রতি ভক্তি, আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি ঈমান এবং কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস প্রভৃতি ব্যাপারে তারা ইসলামের কাছাকাছি। কিন্তু তাদের অন্তরে ইসলামের শত্রুতা এত বেশী ছিল যে, তারা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল এবং মূর্তিকে সেজদা করেছিল। কুফরকে ইসলামের চেয়ে উত্তম বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল। এজন্যে তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের লা'নত হয়েছে। আর যাদের আল্লাহ্ পাক লা'নত করেন পৃথিবীতে তাদেরকে কেউ সাহায্য করেনা। অতএব, কোরায়শদের সঙ্গে তাদের সহায়তা চুক্তি তাদের কোন উপকারে আসতে পারে না। দুনিয়াতে তাদের লাঞ্ছনা এবং অপমান চির অবধারিত, আর আখেরাতে তাদের শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন।

দুটি শব্দের ব্যাখ্যা

আলোচ্য আয়াতে 'জেবত' এবং 'তাগুত'-এ দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দ দুটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

বায়হাকী এবং তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, এ শব্দ দুটির অর্থের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। একরামা বলেছেন, 'জেবত' এবং 'তাগুত' দুটি মূর্তির নাম। মুশরেকরা এগুলোর পূজা করতো। পূর্বোক্ত ঘটনা একথার সমর্থন করে। একরামার আরো একটি মত হলো, আবিসিনিয়াবাসীদের ভাষায় 'জেবত' হলো শয়তানের নাম। হয়তো এ কারণেই এতদ্বারা মূর্তির নামকরণ করা হয়েছে। আবু ওবায়দা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ ব্যতীত আর যা কিছুর উপাসনা করা হয় তাকেই 'জেবৃত' এবং 'তাগুত' বলা হয়।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৪
তফসীরে কবীর খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১২৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩৩
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৬

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেন, জেব্ত শব্দটি মূলতঃ ছিল জেবস। জেব্স বলা হয় সে ব্যক্তিকে যার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকে না। এ শব্দটির শেষ অক্ষর س কে ت দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। তাই এখন 'জেবত' বলা হয়। আর 'তাগুত' শব্দটি তুগিয়ান থেকে নিষ্পন্ন যার অর্থ হলো কুফর ও নাফরমানীতে সীমা লঙ্ঘন করা। এজন্যেই ইহুদী হাই এবনে আখতাবকে 'জেব্ত' এবং কাব এবনে আশরাফকে 'তাগুত' বলা হয়েছে। যাহ্যাক (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন।

শা'বী (রঃ) এবং মুজাহেদের (রঃ) মতে, জেব্ত অর্থ যাদু আর তাগুত অর্থ শয়তান। মোহাম্মদ এবনে সীরিন বলেছেন, জেব্ত হলো গণক, আর তাগুত হলো যাদুকর। সাঈদ এবনে যোবায়ের এবং আবুল আলীয়া বলেছেন, জেব্ত হলো যাদুকর, আর তাগুত হলো গনক। আল্লামা বগবী হযরত আয়েশা (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পাখীর নাম, আর তাদের ডানে বামে উড়ে যাওয়াকে নিজের জন্যে উপকারী বা অপকারী মনে করা জেব্তের অন্তর্ভুক্ত, যাতে কোন কল্যাণ নেই।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'জেব্ত' অর্থ মূর্তি এবং 'তাগুত' অর্থ মূর্তিদের শয়তান। প্রত্যেক মূর্তিরই শয়তান থাকতো যা মূর্তির ভেতর থেকে কথা বলতো যা দ্বারা মানুষ প্রতারিত হতো অথবা হয়তো পূজারীরা মূর্তির নেপথ্য থেকে কথা বলতো, আর লোকেরা মনে করতো মূর্তিই কথা বলছে।[১]

বায়হাবী হযরত আবু তোফায়েলের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ এবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-এর প্রতি ওজ্জাকে ধ্বংস করার আদেশ দিলেন। তিনি একটি বাবুলের বৃক্ষ কর্তন করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ খবর দিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন কিছু দেখেছ কি? তিনি বললেন না। তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি ওজ্জাকে ধ্বংস করোনি। হযরত খালেদ (রঃ) দ্বিতীয়বার গমন করলেন। তাঁকে দেখে পূজারীরা পাহাড়ের দিকে পলায়ন করলো এবং গমনকালে একথা বললো, ওজ্জা তাকে ধ্বংস কর অথবা অপমানিত অবস্থায় ধ্বংস হয়ে যাও। ঠিক এমন সময় কৃষ্ণ বর্ণের নগ্ন নারী বের হয়ে আসে। সে তার চেহারা এবং মাথায় বালু ছিটিয়ে দিচ্ছিল। তার চুলগুলো ছিল এলোমেলো। তখন হযরত খালেদ (রাঃ) তরবারি উঁচু করে বললেন, ওজ্জা! আমি দেখেছি আল্লাহ পাক তোমাকে অপমানিত করেছেন। অতঃপর তরবারি দ্বারা তাকে দ্বিখণ্ডিত করলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে এ সংবাদ

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১২৮
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩৪

দিলেন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ সে ওজ্জাই ছিল। এখন চির দিনের তরে তোমাদের দেশে তার পূজার ব্যাপারে সে নিরাশ হয়েছে।

ইহুদী অভিশপ্ত কেন?

ইমাম আহমদ এবং এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, যখন কাব এবনে আশরাফ ইহুদী মক্কায় আসে তখন কোরায়শ তার সম্পর্কে বললো দেখ, এ ব্যক্তি দাবী করে যে, সে আমাদের চেয়ে উত্তম। অথচ আমরা কা'বা শরীফের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছি, হাজীদের পানাহারের ব্যবস্থা করে থাকি। তখন কাব বললো, তোমরা তার চেয়েও উত্তম। তখন এ আয়াত নাযিল হলোঃ

وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا

অর্থাৎ কাব এবনে আশরাফ এবং তার সাথীরা মক্কার কাফের আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্যদেরকে বললো, মক্কাবাসী কাফেররা মুসলমানদের চেয়ে উত্তম এবং অধিকতর সুপথ প্রাপ্ত। মোহাম্মদ এবনে এসহাক হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, কোরায়শ, বনী গাতফান এবং বনু কোরায়জার দলগুলোকে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে হামলায় উদ্যত করেছিল তারা হলো হাই এবনে আখতাব, সালাম এবনে আবিল হাকিক, আবু রাফে, রাবি এবনে আবিল হাকিক, আবু আম্মারা এবং হাওদা এবনে কায়েস। এরা সবাই বনী নজীর গোত্রের লোক ছিল। যখন তারা কোরায়শদের কাছে পৌছল তখন কোরায়শের লোকেরা বললো, এরা হলো ইহুদী ধর্মযাজক, এরা পূর্ববর্তী যুগের কিতাবের জ্ঞান রাখে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর আমাদের ধর্ম উত্তম নাকি মোহাম্মদের? (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তখন কোরায়শের লোকেরা ইহুদীদেরকে এ প্রশ্ন করলো। তারা বললো তোমাদের ধর্ম মুসলমানদের ধর্মের চেয়ে উত্তম এবং মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং তার অনুসারীদের চেয়ে তোমরা অধিক সুপথ প্রাপ্ত। তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেনঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

তারাই সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ পাক লা'নত করেছেন। তথা স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। ফলে তাদের লাঞ্ছনা এবং অপমান চির নির্ধারিত, দুনিয়াতেও তাদের শাস্তি, অপমান লিপিবদ্ধ, আর আখেরাতেও রয়েছে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি।

وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا

আর মনে রেখো, যাকে আল্লাহ্ পাক লা'নত করেন, যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অভিশপ্ত হয়, এ পৃথিবীতে কেউ তার সাহায্যকারী হয় না। আর আখেরাতেও কারো শাফায়াত তাদের নাজাতের কারণ হবে না।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, ইহুদীদের এ লা'নতের মাধ্যমে ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হলো, তারা মোমেনদের চেয়ে মূর্তি পূজকদের উত্তম বলেছে। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি অনুগত, তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞ এবং দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে বিরত এবং সর্বদা আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কল্যাণ অর্জনে ব্যস্ত তাদের চেয়ে অন্যরা কিভাবে উত্তম হতে পারে? যেহেতু এ ইহুদীরা এমন অন্যায় কথা বলেছে তাই তারা অভিশপ্ত হয়েছে।[১]

﴿٥٢﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ
مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ
عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم
مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ
جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

তরজমা

(৫৩) তবে কি তাদের জন্যে রাজত্বে কোন অংশ রয়েছে? (যদি তাই হতো) তবে তারা খেজুরের খোসা পরিমাণও অন্য লোকদের দিত না।

(৫৪) অথবা তারা কি এজন্যে লোকদের সাথে হিংসা করে যে, আল্লাহ্ পাক স্বীয় করুণায় তাদেরকে কিছু দান করেছেন। নিশ্চয় আমি ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরগণকে কিতাব এবং হেকমত দান করেছি, এবং তাদেরকে বিশাল রাজত্ব দান করেছি।

(৫৫) অনন্তর অনেকে তার উপর ঈমান এনেছে। আর অনেকে তা থেকে বিরত রয়েছে। আর তাদের (শাস্তির জন্যে) দোযখের অগ্নি শিখাই যথেষ্ট।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১২৯

(৫৬) নিশ্চয় যারা আমার আয়াত সমূহকে অবিশ্বাস করেছে, আমি অচিরেই তাদেরকে দোযখে প্রবেশ করাব। যখন তাদের চর্ম গলে যাবে, তৎক্ষণাৎ আমি অন্য চর্ম পরিবর্তন করে দেব। যেন তারা আযাবের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক ইহুদীদের মূর্খতার কথা বর্ণনা করেছেন। কেননা তারা বলেছে, আল্লাহর এবাদতের চেয়ে মূর্তিপূজা উত্তম, এটি নিছক মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়, আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, ইহুদীরা শুধু মূর্খই নয়, বরং তারা কৃপণ এবং হিংসুকও। কৃপণতা এবং হিংসা-পরশ্রীকাতরতা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কৃপণতা হলো আল্লাহ্ পাক যদি কাউকে কোন নেয়ামত দান করেন তা অন্যকে না দেয়া। আর হিংসা হলো এ আকাঙ্খা করা যে, আল্লাহ্ পাক যেন আর কাউকে কোন নেয়ামত দান না করেন। হিংসুকের একান্ত কামনা হলো যেন আল্লাহর কোন বন্দা তার নেয়ামত লাভে ধন্য না হয়। আর কৃপণ বা বখীলের কাজ হলো আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামত অন্যকে দান করা থেকে বিরত থাকা।

পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীদের যে চারিত্রিক দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো তাদের মূর্খতা। আর এ আয়াতের উল্লেখিত হয়েছে তাদের কৃপণতা এবং হিংসার কথা। মূর্খতার কথা পূর্বে বর্ণনা করার কারণ হলো, কৃপণতা এবং হিংসার মত নিন্দনীয় চরিত্রের মূল কারণ হলো তাদের মূর্খতা। কারণ এবং উপকরণ পূর্বে বর্ণনা করাই সমীচিন হয়েছে। কেননা, অর্থসম্পদ ব্যয় করা হয় আত্মসংশোধন ও আত্মার পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং আখেরাতের সাফল্য লাভের লক্ষ্যে, আর অর্থ সম্পদ আঁকড়ে ধরে রাখা হয় দুনিয়ার সম্পদ অর্জন ও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে। অতএব, কৃপণতা মানুষকে দুনিয়ার দিকে ডাকে, আর আখেরাত থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে, দান খয়রাত মানুষকে আখেরাতের সাফল্যের দিকে ডাকে এবং দুনিয়া থেকে বিরত রাখে। আর আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া শুধু মূর্খতার কারণেই সম্ভব হয়। আর হিংসা হলো আল্লাহর নেয়ামত যেন আল্লাহর বন্দার কাছে না যায় তার আকাঙ্খা করা। এটি মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতএব, ইহুদীদের মূর্খতার কথা আগে এরশাদ হয়েছে এবং পরে কৃপণতা ও হিংসার কথা বলা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক যা এরশাদ করেছেন তার মর্মকথা বুঝতে হলে ইহুদীদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। ইহুদীদের ধারণা ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব তাদেরই একচেটিয়া অধিকার। এতে আর কেউ আসতে পারবে না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পথে তাদের এ

ভুল ধারণাই ছিল অন্যতম অন্তরায়। তারা মনে করতো নবুওয়্যত তাদের একান্ত ঘরোয়া বিষয় এবং বংশগত প্রাপ্য বস্তু। এমনকি তারা এমন ধৃষ্টতাও প্রদর্শন করতো যে, যদি নবুওয়ত ও রাষ্ট্র ক্ষমতা কারো হাতে যায়ও, তা নিতান্ত দু' চার দিনেরই ব্যাপার। সে সময় দূরে নয় যখন ঘুরে ফিরে নবুওয়্যত আমাদের ঘরেই আসবে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তাদের এ ভুল ধারণা নিরসন-কল্পে ঘোষণা করেছেন যে, তাদের এ ধারণা আদৌ সত্য নয়। নবুওয়্যত এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে তাদের কোন অধিকারই নাই। এরা অত্যন্ত কৃপণ, দুর্নীতিপরায়ণ, সংকীর্ণমনা। তাদের হাতে যদি রাষ্ট্র ক্ষমতা যায় তবে সকলের জন্যেই হবে বিপদ। তারা একাই জনসাধারণের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে এবং কুক্ষিগত করে রাখবে। কোন মানুষকে সামান্য পরিমাণও কিছু দেবে না। তাদের সংকীর্ণতা ও কৃপণতার কারণে কারো জন্যেই কোন কল্যাণের সম্ভাবনা নেই।

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

অর্থাৎ- আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে যে নেয়ামত দান করেছেন এবং তাদের প্রতি যে আসাধারণ অনুগ্রহ করেছেন তা দেখে এ ইহুদীরা হিংসা-পরশ্রীকাতরতায় জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, এটি তাদের নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহেদ (রঃ) হাসান প্রমুখ তফসীরকারগণের মতে, এ আয়াতে ইহুদীদের হিংসার যে উল্লেখ রয়েছে তার উদ্দেশ্য হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে আল্লাহ পাক যে একাধিক স্ত্রীলোকের সাথে একই সঙ্গে বিবাহ হালাল করেছেন তজ্জন্যে ইহুদীরা জ্বলে পুড়ে মরতো। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম। তফসীরকারগণ বলেছেন, যেহেতু আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নবুওয়্যত, আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং দুশমনের উপর বিজয় দান করেছেন তাই ইহুদীরা তাঁকে এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে হিংসা করতো। বস্তুতঃ এটি ছিল তাদের নির্বুদ্ধিতা।

فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ

কেননা, আল্লাহ পাকের এমন অনুগ্রহ বা দান নতুন কিছু নয়, বরং ইতিপূর্বে এ ইহুদীদেরই অত্যন্ত মাননীয় পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিজনদের প্রতি আল্লাহ পাক অনেক কিছু দান করেছেন। তাদেরকে কিতাব, হেকমত, ক্ষমতা ও বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, 'আল ইব্রাহীম' অর্থ হলো, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্ব পুরুষ হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত এসহাক (আঃ) ও হযরত ইয়াকুব (আঃ) এবং বনী ইসরাঈলের সমস্ত নবীগণ। অতএব, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হিংসা করা মূলতঃ আত্মবিদ্বেষ বা আত্মহিংসা ব্যতীত আর কিছুই নয়। হিংসা-বিদ্বেষ মানুষকে কতখানি অধঃপতিত করতে পারে তার জীবন্ত নিদর্শন এ ইহুদীরা। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হিংসা করার অর্থই হলো তাদের বরণীয় পূর্ব পুরুষদের হিংসা করা। এমন হিংসা-জর্জর লোকদের শাস্তি দোযখ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আলোচ্য আয়াতে 'আল কিতাবের' অর্থ হলো তৌরাত, ইঞ্জিল, যবুর আর 'আল হেকমতের' অর্থ হলো, আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞান অথবা সে জ্ঞান যা কিতাব ব্যতীত অন্যভাবে তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। আর "মুলকে আজিম" বা বিশাল সামাজ্যের উল্লেখ করে আল্লাহ্ পাক ইঙ্গিত করেছেন হযরত ইউসুফ (আঃ), তালুত, হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর প্রতি। কেননা, তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। এমন অবস্থায় যদি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ পাক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিয়ে থাকেন তবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে? এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, ইহুদীরা একথাও বলতো এবং হিংসা করতো যে, আল্লাহ্ পাক হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নয় জন স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছেন, অথচ তারা এ সত্য ভুলে গেছে যে, তাদেরই পূর্ব পুরুষ হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর এক হাজার স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে তিনশ' স্ত্রীর মোহরানা আদায় করা হয়েছিল, আর সাত'শ ছিল বাঁদী। আর হযরত দাউদ (আঃ)-এর একশ' স্ত্রী ছিল। অথচ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাত্র নয় জন স্ত্রী ছিলেন।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর ইহুদীদের মুখ বন্ধ হয়। এরপর তারা উম্মুল মোমেনীনদের সম্পর্কে অথবা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত কোন নেয়ামত সম্পর্কে আর আলোচনা করেনি।

অথবা আলোচ্য আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, ইব্রাহীম এবং তাঁর বংশধরদের আমি নবুওয়্যত, হেকমত এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছি। তাদের দুশমনও ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। নমরুদ, ফেরাউন, হামান গয়রহ এবং তারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি হিংসাও করতো। কিন্তু তাদের হিংসা ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। ঠিক এমনিভাবে তোমাদের হিংসা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ

ইহুদীদের মধ্যে কিছু লোক প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) এবং তাঁর সাথীগণ। অথবা এ বাক্যটির অর্থ হলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের নবুওয়্যত, হেকমত বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করার যে কথা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে তা কিছু সংখ্যক ইহুদী সত্য বলে মেনে নিয়েছে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ

"আর কিছু ইহুদী এ সত্য থেকে বিমুখ হয়েছে তথা ঈমান আনেনি"।

তফসীরকার সুদ্দী বলেছেন এর অর্থ হলো, কিছু লোক ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছে আর কিছু লোক ঈমান আনেনি। এর পেছনে একটি ঘটনাও আছে। একবার হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জমিনে ফসল করেন এবং তাঁর পাশাপাশি অন্য লোকেরাও বীজ বপন করে কিন্তু ইব্রাহীম (আঃ) ব্যতীত আর সবার ফসল বিনষ্ট হয়ে যায় এবং হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) ফসল হয় অত্যন্ত বেশী। লোকেরা তাঁর নিকট দ্রব্যের মুখাপেক্ষী হয়। তখন তিনি বলেনঃ যারা আমার নবুওয়্যতের প্রতি বিশ্বাস করবে আমি তাদেরকে দান করবো। একথা শ্রবণ করে কিছু লোক তাঁর নবুওয়্যতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং তিনি তাদেরকে খাদ্য দ্রব্য দান করলেন। আর কিছু লোক ঈমান আনলো না। যদি এ আয়াতের এ অর্থ গ্রহণ করা হয় তবে আয়াতের তাৎপর্য হবে এই যে, এ আয়াতে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা এ মর্মে যে, যেভাবে কিছু লোক ইব্রাহীম (আঃ)-এর উপর ঈমান না এনে ইব্রাহীম (আঃ)-এর ক্ষতি করতে পারেনি, ঠিক তেমনি (হে রসূল!) এ দূরাত্মা ইহুদীরা যদি আপনার প্রতি ঈমান না আনে তবে তারা আপনারও কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا

"তাদের শাস্তির জন্যে দোযখের জ্বলন্ত অগ্নিই যথেষ্ট"।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا

অর্থাৎ যারা আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করবে, আমি তাদেরকে দোযখে প্রবেশ করাব। এতে পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের শাস্তির যে ঘোষণা রয়েছে তারই তাগিদ রয়েছে।

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا

অর্থাৎ- যখন তাদের চর্ম গলে যাবে তৎক্ষণাৎ আমি অন্য চর্ম পরিবর্তন করে দেব। অথবা এর অর্থ হলো চর্ম থেকে জ্বলে যাওয়ার চিহ্ন দূর করে দেয়া হবে, যাতে করে বারে বারে শাস্তির কষ্ট অনুভব করা যায়। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের চর্মকে কাগজের মত সাদা করে দেয়া হবে। (বগভী)

এবনে আবি হাতেম লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াতের এই তফসীর করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)। হযরত ওমর (রাঃ)-এর সম্মুখে যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তখন হযরত মাআজ (রাঃ) বলেন, এ আয়াতের তফসীর আমার জানা আছে। প্রতি ঘন্টায় একশ' বার চর্ম পরিবর্তন করা হবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ ব্যাখ্যাই শ্রবণ করেছি। আবু নাঈম এবং এবনে মরদবিয়া অন্য সূত্রে একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রতি ঘন্টায় ১২০ বার কাফেরদের চর্ম পরিবর্তন করা হবে।

বায়হাকীর একটি বর্ণনা রয়েছে, প্রতি ঘন্টায় কাফেরদের চর্ম জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং নতুন চর্ম পরিবর্তন করা হবে। আর তা প্রতি ঘন্টায় ছ' হাজার বার করা হবে। এ পর্যায়ে হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর কথা হচ্ছে যে, প্রতি ঘন্টায় কাফেরদের চর্ম ৭০ হাজার বার অগ্নিদগ্ধ করা হবে, প্রতি বারই বলা হবে, পূর্বের মত হয়ে যাও। তখন তাই হবে।

لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ

"আর তা এজন্যে করা হবে যেন কাফেররা আযাবের আস্বাদ গ্রহণ করে"।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোযখের ভেতরে দোযখীদের দেহকে অনেক বড় করা হবে। এমনকি, কারো কারো কানের লতি থেকে গর্দান পর্যন্ত ৭০০ বছরের পথের সমান হবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ)-এর আরও একটি বর্ণনা তিরমিজী শরীফে সংকলিত হয়েছে যে, কাফেরদের রসনা দু' মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন হাকেম (রঃ)। তিনি বলেন, কোন কোন দোযখীর কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত ৪০ বছরের পথের সমান হবে যার মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে।

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত পরাক্রমশালী। তিনি যা ইচ্ছা তা করেন, তাঁকে কেউ কোন ব্যাপারে বাধা দিতে পারে না। তিনি বিজ্ঞানময়, তাঁর প্রতিটি কাজ হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। তাঁর হেকমত অনুসারেই তিনি যাকে ইচ্ছা যেমন ইচ্ছা, শাস্তি দেবেন।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۡ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا

তরজমা

(৫৭) এবং যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে অদূর ভবিষ্যতে আমি তাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হবে। তারা সে বেহেশতে সর্বদা থাকবে। সেখানে তাদের জন্যে পবিত্র সহধর্মীনীগণ রয়েছে এবং আমি তাদেরকে শান্তিপূর্ণ ছায়ায় প্রবেশ করাবো।

তফসীরুল কোরআন

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, যখন কাফেরদের শাস্তির কথা বর্ণিত হয় তখন তার পাশাপাশি ঈমানদারদের পুরষ্কারের কথাও বর্ণনা করা হয়। যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে তাই এ আয়াতে ঈমানদারদের জন্যে পুরষ্কারের ঘোষণা রয়েছে।

যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর অনুসরণ করে পরিপূর্ণভাবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করাবেন, তারা সেখানে অনন্ত অসীম সুখ শান্তি লাভ করবে, সে বেহেশতের তলদেশ দিয়ে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত রয়েছে। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। এ নেয়ামত সমূহ

তাদের জন্যে চিরস্থায়ী হবে। কোন দিন তাতে এতটুকু কম হবে না। আর তাদের জন্যে সে বেহেশতে রয়েছে পবিত্র সহধর্মীনীগণ তথা সুন্দরী হরীগণ, তারা হবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন।

আলোচ্য আয়াতে مُطَهَّرَةٌ শব্দটির ব্যাখ্যায় হাকেম হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) বর্ণনায় একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তারা হায়েজ থেকে, পায়খানা থেকে, নাকের শ্লেষ্মা এবং থু থু থেকে পবিত্র হবে।

বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ জান্নাতে পবিত্র সহধর্মীনীগণ থাকবে, তাদের পবিত্রতার তাৎপর্য হচ্ছে তারা হায়েজ, মল-মূত্র, নাকের শ্লেষ্মা, থু থু, কফ, সন্তান-সন্ততি এবং শুক্র থেকে পবিত্র হবে। তফসীরকার আতাও একথা বলেছেন।

وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

অর্থাৎ আমি তাদেরকে সুশীতল বিস্তৃত ছায়ায় প্রবেশ করাবো।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতে একটি বৃক্ষ রয়েছে যার ছায়ায় কোন আরোহনকারী একশ' বছর চলতে থাকলেও তা শেষ করতে পারবে না। যদি তোমরা এর প্রমাণ দেখতে চাও তবে পাঠ কর– وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ (বোখারী ও মুসলিম)

এ আয়াতে তফসীরে রবী এবনে আনাসের (রাঃ) বর্ণনার উদ্ধৃতি রয়েছে। তিনি বলেছেন, এ সুশীতল ছায়া হলো আরশের ছায়া, যার কোন দিন বিনাশ নেই। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের নেয়ামত সমূহ চিরস্থায়ী হবে। কোন কোন তফসীরকার পবিত্র সহধর্মীনীর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এতদ্বারা তাদের চরিত্র মাধুর্যের প্রশংসা করা হয়েছে অর্থাৎ তাদের আচার আচরণ অতি সুন্দর এবং পবিত্র হবে। আর সুশীতল ছায়ার ব্যাখ্যায় বলেছেন, জান্নাতে সুন্দর তাঁবু সমূহ থাকবে। এমন রৌদ্র বা এমন শীত থাকবে না যা কারো জন্যে কষ্টদায়ক হতে পারে।[২] 'বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে চিরদিন থাকবে'-এর তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ সেখানে তাদের মৃত্যু হবে না, আর সেখান থেকে তাদের বের হতে হবে না।[৩]

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪১
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), খণ্ড-৬, পারা-৫, পৃষ্ঠা-৪৬
২। খোলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৯৪
৩। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৭২

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

তরজমা

(৫৮) নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যেন তোমরা আমানত সমূহ তার অধিকারীগণকে ফেরত দিয়ে দাও এবং যখন তোমরা মানুষের মধ্যে কোন বিষয় বিচার কর তখন অবশ্যই সুবিচার কায়েম কর, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা যে বিষয় তোমাদেরকে নসিহত করেন তা অত্যন্ত উত্তম বিষয়, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

(৫৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রসূলের অনুসরণ কর, এবং তোমাদের মধ্যে যারা নেতা, তাদের কথাও মান্য কর। এরপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ কর তবে সে বিষয়কে আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রসূলের নিকট অর্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ্ পাক ও কেয়ামতের উপর বিশ্বাস করে থাক, এটি অত্যন্ত ভাল কাজ এবং এর পরিণামও অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অবস্থা এবং তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর এ আয়াত থেকে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিধি-নিষেধের বিবরণ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আহলে কিতাবরা সত্যকে গোপন করেছে যখন তারা কাফেরদের উদ্দেশ্যে বলেছে, মোমেনদের চেয়ে কাফেররাই অধিকতর হেদায়েতপ্রাপ্ত। তাই আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে মোমেনদেরকে আমানত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

আর এ আমানতের কথা সব বিষয়েই প্রযোজ্য, ধর্মীয় ব্যাপারেও হতে পারে, অন্যান্য ব্যাপারেও হতে পারে।

তৃতীয়তঃ যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতে যারা ঈমানদার এবং নেক আমলকারী তাদের জন্যে অশেষ সওয়াবের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর আমানত আদায় করা বা আমানতদারী হলো অত্যন্ত বড় নেক আমল। তাই আলোচ্য আয়াতে আমানতদারীর গুণ অর্জনের তাগিদ করা হয়েছে।[১]

শানে নুযুল

এবনে মরদবিয়া কালবীর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা গৃহে প্রবেশ করার ইচ্ছা করেন তখন কা'বা শরীফের তদানীন্তন চাবি রক্ষক ওসমান এবনে তালহাকে চাবি দিতে বলেন, ওসমান তাতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন হযরত আলী (রাঃ) বলপূর্বক তাঁর নিকট থেকে চাবি নিয়ে নেন এবং কা'বা শরীফের দরজা খুলে দেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে দু' রাকাআত নামাজ আদায় করেন। কা'বা শরীফের ভেতর থেকে বের হলে হযরত আব্বাস (রাঃ) চাবি তাঁকে দিতে অনুরোধ করেন। এমন সময় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চাবি হযরত ওসমান বিন তালহাকে প্রদান করেন এবং হযরত আলী (রাঃ)-কে ওসমানের নিকট ক্ষমা প্রার্থী হওয়ার নির্দেশ দান করেন।[২]

এ ঘটনাটিকে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আরো বিস্তারিতভাবে লিখেছেন, বর্ণিত আছে, যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করেন এবং বয়তুল্লাহ শরীফ প্রাঙ্গনে তশরীফ আনেন এবং বয়তুল্লাহ শরীফের চাবি রক্ষক ওসমান এবনে তালহাকে ডেকে চাবি দিতে বলেন, তিনি চাবি দিতেও চাইলেন এমন সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! চাবিটি আমাকে দান করুন যেন আমাদের বংশে হাজীদের খেদমত, জমজমের পানি পান করানো এবং চাবি রক্ষা করার দায়িত্ব থাকে। একথা শ্রবণ করে হযরত ওসমান এবনে তালহা (রাঃ) চাবি দিতে বিরত রইলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার চাবি চাইলেন তখন পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। তিনি তৃতীয়বার চাবি দিতে আদেশ দিলেন। তখন ওসমান এবনে তালহা (রাঃ) একথা বলে দিলেন যে, আল্লাহর আমানত স্বরূপ দিলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দ্বার খুলে ভেতরে প্রবেশ

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৩৭-৩৮
২। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৩৮

করলেন। কা'বা শরীফের ভেতর যেসব মূর্তি ছিল সেগুলো ভেঙ্গে বাইরে ফেলে দিলেন এবং সে স্থান সমূহ পানি দ্বারা ধৌত করলেন। এরপর বাইরে এসে কা'বা শরীফের দ্বার প্রান্তে দণ্ডায়মান হয়ে ঘোষণা করলেনঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকারকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। তিনি তাঁর বন্দাকে সাহায্য করেছেন, সকল শত্রু সৈন্যকে তিনি পরাজিত করেছেন। অতঃপর তিনি এক সুদীর্ঘ ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি ঘোষণা করেনঃ জাহেলিয়াতের যুগের সকল কলহ দ্বন্দ্ব এখন আমার পায়ের নীচে। সেই কলহ দ্বন্দ্ব কোন আর্থিক ব্যাপারে হোক অথবা প্রাণের ব্যাপারে হোক। তবে হ্যাঁ, বয়তুল্লাহ শরীফের চাবি রক্ষা করা, হাজীদের জমজমের পানি পান করাবার দায়িত্ব পূর্বের ন্যায়ই থাকবে। এ ভাষণ শেষ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উপবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) অগ্রসর হয়ে আরয করলেন, আমাকে চাবিটি দান করুন যেন বয়তুল্লাহ শরীফের চাবি রক্ষা করা এবং হাজীদেরকে জমজম পান করাবার দায়িত্ব আমাদের উপরই থাকে। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চাবি হযরত আলী (রাঃ)-কে দিলেন না। তিনি মকামে ইব্রাহীমকে কা'বা শরীফের ভেতর থেকে বের করে এনে দেয়ালের সঙ্গে রেখে দিলেন এবং ঘোষণা করলেনঃ এ হলো তোমাদের কেবলা। এরপর তিনি তওয়াফে মশগুল হয়ে গেলেন। দু' বার কা'বা শরীফ প্রদক্ষিণ করার পরই হযরত জীব্রাঈল (আঃ) নাযিল হলেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! 'আমার পিতা মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক। আমি ইতিপূর্বে আপনাকে এ আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করতে শুনিনি'। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান এবনে তালহাকে ডাকলেন এবং কা'বা শরীফের চাবি তাঁকে প্রদান করলেন এবং বললেন, "আজকের দিন অঙ্গীকার রক্ষার, সৎ কাজ করার এবং ভাল ব্যবহার করার দিন"।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) তেবরানীর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ওসমান এবনে তালহা (রাঃ)-কে চাবি প্রদানের সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা বলেছিলেনঃ হে বনী তালহা! চাবি গ্রহণ কর, এটি সর্বদা তোমাদের নিকটই থাকবে। জালেম ব্যতীত কেউ এ চাবি তোমাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেবেনা।

ওসমান এবনে তালহা পরবর্তীতে কাবা শরীফের চাবি তাঁর ভ্রাতা শাইবা এবনে আবি তালহাকে প্রদান করেন, যা আজ পর্যন্ত তাঁর বংশধরদের নিকটই রয়েছে।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৬ পারা-৫, পৃষ্ঠা-৪৭
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৩

এ পর্যায়ে আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) আরো একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এবনে সা'দ ইব্রাহীম এবনে মোহাম্মদের সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ওসমান এবনে তালহা বর্ণনা করেছেন যে, হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়। তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহবান করেন। আমি তাঁকে বললাম, আমিতো আশ্চর্যন্বিত এজন্যে যে, আপনি আমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে নতুন ধর্মের আহবায়ক হয়েছেন। এখন আপনি এ আকাঙ্খা করছেন যে, আমিও আপনার অনুসরণ করি। ওসমান বর্ণনা করেন, আমি জাহেলিয়াতের যুগে প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার কাবা শরীফের দ্বার খুলে দিতাম। একদিন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো অন্য কয়েকজন লোকের সঙ্গে কা'বা শরীফে প্রবেশ করার ইচ্ছা নিয়ে আসলেন। আমি তাঁর সঙ্গে কঠোর ভাষায় কথা বললাম এবং তাঁকে মন্দ কথা বললাম। তিনি সহ্য করলেন এবং বললেন, "ওসমান আশা করি এমন একদিন আসবে যখন এ চাবিটি তুমি আমার হাতে দেখতে পাবে। আমি যেভাবে চাইবো, এ চাবি ব্যবহার করবো"। আমি বললাম, তখন কি কোরায়শ অপমানিত এবং ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি এরশাদ করলেনঃ না। তারা আরো সম্মানিত হবে। একথা বলে তিনি কা'বা শরীফে প্রবেশ করলেন কিন্তু তাঁর কথা আমার মনে বসে গেল, আমার পূর্ণ বিশ্বাস হলো তিনি যেভাবে বললেন একদিন অবশ্যই তা হবে। এজন্যে আমি ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করলাম। কিন্তু আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে অত্যন্ত মন্দ বললো এবং আমাকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখলো।

মক্কা বিজয়ের দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ ওসমান, চাবি আন। আমি চাবি নিয়ে হাযির হলাম। তিনি চাবি নিয়ে নিলেন এবং পুনরায় আমাকে ফেরত দিয়ে এরশাদ করলেনঃ এ চাবি সর্বকালের জন্যে তোমরা নিয়ে যাও। জালেম ব্যতীত কেউ এ চাবি তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে না। ওসমান! আল্লাহ্ পাক তোমাদের স্বীয় ঘরের আমানতদার নিযুক্ত করেছেন। অতএব, এ ঘরের উসিলায় তোমরা যা কিছু লাভ কর তা নিয়ম মোতাবেক ভোগ কর। যখন আমি তাঁর নিকট থেকে ফিরে আসলাম তখন তিনি আমাকে পুনরায় ডাকলেন এবং এরশাদ করলেন, "যা আমি ইতিপূর্কে তোমাকে বলেছিলাম তা কি হয়নি"? একথার পর আমার সে ঘটনার কথা মনে হলো যা তিনি হিজরতের পূর্বে (কা'বা শরীফের ব্যাপারে) বলেছিলেন। তখন আমি আরয করলাম, নিঃসন্দেহে তাই হয়েছে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

ফাকেহানী হযরত যোবায়ের এবনে মোতএম (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন ওসমানকে চাবি দিয়েছিলেন তখন এরশাদ করেছিলেনঃ চাবিটিকে গোপন করে রেখো।

ইমাম জুহরী বলেছেন, এজন্যেই ওসমান চাবিটিকে গোপন করে রাখতেন।[১]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا

আমানত রক্ষার আদেশ

এ আয়াতে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে আমানত রক্ষার বিশেষ নির্দেশ প্রদান করেছেন। যদিও এ আয়াত হযরত ওসমান এবনে তালহার (রাঃ) পক্ষে তাঁর কাবা শরীফের চাবি প্রদান সম্পর্কে নাযিল হয়েছে কিন্তু এতে সর্বপ্রকার আমানত রক্ষার বিশেষ তাগিদ রয়েছে।

একথা সর্বজনবিদিত যে, মানুষের সম্পর্ক সাধারণতঃ তিন প্রকারঃ

(১) মানুষের সম্পর্ক তার স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সঙ্গে।

(২) মানুষের সম্পর্ক সকল বন্দার সঙ্গে।

(৩) মানুষের সম্পর্ক তার নিজের সঙ্গে।

আমানতের প্রশ্ন সকল সম্পর্কের ব্যাপারেই উত্থিত হয় এবং সর্বক্ষেত্রে আমানতের হেফাজত ও আমানত আদায় করতে হয়।

(১) স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের সঙ্গে আমানতের তাৎপর্যঃ

আল্লাহ পাকের যাবতীয় আদেশ পালন করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ সমূহ বর্জন করা, আর এটি এমন এক মহাসমুদ্র যার কোন তীর নেই। এজন্যে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, প্রত্যেকটি ব্যপারেই আমানত রক্ষা করা কর্তব্য। অজু, গোসল, নামাজ, যাকাত, রোজা প্রভৃতি আমানত স্বরূপ। মিথ্যা কথা না বলা, পরচর্চা না করা, চোগলখুরী না করা, কুফর ও শেরকের কথা না বলা, বেদআতের কথা না বলা, অশ্লীল কথা না বলা– এসবই হলো রসনার আমানত রক্ষা করা।

চক্ষু আল্লাহর একটি নেয়ামত এবং বন্দার নিকট আমানত, যা দেখা আল্লাহ পাক হারাম করেছেন তা না দেখা হলো এই আমানত রক্ষা করা। এমনিভাবে শ্রবণ শক্তি মানুষের প্রতি একটি নেয়ামত এবং আল্লাহর আমানত, অতএব গান বাজনা শ্রবণ না করা, অশ্লীল ও মিথ্যা কথা শ্রবণ না করা হলো আমানতদারী।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৩৭-৩৮
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৩
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৪২-৪৩

(২) বন্দার সাথে আমানতের প্রশ্ন

এ পর্যায়ে সকল বিষয়ের আমানত অন্তর্ভুক্ত। মানুষকে ওজনে কম না দেয়া, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতারণা না করা, শাসনকর্তাদের মানুষের মধ্যে সুবিচার কায়েম করা, আলেম সমাজের কোন ব্যাপারে মানুষকে বিভ্রান্ত না করা, তাদেরকে সত্যের দিকে আহবান করা, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা। এসবই আমানতের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) মানুষের সম্পর্ক সাথে তার নিজের সঙ্গে

প্রতিটি মানুষের উপর আমানত হলো তার নিজের জন্যে এমন কোন কর্মপন্থা গ্রহন না করা যা তার জন্যে ক্ষতিকর হয়। মানুষ অনেক সময় ক্রোধের বশীভূত হয়ে অথবা ভোগের নেশায় এমন কাজ করে বসে যা তার দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের জন্যে ক্ষতিকর হয়। এমন ক্ষতিকার কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের জন্যে উপকারী হয় তা করা প্রতিটি মানুষের প্রতি তার নিজের জন্যে আমনত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রতিটি মানুষকে তার প্রতি অর্পিত কর্তব্য পালনের তথা আমানত আদায়ের তাগিদ করে এরশাদ করেছেনঃ

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্ববান, আর প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

আলোচ্য আয়াতেঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا

সর্বপ্রকার দায়িত্ব পালনের তথা আমানত আদায়ের আদেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক আমানতদারীর গুণ অর্জনের তথা আমানত আদায়ের প্রতি কতখানি গুরুত্বারোপ করেছেন তা নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ পাঠ করলে সহজেই অনুমান করা যায়। এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

অর্থাৎ- নিশ্চয় আমি আমানত রেখেছি আসমান জমিনের উপর এবং পাহাড়ের উপর। অতঃপর তারা আমানত বহনে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে এবং ভয় করেছে আর মানুষ সেই আমানত বহন করেছে। আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ

(জীবন সাধনায় তারাই সফলকাম হয়েছে) যারা তাদের আমানত এবং অঙ্গীকার রক্ষা করেছে। আল্লাহ্ পাক আরো এরশাদ করেছেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করোনা, আর নিজেদের মধ্যকার আমানত সম্পর্কেও জেনে শুনে বিশ্বাস ভঙ্গ করোনা।

এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশেষ তাগিদ করে এরশাদ করেছেনঃ

اَلَا لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ

"যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমানও নেই"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, যদিও আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রকার আমানত আদায়ের তাগিদ রয়েছে কিন্তু তবুও এতে বিশেষভাবে মানুষের নিকট রক্ষিত আমানত সঠিকভাবে আদায়ের বিশেষ নির্দেশ রয়েছে।[১]

আমানতদারীর গুণ অর্জনের তথা মানুষের আমানত আদায়ের তাগিদ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে তোমার সঙ্গে আমানতদারীর ব্যবহার করে তুমি তার আমানত আদায় কর, আর যে তোমার সঙ্গে খেয়ানত করে তুমি তার সঙ্গে খেয়ানত করোনা (মসনদে আহমদ)।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে নামাজ, রোজা, যাকাত, কাফ্ফারা, মান্নত প্রভৃতি তথা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে বন্দার প্রতি অর্পিত সকল দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমনিভাবে মানুষের প্রতি মানুষের যাবতীয় দায়িত্বও এ আয়াতের মধ্যে শামিল রয়েছে। যেমন কারো প্রদত্ত আমানত সঠিকভাবে আদায় করা। অতএব, যে ব্যক্তি কারো কোন হক্ব আদায় না করবে কেয়ামতের দিন তাকে তার জন্যে পাকড়াও করা হবে। হাদীস শরীফে আছে কেয়ামতের দিন প্রত্যেক হক্বদারকে তার হক্ব দেয়া হবে এমনকি কোন শিং বিশিষ্ট বকরী যদি অন্য বকরীকে আঘাত করে থাকে তবে কেয়ামতের দিন তারও বদলা নেয়া হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণ করলে তার সমস্ত গুনাহ দূরীভুত হয়-কিন্তু আমানত থেকে যায়। কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তিকে হাযির করানো হবে যে আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করে

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৩৮-৩৯

শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছে, তাকে বলা হবে তুমি আমানত আদায় কর। সে আরয করবে দুনিয়াতো এখন নেই, আমি কিভাবে আমানত আদায় করবো? তখন তার নিকট যে বস্তু আমানত ছিল সে বস্তুকে সে দোযখের তলদেশে দেখতে পাবে, আর তাকে বলা হবে সেখান থেকে আমানত করা বস্তু নিয়ে আস। সে ব্যক্তি সে আমানত করা বস্তুর জন্যে দোযখের তলদেশে যাবে এবং সে আমানত করা বস্তুটিকে কাঁধে তুলে আসতে চেষ্টা করবে। কিন্তু ঐ বস্তুটি তার কাঁধ থেকে পড়ে যাবে। সে পুনরায় তা আনতে যাবে। আর এভাবে সে দোযখের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

হযরত যাজান (রঃ) এ বিবরণ শ্রবণ করে হযরত বারা (রাঃ)-এর নিকট বয়ান করলেন। তিনি বললেন, আমার ভাই ঠিকই বলেছে। এরপর তিনি পবিত্র কোরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, ভাল-মন্দ সকলের প্রতিই আমানতদারীর এ আদেশ প্রযোজ্য। আবুল আলীয়া (রঃ) বর্ণনা করেন, ইসলামে যেসব বিষয়ের আদেশ রয়েছে সবই আমানতের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, (এ আয়াত অনুযায়ী) প্রতিটি নারী তার সতীত্ব রক্ষার আমানতদার। রবী এবনে আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, তোমার এবং অন্যের মধ্যে যেসব ব্যাপার রয়েছে সবই আমানতের অন্তর্ভুক্ত।[১] হযরত যায়েদ এবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ করেছি যে, সর্বপ্রথম আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে। আর শেষ পর্যন্ত নামাজ বাকী থাকবে। আর অনেক নামাজী এমন হবে যে, তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ থাকবে না অর্থাৎ তাদের নামাজ ক্রুটিপূর্ণ হবে। ইমাম বায়হাকী মায়মুন এবনে মাহরানের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তিনটি বিষয় এমন যা ভাল মন্দ সকলকে আদায় করতে হবে।

(১) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে তা ভাল হোক কি মন্দ।

(২) আমানত আদায় করতে হবে। যার আমানত সে নেককার হোক বা বদকার।

(৩) অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে, যার সঙ্গে অঙ্গীকার করা হয় সে নেককার হোক কি বদকার।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, সুবিচারের সঙ্গে মীমাংসা করা আমানতের একটি অংশ আর সুবিচার না করা খেয়ানত। এমনিভাবে আল্লাহ্ পাক

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৬ পারা-৫, পৃষ্ঠা-৪৭

রব্বুল আলামীনের এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সকল বিধি-নিষেধ পালন করা আমানতের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুনাফেকীর চিহ্ন সমূহের মধ্যে খেয়ানতের উল্লেখ করেন।[১]

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ

অর্থাৎ- যখন তোমরা মানুষের মধ্যে মীমাংসা কর তখন সুবিচারের সঙ্গে মীমাংসা করবে। মানুষের হক্ব আদায় কর, ন্যায় নীতির সাথে, নিরপেক্ষভাবে বিচার কর। ইনসাফ কায়েম কর। পক্ষপাতিত্ব করে কারো প্রতি জুলুম করোনা। উৎকোচ গ্রহণের ভিত্তিতে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়োনা তথা কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করোনা, যোগ্য ব্যক্তিকে তার পদমর্যাদা দান কর, অযোগ্যকে নয়। হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করেছিলামঃ হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কোন এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করুন। তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি দুর্বল, আর শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করা একটি আমানত। কেয়ামতের দিন এ আমানত মানুষের অপমানের কারণ হবে। যে ব্যক্তি এ আমানতের হক্ব আদায় করতে পারবে সে অপমানিত হবে না।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আবু জর! আমি তোমাকে দুর্বল দেখতে পাচ্ছি, আমি তোমার জন্যে সে কথাই পছন্দ করি যা আমার জন্যে পছন্দ করি। দু' জন মানুষের উপর ক্ষমতা পরিচালনা করোনা। আর এতিমের অর্থ সম্পদের রক্ষাকারী হয়োনা। (মুসলিম শরীফ)

বস্তুতঃ আমানতে খেয়ামত করা, অন্যের অর্থ সম্পদ আত্মসাত করা, অঙ্গীকার বিনষ্ট করা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা দূরাত্মা ইহুদীদের মজ্জাগত ছিল, বিশেষতঃ তাদের নিকট মালামাল রাখা হলে তারা লুটের মাল মনে করে তা ভোগ করতো। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এমন অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দান করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪৪

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এর নসিহত করছেন। মনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, তিনি তোমাদের সকল কথা শ্রবণ করেন, আর আমানতদারের ব্যাপারে তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম তিনি লক্ষ্য রাখেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন করুণাময় আল্লাহ্ পাকের ডান হাতের দিকে নূরের মিম্বর হবে। তাতে সেসব লোক স্থান পাবে যারা দুনিয়াতে সুবিচার কায়েম করবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হবে সুবিচারক হাকীম। আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের সবচেয়ে অপ্রিয় এবং কঠিন শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে অত্যাচারী শাসনকর্তা। অন্য একটি বর্ণনায় কঠিন শাস্তির যোগ্য বাক্যটির পরিবর্তে "আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ থেকে অনেক দূরে" বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে। (তিরমিজী)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র রহমতের ছায়ায় কারা স্থান পাবে? সাহাবাগণ আরয করলেন, আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রসূলই জানেন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ সেদিন আল্লাহর রহমতের ছায়ায় সর্বাগ্রে সেসব লোক থাকবে যাদের অবস্থা এই, যদি তাদেরকে হক্ব দেয়া হয় তবে তারা কবুল করে, আর যদি তাদের নিকট হক্ব চাওয়া হয় তবে তারা তা আদায় করে, আর মানুষের সম্পর্কে এভাবে মীমাংসা করে যেমন নিজের জন্যে করতো। (আহমদ)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর এবং আনুগত্য প্রকাশ কর তাঁর রসূলের, আর তোমাদের মধ্যে যারা নেতা তাদের কথাও মান্য কর"।

শানে নুযুল

(১) বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ এবনে হোজায়ফা (রাঃ) সম্পর্কে যাঁকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুজাহিদদের একদল নিয়ে প্রেরণ করেছিলেন।

(২) এবনে জরীর এবং এবনে হাতেম সুদ্দীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খালেদ এবনে ওয়ালিদ

(রাঃ)-এর নেতৃত্বে মুজাহেদীনের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনীতে হযরত আম্মার এবনে ইয়াসীরও (রাঃ) ছিলেন, যাদের উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা ছিল তাদের নিকট এ বাহিনী অতি প্রত্যুষে পৌঁছল। কিন্তু তখন সেখানকার লোকেরা পলায়ন করেছে। শুধু এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। সে ব্যক্তি হযরত আম্মারের (রাঃ) খেদমতে হাযির হয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলো এবং কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলো। হযরত আম্মার (রাঃ) বললেন, তুমি এখানেই থাক। মুসলমান হওয়ার উপকার তুমি পাবে। অতঃপর হযরত খালেদ এবনে ওয়ালিদ (রাঃ) যখন ঐ বস্তির উপর হামলা করলেন তখন হযরত আম্মার (রাঃ) বললেন, এ ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও, সে মুসলমান হয়ে গেছে এবং আমার আশ্রয়ে এসে গেছে। তখন হযরত খালেদ (রাঃ) এবং হযরত আম্মার (রাঃ)-এর মধ্যে এ বিষয়ে বিতর্ক হলো। এমনকি মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁরা উভয়ে বিষয়টি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আম্মার (রাঃ)-এর আশ্রয় দেয়ার কথা ঠিক রাখলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে যেন নেতার কথার বরখেলাফ না করা হয়, সে বিষয়ে তাগিদ করলেন। স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সামনেও উভয়ের মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ হে খালেদ! আম্মারকে গালি দিওনা। যে আম্মারকে গালি দেবে আল্লাহ পাক তাকে মন্দ বলবেন। যে আম্মারের সঙ্গে শত্রুতা রাখবে আল্লাহ পাক তাকে ঘৃণা করবেন। যে আম্মারের প্রতি লা'নত দেবে আল্লাহ পাক তার প্রতি লা'নত দেবেন। এ ফরমান শ্রবণ করে হযরত খালেদ এবনে ওয়ালিদ (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে হযরত আম্মার এবনে ইয়াসীরের (রাঃ) নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হলেন এবং হযরত আম্মার (রাঃ) তাঁর প্রতি রাযী হলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

আলোচ্য আয়াতে "উলিল আম্‌র" শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন-

১. এর অর্থ হলো খোলাফায়ে রাশেদীন,

২. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জেহাদের উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল প্রেরণ করতেন। তাদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নির্বাচন করতেন। এ শব্দ দ্বারা সে নেতাদেরকে বোঝানো হয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪৭-৪৮
তফসীরে কবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৪৪
তফসীরে রুহুল মা'আনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৫

৩. এতদ্বারা ওলামায়ে কেরামের সে দলকে বোঝানো হয়েছে যারা মানুষকে দ্বীন ইসলামের তা'লিম দিয়ে থাকেন এবং শরীয়তের বিধি-নিষেধ দেন। এ মত পোষণ করতেন হাসান, মুজাহেদ এবং যাহ্যাক। আর সা'লাবীর বর্ণনা মতে, আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)।[১] আবু সায়েবা হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, "উলিল আম্‌র" অর্থ যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে সেসব লোক। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, মুজাহেদ বাহিনীর সরদার। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, "উলিল আম্‌র" শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে স্বয়ং রাষ্ট্রনায়ক অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং বিভিন্ন শহরের শাসনকর্তা তথা জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সৈন্য বাহিনীর অধিনায়কগণও।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, যখন রাষ্ট্রনায়ক আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বিধান মোতাবেক মীমাংসা করে এবং তার প্রতি অর্পিত আমানত আদায় করে তখন জনগণের কর্তব্য হলো তার হুকুম পালন করা। হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তাদের অনুসরণ কর যারা আমার পরে আসবে অর্থাৎ আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)-এর অনুসরণ কর। (তিরমিজী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে আমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলো সে আল্লাহর প্রতি অনুগত হলো, আর যে আমার হুকুম অমান্য করলো সে আল্লাহর নাফরমান হলো, যে শাসনকর্তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলো সে আমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলো। যে হাকেম বা শাসনকর্তার অবাধ্য হলো সে আমার অবাধ্য হলো। (বোখারী ও মুসলিম)

হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট একথার উপর বয়আত করেছি যে, আমি তার হুকুম পালন করবো। সে হুকুম সহজ হোক বা কঠিন, সন্তুষ্ট অবস্থায় ও অসন্তুষ্ট অবস্থায় (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়) আর (মুসলমানদের) শাসনকর্তাদের সাথে তাদের আদেশের ব্যাপারে কলহ দ্বন্দ্ব করবো না। আর যেখানেই থাকি সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবো এবং সত্য কথা বলবো। আর আল্লাহ পাকের ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করবো না। (বোখারী, মুসলিম)

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৪৪

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শাসনকর্তার হুকুম মান্য কর যদিও তা এমন কোন হাবশী গোলামের হুকুম হয় যার মাথা কিসমিসের মত। (বোখারী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে নিজে শ্রবণ করেছিঃ বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে থাক এবং রমজান মাসে রোজা রাখ এবং নিজের অর্থ-সম্পদের যাকাত আদায় করতে থাক, আর যখন কেউ তোমাকে আদেশ করে তবে সে আদেশ মান্য কর। তাহলে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বেহেশতে প্রবেশ করবে। (তিরমিজী)

স্বামী-স্ত্রীকে আদেশ দেয়, মনিব চাকরকে আদেশ দেয়, পিতা সন্তান-সন্ততিদেরকে আদেশ দেয় এসবই উলিল আম্‌র-এর অন্তর্ভুক্ত।[১] বস্তুত এ জীবনে যার প্রতি যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাকে কেয়ামতের দিন সে দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, ওলামা এবং মাশায়েখ অবশ্যই উলিল আম্‌র এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মুসলিম জাতির এ অংশটিই আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকারী এবং আল্লাহর রসূলের বিধি-নিষেধের আমানতদার।

এবনে জরীর এবং হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যারা দ্বীন ইসলামের তত্ত্বজ্ঞানী তারাই হলেন উলিল আম্‌র। আবুল আলীয়া এবং মুজাহেদের তরফ থেকেও এমন কথা বর্ণিত আছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আলেমগণ হলেন আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকারী। (আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ, এবনে মাজাহ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বলেছেনঃ সমস্ত লোক তোমাদের অনুসারী, আর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তোমাদের নিকট অনেক লোক আসবে দ্বীন ইসলামের তত্ত্ব অনুধাবনের জন্যে।

শাসনকর্তার প্রতি আনুগত্য

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যে, কোন শাসনকর্তার প্রতি আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত আবশ্যক যতক্ষণ পর্যন্ত সে শরীয়তের খেলাফ আদেশ না দেয়। কেননা, আয়াতের বর্ণনা-শৈলীর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়। লক্ষ্যনীয়, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম আদল তথা সুবিচার কায়েম

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪৮-৪৯

করার আদেশ দিয়েছেন। এরপর শাসনকর্তাদের আনুগত্যের হুকুম হয়েছে। এতে একথা জানা যায় যে, যতক্ষণ শাসনকর্তা সুবিচার এবং ন্যায়নীতির উপর কায়েম থাকে ততক্ষণ তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা ওয়াজিব। এরপর আল্লাহ পাক নিজে এরশাদ করেছেনঃ

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ

যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় তবে তোমরা আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিধি-নিষেধের প্রতি লক্ষ্য কর এবং সে আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, যেসব বিষয়ের অধিকার শাসনকর্তাকে দেয়া হয়েছে যদি সেসব ব্যাপারে তারা সুবিচার কায়েম করেন তবে তাদের প্রতি আনুগত্য অবশ্য কর্তব্য। পক্ষান্তরে যেসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তাদেরকে দেয়া হয়নি সেসব ব্যাপারে তাদের আনুগত্য জরুরী নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তি যদি কাউকে এ নির্দেশ দেয় যে, তুমি এ পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও তখন এমন আদেশ পালন করা ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য নয়।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ এবনে হোযায়ফা (রাঃ) সম্পর্কে যাঁকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি মুজাহেদ বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। হাদীস বিশারদগণ এই হাদীসের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে হোজায়ফা (রাঃ) তাঁর বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। পথে কোন ব্যাপারে তিনি সঙ্গীদের প্রতি রাগান্বিত হয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করলেন এবং সাথীদেরকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা সবাই এ জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়। মুজাহেদদের মধ্যে কিছু লোক এ আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জানান, আর কিছু লোক আদেশ পালনের ইচ্ছা করেন।

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ

অর্থাৎ যদি কোন বিষয়ে তোমাদের এবং তোমাদের শাসনকর্তাদের মধ্যে মতভেদ হয় এমন অবস্থায় তোমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি মনোনিবেশ কর। অর্থাৎ পবিত্র কোরআন ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদর্শ মোতাবেক তথা শরীয়ত মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। যদি তোমাদের শাসনকর্তার আদেশ শরীয়ত মোতাবেক হয় তবে অবশ্যই তা পালন কর। আর যদি শরীয়তের খেলাফ হয় তবে তা পালন করা বৈধ নয়।

যদি বিষয়টি এমন হয় যে, পবিত্র কোরআন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীসে তার কোন বিধান না পাওয়া যায় তবে এজমা ও কেয়াসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

হযরত এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নেতার আদেশ শ্রবণ করা এবং পালন করা মুসলমানদের কর্তব্য। সে আদেশ পছন্দ হোক বা না হোক। তবে শর্ত হলো যদি আল্লাহর নাফরমানীর হুকুম না দেয়া হয় কিন্তু যদি আল্লাহর নাফরমানীর হুকুম দেয়া হয় তবে শ্রবণ না করা এবং আদেশ পালন না করা বৈধ। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহর নাফরমানীর কাজে কারো আনুগত্য বৈধ নয়, আনুগত্য শুধু সৎ কাজে যেমন বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে হোযায়ফা (রাঃ)-এর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন আনসারী সাহাবীর নেতৃত্বে একদল মুজাহেদ বাহিনী প্রেরণ করেন। একবার তিনি কোন কারণে সাথীদের উপর রাগান্বিত হয়ে বললেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি তোমাদেরকে আমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আদেশ দেননি?

তারা বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, জ্বালানী কাঠ একত্রিত কর। এরপর অগ্নি প্রজ্জলিত করা হলো। তখন তিনি আদেশ দিলেন তোমরা সকলেই অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন একজন যুবক বললেন, শোন! আমরা অগ্নির আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই তো হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আশ্রয় নিয়েছি। অতএব, তাড়াহুড়া করোনা যতক্ষণ পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দীদার না হয়। যদি তিনিও এ আদেশ দেন তবে বিনা দ্বিধায় অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়। অতঃপর তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ যদি তোমরা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে তবে সর্বদা অগ্নিতেই থাকতে। মনে রেখো, আনুগত্য শুধু সৎ কাজেই হয়।[১]

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যদি কোন মুজতাহেদ এমন ফতোয়া দেয় যা কোরআন ও হাদীসের খেলাফ তবে সে ফতোয়া বর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫১

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মোবারক (রঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর কথা শুনেছি। তিনি বলেছেনঃ যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস পাওয়া যায় (অর্থাৎ তাঁর অভিমতের খেলাফ) তবে আমি অবশ্যই তা কবুল করবো। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেনঃ যদি আমার কোন কথার খেলাফ কোন হাদীস পাওয়া যায় বা কোন সাহাবীর কোন কথাও পাওয়া যায় তবে আমার কথা অবশ্য বর্জনীয়।

اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্ পাক এবং আখেরাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখ তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা মেনে চলাই তোমাদের কর্তব্য। নিজেদের বিরোধ মীমাংসায় স্বীয় অভিমত বর্জন করা এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হুকুম মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের কল্যাণ, এটি তোমাদের জন্যে উত্তম পন্থা।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, চারটি বুনিয়াদ বা ভিত্তি রয়েছে (১) আল্লাহর কিতাব পবিত্র কোরআন (২) সুন্নতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (৩) এজমা এবং (৪) কেয়াস। এ চারটির প্রতিই আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে।

اَطِيْعُوا اللّٰهَ

প্রথমতঃ আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর তথা আল্লাহর কিতাব মেনে চল।

وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

দ্বিতীয়তঃ রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর তথা সুন্নতে রসূল মেনে চল।

وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

তৃতীয়তঃ আর উলিল আম্‌রের আনুগত্য প্রকাশ কর। ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এতদ্বারা এজমায়ে উম্মতের দলিল হওয়া প্রমাণিত হয়। এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন।[১]

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৪৩-৪৫

أَلَمْ تَرَ إِلَى
الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن
قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن
يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

তরজমা

(৬০) (হে রসূল!) আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি? যারা দাবী করে যে, তারা সেই কিতাবের প্রতি বিশ্বাস করেছে যা আপনার নিকট অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেই কিতাব সমূহের উপরও যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা নিজেদের মামলা শয়তানের নিকট নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি আদেশ করা হয়েছে শয়তানের অবাধ্য হতে। বস্তুতঃ শয়তানই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে এবং সৎ পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

এবনে জরীর শা'বীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, এক ইহুদী এবং এক মুনাফেকের মধ্যে কলহ দ্বন্দ্ব ছিল। ইহুদীর ইচ্ছা ছিল বিষয়টি মীমাংসার জন্যে প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হবে। কিন্তু মুনাফেকের ইচ্ছা ছিল যে, ইহুদীদের দ্বারাই এর মীমাংসা করা হোক। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বিচারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা, উৎকোচ গ্রহণ করা ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য ছিল। এ কারণে যারা দুর্নীতিপরায়ণ এবং অন্যের হক্ব বিনষ্টকারী তাদের একান্ত আকাঙ্খা হতো যেন ইহুদী ধর্মযাজকদের দ্বারা বিচার করা হয়। কেননা, ইহুদী ধর্মযাজকদের ঘুষ দিয়ে নিজের অনুকূলে রায় ও ডিক্রী লাভ করা সহজ। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এমন সব অন্যায়-অনাচারের সুযোগ নেই, পক্ষপাতিত্ব নেই। তাই তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে বিচার নিয়ে আসতে ভয় করতো। যাহোক, ইহুদী এবং মুনাফেক একমত হয়ে যোহায়নীয়া গোত্রের এক গনকের নিকট হাযির হলো এবং নিজেদের মোকদ্দমা তার নিকট পেশ করলো। সা'লাবী হযরত এবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে লিখেছেন, এ ইহুদীর নাম ছিল কালবী বসার। সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হওয়ার জন্যে মুনাফেক ব্যক্তিকে আহবান

করলো। আর মুনাফেক লোকটি তদানীন্তন ইহুদী নেতা কাব এবনে আশ্রাফের নিকট গমনের জন্যে আকাঙ্খা পেশ করলো। কিন্তু ইহুদী কাব এবনে আশ্রাফের নিকট যেতে অস্বীকৃতি জানালো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মীমাংসা লাভের দাবী জানাতে থাকলো। অবশেষে মুনাফেক এ প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হলো এবং উভয়ে দরবারে নববীতে হাযির হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহুদীর পক্ষে রায় প্রদান করলেন। অতঃপর যখন দরবারে নববী থেকে তারা বের হলো তখন মুনাফেক ইহুদীকে জড়িয়ে ধরলো এবং বললো, সানী বিচারের জন্যে ওমর (রাঃ)-এর নিকট চল। উভয়ে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট হাযির হলো। ইহুদী বললোঃ আমি এবং এ ব্যক্তি আমাদের পরস্পরের মোকদ্দমা নিয়ে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট গমন করি। তিনি তার বিরুদ্ধে আমার পক্ষে রায় দিয়েছেন। কিন্তু সে এ রায়ের উপর সন্তুষ্ট হয়নি। তাই আমাকে সে আপনার নিকট নিয়ে এসেছে। হযরত ওমর (রাঃ) মুনাফেককে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ ঘটনাই কি হয়েছে? সে বললো, জ্বি-হ্যাঁ। হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি ভেতর থেকে আসছি। তিনি একথা বলে বাড়ীর ভেতরে গমন করলেন এবং তরবারি হাতে নিয়ে বের হয়ে আসলেন। মুনাফেক লোকটিকে তরবারি দ্বারা হত্যা করলেন এবং বললেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মীমাংসায় রাজি না হয় আমি তাঁর মীমাংসা এভাবেই করে থাকি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

এ ঘটনার বিবরণ দিয়ে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন যে, ইহুদী এবং মুনাফেক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে বের হওয়ার পর মুনাফেক বললো, আমি এ রায় পেয়ে সন্তুষ্ট হইনি। চল আমরা আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট যাই। হযরত আবু বকর (রাঃ) একই রায় প্রদান করলেন। তখন মুনাফেক বললো, আমি সন্তুষ্ট নই। আমার এবং তোমার মাঝে ওমর (রাঃ) সিদ্ধান্ত দেবেন। এরপর হযরত ওমর (রাঃ)-এর সিদ্ধান্তের বিবরণ রয়েছে। এরপর একথাও সংযোজিত হয়েছে যে, মুনাফেক নিহত হওয়ার পর ইহুদী পলায়ন করলো। এরপর মুনাফেকদের একদল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে হযরত ওমর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)-কে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সে আপনার মীমাংসা মানেনি। এমন সময় জিব্রাঈল (আঃ) উপস্থিত হলেন এবং বললেনঃ ওমর হলো ফারুক। তিনি হক্ব এবং বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)-কে বললেনঃ তুমি হলে ফারুক। তখন থেকে তিনি 'ফারুক' উপাধিতে ভূষিত হন।

আলোচ্য আয়াতে 'তাগুত' শব্দটি ইহুদী নেতা বা এবনে আশ্রাফের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতের আরো একটি শানে নুযুল বর্ণিত হয়েছে। ইহুদীদের কিছু লোক ইসলাম কবুল করে আর কিছু লোক মুনাফেকী করে। জাহেলী বা বর্বরতার যুগে বনু কোরায়জা ও বনু নযীরের মধ্যে এ ব্যবস্থা ছিল যে, যদি বনু কোরায়জার কেউ বনু নযীরের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতো তখন বনু কোরায়জা থেকে প্রাণের বদলা প্রাণ দিতে হতো এবং তাদের নিকট থেকে ১০০ ওয়াসক খেজুর গ্রহণ করা হতো। পক্ষান্তরে যখন বনু নযীর গোত্রের কেউ বনু কোরায়জা গোত্রের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতো তখন প্রাণের বদলা প্রাণ দিতে হতো না। শুধু ৬০ ওয়াসক খেজুর দেয়া হতো। কেননা, বনু নযীর উঁচু বংশীয় লোক হিসেবে পরিগণিত হতো। আর তারা আওস, আর বনু কোরায়জা খাজরাজ গোত্রের মিত্র ছিল। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করলেন তখন বনু নযীর গোত্রের এক ব্যক্তি বনু কোরায়জা গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করলো এবং পরস্পর কলহ-দ্বন্দ্ব হলো। বনু নযীর বললো, আমাদের উপর কেসাস তথা প্রাণের বদলা প্রাণ দেয়ার দায়িত্ব নেই। আমরা শুধু ৬০ ওয়াসক খেজুর আদায় করবো যা ইতিপূর্বে নিয়ম ছিল। তখন খাজরাজ গোত্রের লোকেরা বললো, এ নিয়ম আইয়ামে জাহেলিয়াত বা বর্বরতার যুগের, এখন এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না, এখন মুসলমান হওয়ার কারণে আমরা ভাই ভাই, আমাদের ধর্ম একই। অতএব, কারো প্রতি কারো কোন প্রাধান্য নেই। বনু নযীর একথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালো। তখন মুনাফেকরা বললো, তোমরা আবু বরদা নামক গনকের নিকট যাও, সে তোমাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবে। মুসলমানগণ বললেন, না তোমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যাও। কিন্তু মুনাফেকরা তা অস্বীকার করলো এবং বললো আবু বরদা গনকের নিকট যাও, সে-ই মীমাংসা করবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু বরদাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে ইসলাম কবুল করে। এ মত পোষণ করতেন সুদ্দী (রঃ)।[১]

এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৫৩-৫৪
খোলাসতুত তাফাসীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪০৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৩-৫৪
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৭
তফসীরে বয়ানুল কোরআন খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮২

"(হে রসূল!) আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি? যারা দাবী করে আপনার প্রতি যে কিতাব নাযিল হয়েছে এবং যা ইতিপূর্বে নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনার, আর তাদের নিজেদের মামলা তারা শয়তানের কাছে নিয়ে যায় অথচ তাদের প্রতি আদেশ হয়েছে শয়তানের অবাধ্য হওয়ার"।

আলোচ্য আয়াতে মুনাফেকদের কথা বর্ণিত হয়েছে। কেননা, তারা ছিল ঈমানের দাবীদার অথচ ঈমান বিরোধী কাজ করতে তারা ছিল সিদ্ধহস্ত। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ পাক মুনাফেকদের প্রকৃত চেহারা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেন। আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে মোমেনদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন ইহুদী নাসারা তথা কাফেরদের সঙ্গে কোন প্রকার বন্ধুত্ব না করে যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ

"হে মোমেনগণ! তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা"।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ

আরো এরশাদ হয়েছেঃ "হে মোমেনগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহন করোনা"।

এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গণকদের নিকট হাযির হয়ে কথা-বার্তা জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করেছেন। এ পর্যায়ে তিনি বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তেবরানী হযরত ওয়াসেলার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট গমন করে কিছু জিজ্ঞাসা করে ৪০ দিন পর্যন্ত তার তওবা মুলতবী থাকে তথা তওবার দ্বার রুদ্ধ থাকে। যদি সে গণকের কথা বিশ্বাস করে তবে ইসলামের নেয়ামত থেকে মাহরূম হয়ে যায়।[১]

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া এবং কাফেরদের কথা গ্রহণ করা ঈমান বিরোধী কাজ। শয়তানকে মেনে নেয়া তথা তার প্রতি বিশ্বাস করা আল্লাহ পাকের সাথে নাফরমানী করার শামিল। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৫

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْيُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

"অতএব, ভয় করা উচিত তাদের যারা আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করে যে, যে কোন সময় তাদের উপর বিপদ মসিবত আপতিত হতে পারে অথবা তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে"।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর কোন বিধানের বিরোধতা করা মহাপাপ। যে বা যারা আল্লাহ পাকের কোন বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে সন্দেহের কারণে অথবা বিরোধিতার মাধ্যমে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জমানায় যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلاً' بَعِيْدًا

অর্থাৎ- শয়তান চায় যেন তোমাদেরকে সে পথভ্রষ্ট করে সরল পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এ শয়তান জ্বীনও হতে পারে, মানুষও হতে পারে যেমন সূরা নাসে এরশাদ হয়েছেঃ

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

অর্থাৎ- শয়তান জ্বীন ও মানুষ উভয় দলেরই হতে পারে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন যে, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কাফেরের কুফর আল্লাহর সৃষ্টি নয় এবং তাঁর ইচ্ছায়ও নয়। এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে কুফর ও নাফরমানীকে শয়তানী কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। মুসলমান হওয়ার পর কোন ইসলাম বিরোধী মতবাদ গ্রহণ করা বা সমর্থন করার অনুমতি নেই। আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমানের পর কোন ইসলাম বিরোধী মতবাদ গ্রহণ করা বা ইসলামী আইন-কানুনের বিরোধিতা করা ঈমান বিরোধী কাজ, যা কোন মুসলমানদের পক্ষে সম্ভবও নয়, বৈধও নয়। আধুনিককালে যারা বংশগত কারণে মুসলমান হিসেবে পরিচিত এবং ইসলামের বিরোধিতা বা ইসলামী বিধি-নিষেধের ব্যাপারে বিদ্রুপ করতে দ্বিধাবোধ করে না তাদের জন্যে এ আয়াতে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী। বর্তমান যুগে কোন কোন

লোককে কোরবানীর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করতো দেখা যায়। এমনকি, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হজ্জ সম্পর্কেও আপত্তিকর মন্তব্য করতে দেখা যায়। আলোচ্য আয়াতে এমন লোকদের জন্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী। কেননা, ইসলামের কোন বিধানকে অমান্য করা বা উপহাস করার অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাফরমানী আর আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি অবধারিত।

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন যে, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মুনাফেকদের মিথ্যা দাবীর কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন। যারা মুখে ঈমানের দাবীদার ছিল অথচ প্রকৃত ঈমানদার ছিল না তারা যে সত্যিকার অর্থেই মিথ্যাবাদী একথা সুস্পষ্টভাবে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। যারা দাবী করতো যে, আমরা পবিত্র কোরআনের প্রতি এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস করি কিন্তু যখন কোন বিষয়ের অনুসন্ধান করতো অথবা কোন বিরোধ মীমাংসায় সচেষ্ট হতো তখন তারা আল্লাহর কোরআনের দিকে আসত না। এ আয়াতে তাদের পথভ্রষ্টতার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا

অর্থাৎ- যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা আল্লাহ পাকের অবতীর্ণ কিতাবের অনুসরণ কর তখন তারা বলে আমরা তো আমাদের পিতা, পিতামহের অনুসরণ করি। কিন্তু মোমেনগণ এ জবাব দেয় না, বরং তারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্যের কথা বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করে। তারা বলে আমরা আল্লাহ্ পাকের কথা শ্রবণ করেছি এবং অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছি।

وَ
اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ
يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا
قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا
وَّتَوْفِيْقًا ﴿٦٢﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا

তরজমা

(৬১) এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার অবতীর্ণ কিতাব এবং তাঁর রসূলের দিকে আস তখন আপনি মুনাফেকদেরকে দেখবেন যে, তারা আপনার নিকট থেকে দূরে সরে পড়েছে।

(৬২) যখন তাদের পূর্ব কৃতকর্মের কারণে কোন বিপদ তাদের উপর আসবে তখন তাদের কি অবস্থা হবে? অতঃপর তারা আপনার নিকট আসবে, আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে, কল্যাণ এবং পরস্পর মিলন ভিন্ন আমাদের কোন উদ্দেশ্যই ছিল না।

(৬৩) এদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ পাক তা খুব ভালভাবেই জানেন, অতএব (হে রসূল!) আপনি তাদের নিকট থেকে নির্লিপ্ত থাকুন এবং তাদেরকে নসিহত করুন এবং তাদেরকে এমন কথা বলুন যা তাদের মর্মস্পর্শ করে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফেকদের শয়তান থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগ্রহের কথা এরশাদ হয়েছে। আর এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হওয়ার ব্যাপারে তাদের অনীহার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা, তারা ছিল জালেম, আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে অন্যায় পন্থায় সিদ্ধান্ত হয়না। এতদ্ব্যতীত, দ্বীন ইসলামের প্রতি তাদের ছিল শত্রুতা। এজন্যেই মুনাফেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে দূরে থাকতো। এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, মুনাফেকদেরকে যখন বলা হতো পরস্পরের মীমাংসায় আল্লাহর আদেশ পালন কর এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হও। তখন মুনাফেকরা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতো। যেহেতু নিজেদেরকে তারা মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আসবেনা একথাও বলতে পারে না, আর যেহেতু মুনাফেকরা প্রকৃত মুসলমান নয়, তাই আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ মানতে চায়না। ফলে কোন প্রকার কৌশলে দূরে থাকতে চায় এবং এজন্যে তারা সর্বদা সচেষ্ট থাকে। শুধু তাই নয়; বরং অন্যত্র বিচার নেয়ার জন্যে উদগ্রীব থাকে। কেননা, অন্যত্র ঘুষ দিয়ে বিচার ক্রয়ের আশা থাকে এবং মিথ্যা বলে উদ্দেশ্য সফল করার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে মিথ্যা বলে কার্যোদ্ধার করা যায়না। অন্য কোন অন্যায় পন্থাও অবলম্বন করা যায়না, এজন্যে মুনাফেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতো।

বর্ণিত আছে যে, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত ঘটনায় যখন হযরত ওমর (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিচার অমান্যকারী মুনাফেককে হত্যা করলেন তখন তার আত্মীয়-স্বজন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে এ অভিযোগ করে যে, হযরত ওমর (রাঃ) তাদের লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছেন এবং তারা শপথ করে বলে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিচারের পর হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট যাওয়ার উদ্দেশ্য আপনার বিচারকে অমান্য করা নয়; বরং পরস্পরের মধ্যে তিনি যেন একটা মীমাংসা করে দেন তার চেষ্টা করা। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ

অর্থাৎ- মুনাফেকদের অবস্থা কি আশ্চর্যজনক যে, তাদের অন্যায় আচরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ যখন তাদের উপর কোন বিপদ আসে তখন তারা কি করবে? (হে রসূল!) তারা আপনার নিকটই হাযির হবে এবং মিথ্যা শপথ করে একথা বলবে যে, আপনার বিচার এবং আপনার মীমাংসা অমান্য করার কথা আমাদের জন্যে কল্পনাতীত, এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা তো শুধু পরস্পরের সন্ধি এবং ব্যাপারটা মীমাংসা করার উদ্দেশ্যই হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট গিয়েছিলাম। আপনার আদেশ নিষেধ অমান্য করার কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। আপনাকে অসন্তুষ্ট করার কোন উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না। আমরা আশা করেছিলাম হযরত ওমর (রাঃ) আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা মীমাংসা করে দেবেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে আশ্চর্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা ভবিষ্যতের জন্যে, এর অর্থ হলো বর্তমানে তো এ মুনাফেকরা অন্যায় করার পর মিথ্যা বলে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হয় কিন্তু যখন তাদের অন্যায় আচরণের কারণেই তাদের প্রতি আযাব আসবে তখন তারা কিভাবে শপথ করবে? অথবা এ আয়াতের অর্থ হলো এই, যখন তাদের প্রতি আল্লাহর আযাব আসবে অথবা মুসলমানদের তরফ থেকে তাদের বিরুদ্ধে যখন প্রতিশোধ নেয়া হবে তখন তাদের কি অবস্থা হবে?

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ- আল্লাহ পাক মুনাফেকদের মিথ্যাবাদীতার মুখোশ খুলে দিলেন এবং এরশাদ করলেন যে, মুনাফেকরা মুখে যাই বলুক আল্লাহ পাক তাদের অন্তরের কথা ভাল ভাবেই জানেন। (হে রসূল!) আপনি তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। তাদের ব্যাপার নিয়ে নির্লিপ্ত থাকুন এবং তাদের ব্যাপার আল্লাহ পাকের হাতে ছেড়ে দিন। তবে তাদের হেদায়েতের ব্যাপারে নিরাশ হবেন না, বরং তাদের হেদায়েত করতে থাকুন এবং তাদেরকে এমন কথা বলুন যা তাদের অন্তরে দাগ কাটে, মর্মস্পর্শ করে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেনঃ

قَوْلًا بَلِيغًا

এর অর্থ হলো তাদেরকে একথা বলা যে, তোমরা এভাবেই মৃত্যু মুখে পতিত হবে। হয়তো একথা তাদের অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।[১]

আলোচ্য আয়াতে মুনাফেকদের সম্পর্কে নিরাশ না হওয়ার এবং তাদেরকে নসিহত করার নির্দেশ রয়েছে। কেননা, নসিহতে দুটি উপকার রয়েছেঃ

১. যদি নসিহত কবুল করে তবে তাই হলো সাফল্য।

২. নসিহতকারী আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে সওয়াব পাবে, যদি নসিহত কবুল না-ও করে। সওয়াব প্রাপ্তি থেকে নসিহতকারী বঞ্চিত হবে না। আর প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হলো মানুষকে সত্যের নির্দেশ দেয়া এবং অসত্যের পথ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হওয়া আর 'কওলে বলীগ' এর অর্থ হলো উপদেশ দাতার এমন পন্থা অবলম্বন করা যা শ্রোতার মনে দাগ কাটে, রেখাপাত করে, শ্রোতার জন্যে মর্মস্পর্শী হয়।

এ আয়াতের আরো একটি অর্থ হতে পারে যে (যেহেতু মুনাফেকদের দ্বারা অনেক ক্ষতি হলেও ইসলামের দাবীদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতো এবং কাফেরদের মোকাবেলায় সংখ্যা বৃদ্ধি উপকারী বিষয় ছিল) তাই মুনাফেকদেরকে শাস্তি দেয়ার স্থলে তাদেরকে নসিহত কর এবং এমন নসিহত যা তাদের মর্মস্পর্শ করে। একাকী তাদেরকে নসিহত কর। কেননা, একাকী নসিহত অনেক উপকারী হয়।

﴿٦٣﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا۟ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

১.। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৭
খোলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪০৪

তরজমা

(৬৪) এবং আমি পয়গম্বরগণকে এজন্যে প্রেরণ করেছি যেন আল্লাহ তায়ালার আদেশক্রমে তাদের তাবেদারী করা হয় এবং যদি তারা নিজেদের উপর জুলুম করে (অর্থাৎ গুনাহ করে) (হে রসূল!) আপনার নিকট হাযির হয় এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা চায় এবং রসূলও তাদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হয় তবে তারা আল্লাহ তায়ালাকে ক্ষমাশীল, দয়াময় পাবে।

(৬৫) অতএব, (হে রসূল!) আপনার পালনকর্তার শপথ যে, তারা কোন দিনও মোমেন হতে পারবে না যে পর্যন্ত তারা আপনাকে তাদের ঘরোয়া বিরোধের জন্যে বিচারক না বানায়। পরে যেন আপনার বিচার সম্বন্ধে তাদের মনে কোন প্রকার বিরুদ্ধ ভাব না জাগে এবং তা শান্ত চিত্তে গ্রহণ করে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুকরণের আদেশ রয়েছে, অতঃপর একটি ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে যে, মুনাফেকদের কিছু লোক শয়তানের মীমাংসা মানতে প্রস্তুত অথচ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে বিচারের জন্যে হাযির হতে রাযী নয়। অথবা হাযির হলেও তাঁর বিচার মেনে নিতে রাযী নয়। তাদের এ অন্যায় আচরণের বিবরণ এবং শোচনীয় পরিণাম বর্ণিত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ একান্ত কর্তব্য

আলোচ্য আয়াতে পুনরায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুকরণের আহবান জানানো হয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ

অর্থাৎ- মানুষ যেন আল্লাহর রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, আল্লাহর হুকুমে তাঁর রসূলের কথা মেনে চলে এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক রসূল প্রেরণ করে থাকেন। এমনি অবস্থায় বিনা দ্বিধায় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ মেনে চলা ছিল তাদের কর্তব্য। কিন্তু যদি কোন কারণে সূচনাতে ভুল হয়ে থাকে এবং সে ভুল সম্পর্কে সতর্ক হওয়া মাত্র তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হতো এবং আল্লাহ্ পাকের মহান

দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হতো এবং আল্লাহর রসূলও তাদের পক্ষে ক্ষমাপ্রার্থী হতেন, তবে তারা অবশ্যই আল্লাহ পাকের দরবার থেকে ক্ষমা লাভ করতো। একথা নিশ্চিত ভাবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ পাক অবশ্যই তওবা গ্রহণকারী এবং অত্যন্ত মেহেরবান। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ পাকের আদেশ হলো যখনই কোন পয়গম্বর প্রেরণ করা হয় তখন যেন মানুষ তাঁকে মেনে চলে এবং তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করে। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর রসূলের হুকুম অমান্য করে তবে তাকে যেন হত্যা করা হয়। কেননা, যে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করলো সে যেন তাঁর রেসালতকে অস্বীকার করলো।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا

অর্থাৎ যদি মুনাফেকরা তাদের মুনাফেকীর কারণে এবং শয়তানের নিকট মীমাংসার উদ্দেশ্যে যাওয়ার কারণে নিজেদের প্রতি জুলুম করে, এমন অবস্থায় যদি তারা (হে রসূল!) আপনার নিকট হাযির হতো আর নিজেরাও মুনাফেকী থেকে খাঁটি তওবা করতো এবং আল্লাহর রসূলও তাদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হতেন তবে আল্লাহ পাককে তারা অত্যন্ত তওবা গ্রহণকারী, দয়াময় পেত।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। আবতাবী বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রওজায়ে পাকে আমি উপবিষ্ট ছিলাম। একজন গ্রাম্য ব্যক্তি তখন হাযির হলো এবং বললো 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি পবিত্র কোরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করে আপনার নিকট হাযির হয়েছি যেন আপনার সম্মুখে আমি আমার কৃত অন্যায়ের জন্যে তওবা করি এবং আপনার শাফাআতের অন্বেষন করি। অতঃপর সে একটি কবিতার দুটি পংক্তি পাঠ করতে লাগলোঃ

يا خير من دفنت بالقاع اعظمه

فطاب من طيبهن القاع والاكم

نفسى الفداء لقبر انت ساكنه

فيه العفاف وفيه الجود والكرم

"যাঁদের হাড় সমূহ ময়দানে দাফন করা হয়েছে এবং যাঁদের সুগন্ধ দ্বারা ময়দান এবং পাহাড়ের টিলা সমূহ মোহিত হয়েছে তাদের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম আমার প্রাণ তাঁর তরে কোরবান। (হে রসূল!) যে কবরে আপনি রয়েছেন তাতে রয়েছে পরহেযগারী, দানশীলতা এবং দয়া-মায়া"।

অতঃপর গ্রাম্য লোকটি চলে গেল। আমি নিদ্রিত হলাম। তখন স্বপ্নে দেখি স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে সম্বোধন করে বলছেনঃ যাও এ গ্রাম্য লোকটিকে সংবাদ দাও যে, আল্লাহ পাক তার গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ পাক স্বয়ং তাঁর পবিত্র সত্তার শপথ করে এরশাদ করেছেনঃ কোন ব্যক্তি সে পর্যন্ত মোমেন হতে পারবে না যে পর্যন্ত সব ব্যাপারে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নিজের মীমাংসাকারী হিসেবে গ্রহণ না করে এবং তাঁর প্রত্যেকটি আদেশ, প্রত্যেকটি সুন্নত এবং প্রত্যেকটি হাদীসকে না মেনে নেয়; দেহ এবং অন্তরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী না বানায় এক কথায় যে ব্যক্তি গোপন ও প্রকাশ্য, ছোট এবং বড় সব বিষয়ে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে মেনে নেয় সে-ই প্রকৃত মোমেন।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "সেই আল্লাহর শপথ যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত মোমেন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত নিজেকে সেই বিধানের অনুসারী না করে যা আমি নিয়ে এসেছি"।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা, তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করা এবং তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা প্রকৃত মোমেন হওয়ার জন্যে পূর্বশর্ত।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ), এবনে কাসীর (রঃ), ইমাম রাজী (রঃ) এবং আল্লামা আলুসী (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ তাদের স্ব স্ব গ্রন্থে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই হাদীস বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ এবং আবু দাউদ শরীফ তথা সিহাহ সিত্তার সমস্ত গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে অবস্থিত "হাররা" নামক স্থানের কোন পাহাড়ের নালা থেকে জমিতে পানি সেচের ব্যাপারে হযরত যোবায়ের এবনুল আওয়ামের (রাঃ) সাথে একজন মদীনাবাসী ব্যক্তির বিতর্ক হয়। তারা উভয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়। তিনি আদেশ দেন যোবায়ের তুমি প্রথমে তোমার জমিতে পানি দাও, এরপর তোমার প্রতিবেশীর জমিতে পানি ছেড়ে দাও। মদীনাবাসী সে ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয় এবং বলে, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনার এ সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, যোবায়ের আপনার নিকটাত্মীয়। একথা শ্রবণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের (ক্রোধের কারণে) চেহারার রঙ পরিবর্তন হলো। তিনি এরশাদ করলেন, যোবায়ের! তোমার জমিনে পানি দেয়ার পর পানিকে এতক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখ যেন বাগানের দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও।

বস্তুতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথমে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন তা এমন ছিল যে, হয়তো যোবায়েরেরও কষ্ট হতো না এবং তাঁর প্রতিবেশীরও সুযোগ হতো। কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তি এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করলো তাই তিনি এমন ব্যবস্থা দিলেন যদ্বারা হযরত যোবায়ের (রাঃ)-এর হক্ব পূর্ণভাবে আদায় হয়। হযরত যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এই সময় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় এবং যে কোন অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সকল সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়ার বিধান পেশ করা হয়।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকেও এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।[১]

এ ঘটনা বর্ণনার পর আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, উল্লেখিত ঘটনায় হযরত যোবায়ের এবনে আওয়ামের (রাঃ) প্রতিপক্ষ হযরত হাতেব এবনে বলতাআ (রাঃ) ছিলেন বলে কোন কোন তফসীরকার উল্লেখ করেছেন। অথচ হাতেব এবনে বলতাআ (রাঃ) মোহাজের ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত যোবায়ের এবনে আওয়ামের (রাঃ) সঙ্গে কোন মুনাফেকই কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। আওস অথবা খাজরাজ গোত্রের সাথে বংশগত সম্পর্ক থাকার কারণেই তাঁকে আনসারী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাদেরকে এ সিদ্ধান্ত দিলেন তখন তারা উভয়ে বের হয়ে আসে এবং বিখ্যাত সাহাবী হযরত মেকদাদ (রাঃ)-এর সঙ্গে দেখা হয়। হযরত মেকদাদ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, সিদ্ধান্ত কার পক্ষে হয়েছে? সে ব্যক্তি মুখ বিকৃত করে বললো তাঁর আত্মীয়ের পক্ষে। তখন হযরত মেকদাদের নিকট একজন ইহুদী উপবিষ্ট ছিল। সে ঐ ব্যক্তির কথা বলার ভঙ্গীতেই তার মনের ভাবে বুঝলো এবং বললো, আল্লাহর অভিশাপ এসব লোকের উপরে যারা সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল অথচ তিনি যে সিদ্ধান্ত দেন (তা মানে না), তাঁর প্রতি স্বজন-প্রীতির অপবাদ দেয়।

আল্লাহর শপথ! হযরত মূসা (আঃ)-এর জমানায় আমাদের দ্বারা একটি পাপ কাজ হয়েছিল। হযরত মূসা (আঃ) আমাদেরকে তওবা করার আহবান জানালেন এবং আদেশ দিলেন তোমরা একে অন্যকে হত্যা কর। আমরা আদেশ পালন

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৮-৫৯
তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৬৩
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৭২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫ খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৩

করলাম। ফলে নিহতদের সংখ্যা দাড়ালো ৭০ হাজার। অবশেষে আমাদের প্রতিপালক আমাদের প্রতি রাযী হলেন।

হযরত সাবেত এবনে সাম্মাস এবনে কায়েস (রাঃ) বললেন, শোন! আমার সত্যতার সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহ পাক। আল্লাহর শপশ করে বলছি, যদি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে আত্মহত্যার আদেশ দেন তবে আমি অবশ্যই সে আদেশ পালন করবো।

যাহোক, আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা হলো এই, কোন ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মীমাংসায় সন্তুষ্ট চিত্তে, বিনা দ্বিধায় আত্ম সমর্পণ না করবে, সে পর্যন্ত সে প্রকৃত মোমেন হতে পারবে না। একথাই এরশাদ হয়েছে আলোচ্য আয়াতের শেষ বাক্যে। এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনার সিদ্ধান্তের পর তারা যেন সে সম্পর্কে স্বীয় অন্তরে কোন সন্দেহ পোষণ না করে এবং সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে, অসংকোচে ঐ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। তখনই কোন মানুষ প্রকৃত মোমেন হতে পারবে।

ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর তফসীরে কবীরে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেনঃ যদি লোকেরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তওবা এস্তেগফার করে এবং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের জন্যে এস্তেগফার করেন, তবে আল্লাহ পাককে তারা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান পাবে।

কিন্তু যদি কেউ আল্লাহ পাকের দরবারে এস্তেগফার করে এবং যথা নিয়মে তওবা করে তবে কি তাদের তওবা আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হবে না? যদি কবুল হয় তবে আল্লাহর রসূলের এস্তেগফারের কথা সংযোজনের তাৎপর্য কি? এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, যে ঘটনার কারণে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তাতে আল্লাহ রসূলের স্থলে মীমাংসার জন্যে শয়তানের নিকট গমন ছিল আল্লাহর হুকুমের বরখেলাফ কাজ এবং এ ঘটনাটি ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাম আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবীর শামিল, তাঁর জন্যে পীড়াদায়ক, তাই যারা এমন অন্যায় কাজ করে তাদের কর্তব্য হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হওয়া, তাঁরা দরবারে এ আরযী পেশ করা যেন তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থী হন।

দ্বিতীয়তঃ যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশে তারা সন্তুষ্ট হয়নি, তাদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশিত হয়েছে তাই তাঁর

দরবারে তাদের হাযির হওয়া এবং তাঁর তরফ থেকে এস্তেগফারের বিনীত আরযী পেশ করা ব্যতীত কোন গত্যন্তর ছিল না।

তৃতীয়তঃ হয়তো তাদের তওবা ছিল ত্রুটিপূর্ণ তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এস্তেগফারের কথা বলা হয়েছে, যাতে করে তাদের তওবা কবুল হওয়ার যোগ্য হয় (আল্লাহ পাকই সর্বাধিক জানেন)।

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে বলেছেনঃ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ (আর তাদের জন্যে আল্লাহর রসূল ক্ষমা প্রার্থনা করেন।) কিন্তু সরাসরি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেননি–

وَاسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ

অর্থাৎ- "(হে রসূল!) আপনি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলে" এতদ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্তবার বহিঃ প্রকাশ হয়েছে। অর্থাৎ তারা যাঁর দরবারে হাযির হবে তিনি এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ পাক তাঁর রেসালতের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং তাঁর ওহী প্রেরণের মাধ্যমে স্বীয় রসূলকে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাক তাঁর এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে দূত হিসেবে মনোনীত করেছেন আর যাঁর এত উচ্চ মর্যাদা তাঁর সুপারিশ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এস্তেগফারের কথা বলা হয়নি, বরং পরোক্ষভাবে তাঁর দায়িত্বের কথা এরশাদ হয়েছে।[১]

﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا
مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا
يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾ وَإِذًا لَّآتَيْنَٰهُم
مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَٰهُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾ وَمَن
يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ
النَّبِيِّۦنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَٰٓئِكَ
رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৬২

তরজমা

(৬৬) এবং যদি আমি তাদেরকে এ আদেশ দিতাম যে, তোমরা নিজেরাই নিজেদের হত্যা কর, অথবা আপন গৃহ ত্যাগ কর, তবে তাদের অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তারা এ আদেশ পালন করতো না এবং যদি তারা উপদেশ অনুযায়ী কাজ করতো তবে তাদের জন্যে অবশ্যই উত্তম হতো এবং অধিক দৃঢ়তর হতো।

(৬৭) (যদি তারা এসব কাজ করতো) তবে আমি নিজের তরফ থেকে অবশ্যই তাদেরকে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিতাম।

(৬৮) এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করতাম।

(৬৯) এবং যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের তাবেদারী করবে তারা (আখেরাতে) সে সব লোকের সাথী হবে যাদের উপর আল্লাহ্ পাক নেয়ামত দান করেছেন। যেমন- নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ, নেককারগণ এবং তারাই সর্বোত্তম সাথী।

(৭০) এটি আল্লাহ্ পাকের দান, আর জ্ঞানে আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ আয়াতও পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় মুনাফেকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এতে মুনাফেকী পরিত্যাগ করার এবং খাঁটি মুসলমান হওয়ার তাগিদ রয়েছে। আয়াতের মর্মকথা হচ্ছে এই, আল্লাহ্ পাক মুনাফেকদেরকে তাদের সাধ্যাতীত কোন আদেশ দেননি। এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহর আদেশ পালন করে না। আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে তাদেরকে এর চেয়ে কঠিন আদেশ দিতে পারতেন, সে অধিকার তাঁর আছে, তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তাদেরকে লালন-পালন করছেন, মানুষের মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত সবই আল্লাহর দান। অতএব, মানুষকে আল্লাহ্ পাক যে কোন আদেশ দিতে পারেন যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ যদি আমি তাদেরকে আদেশ দিতাম যে, তোমরা নিজেরা একে অন্যকে হত্যা কর অথবা নিজের বাড়ী-ঘর ছেড়ে চলে যাও তখন কি তারা এ আদেশ পালন করতো? কখনও না। তাদের সামান্য সংখ্যক লোক ব্যতীত কেউ এ আদেশ পালন করবে না। মুনাফেকদের অধিকাংশ লোকই আল্লাহর আদেশ অমান্য করতো। এটি আল্লাহ্ পাকের একান্ত করুণা ও দয়া যে, তিনি এমন কঠিন আদেশ দেননি। এতদসত্ত্বেও যদি সহজ স্বাভাবিক বিধান সমূহ পালন করতো তবে তাদের জন্যে হতো মঙ্গলজনক। মুনাফেকীর লা'নত থেকে তারা নাজাত লাভ করতো। তারা

প্রকৃত খাঁটি নির্ভেজাল মুসলমান হয়ে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে সফলকাম হতো।

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ

যদি আমি মুনাফেকদের প্রতি এ আদেশ দিতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর। অর্থাৎ– যারা ঈমানের দাবীদার অথচ আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে অপ্রস্তুত তাদেরকে যদি নিজেদের প্রাণ নাশের অথবা দেশ ত্যাগের আদেশ দেয়া হয় তবে মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত তারা এ আদেশ পালন করবে না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত মুনাফেকদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। কেননা, মুনাফেকদেরই এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সাহাবায়ে কেরামের নয়। যদি সাহাবায়ে কেরামকে এমন আদেশ দেয়া হতো তবে তাঁরা অবশ্যই তা পালন করতেন। আল্লাহ পাক তাঁদের প্রশংসায় বলেছেনঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"তোমরাই উত্তম দল, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণার্থেই তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দান কর এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ"। আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেছেনঃ

يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ

(সাহাবায়ে কেরাম সৎ কাজে অগ্রগামী থাকে) স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় বলেছেনঃ

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ

"সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ"। তিনি আরো এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ اِخْتَارَنِىْ وَاخْتَارَلِىْ اَصْحَابِىْ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমাকে পছন্দ করেছেন এবং আমার জন্যে সাহাবাদেরকে পছন্দ করেছেন"।

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াত মুনাফেকদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে।

اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ

তোমরা নিজেদের হত্যা কর অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশকে বাদ দিয়ে তোমরা অন্যদের নিকট বিচারের জন্যে গমন

করার মাধ্যমে যে অন্যায় করেছ তা থেকে তওবা করার উদ্দেশ্যে তোমরা একে অন্যকে হত্যা কর।

أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ

(অথবা স্বদেশ থেকে বের হয়ে যাও) যেমন বনী ইসরাঈলকে মিশর থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছিল, অথবা এর অর্থ হলো, জেহাদের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হওয়ার আদেশ বা শাহাদাতের জন্যে নিজেকে পেশ করার আদেশ যদি আমি তাদেরকে দেই তবে

مَا فَعَلُوهُ

(তারা তা করবে না।) আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে ফরজ আদায়ের আদেশ দেয়া হয়েছে তা তারা পালন করবে না, নিজেকে হত্যাও করবে না এবং বাড়ী থেকেও বের হবে না।

إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ

কিন্তু মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ পাক খাঁটি মোমেন হওয়ার তৌফিক দান করবেন, শুধু তারাই আল্লাহর আদেশ পালন করবে।

এবনে জরীর সুদ্দীর সূত্রে লিখেছেন যে, যখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় তখন সাবেত এবনে কায়েস সাম্মাসের সঙ্গে এক ইহুদীর বিতর্ক হলো। ইহুদী গর্ব করে বললোঃ আল্লাহ পাক আমাদেরকে আত্মহত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন, আমরা সে আদেশ পালনার্থে নিজেদেরকে হত্যা করেছি। তখন হযরত সাবেত বললেন যে, আল্লাহর শপথ! যদি আমাদের প্রতি আত্মহত্যার আদেশ করা হয় তবে আমরা অবশ্যই তা পালন করবো। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়–

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

"এদেরকে যা নসিহত করা হয় যদি তারা তার উপর আমল করতো তবে তাদের জন্যে তা উত্তম হতো, আর তাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করতো"।

হাসান এবং মোকাতেল বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আম্মার এবনে ইয়াসীর (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) সহ আরো কয়েকজন সাহাবায়ের কেরাম বললেনঃ যদি আমাদেরকে এমন আদেশ দেয়া হতো তবে আমরা অবশ্যই তা পালন করতাম কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের একথা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছল। তখন

তিনি এরশাদ করলেন, আমার উম্মতের কিছু লোক এমন রয়েছেন যাঁদের ঈমান এত সুদৃঢ় এবং মজবুত যা পাহাড়-পর্বতের চেয়েও দৃঢ়তর।

وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا

(আর এ অবস্থায় আমি তাদেরকে আমার তরফ থেকে দান করতাম অশেষ সওয়াব) অর্থাৎ তারা তাদের আমলের সওয়াব যা প্রাপ্ত হবে তাতো পাবেই তার চেয়ে বাড়তি অনেক কিছু বিশেষভাবে আমার তরফ থেকেও পাবে। শুধু তাই নয়, আমি তাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করবো যার ফলে তারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হবে।

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ

শানে নুযুল

তেবরানী এবং আবু নাঈম হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি আমার প্রাণ এবং সন্তান-সন্ততি সবার চেয়ে অধিকতর প্রিয়। যখন আমি বাড়ীতে থাকি এবং আপনার কথা স্মরণ হয় তখন আপনার দরবারে হাযির হয়ে দীদার হাসিল না করলে আমার মনে শান্তি আসে না। কিন্তু যখন আমার এবং আপনার মৃত্যুর কথা চিন্তা করি এবং এ সত্য উপলব্ধি করি যে, মৃত্যুর পর আর আপনার দীদার হাসিল করে ধন্য হতে পারবো না কেননা, আপনি জান্নাতের উচ্চ মর্তবায় আসীন থাকবেন এবং আমি জান্নাতে গমন করলেও আপনার নিকট হয়তো পৌঁছতে পারবো না। তখন আমার কি অবস্থা হবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে নীরবতা পালন করলেন, একটু পরেই জিব্রাঈল (আঃ) আসলেন এবং আলোচ্য আয়াত নাযিল হলো।

আয়াতের মর্মকথা

যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিধি-নিষেধ মেনে চলবে তথা ফরজ, ওয়াজিব সুন্নতের উপর আমল করবে তাদের হাশর হবে সে সব লোকের সঙ্গে যাদের প্রতি আল্লাহ পাক নেয়ামত নাযিল করেছেন যেমন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারগণ। বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, সে ব্যক্তি কোথায়? যে ইতিপূর্বে প্রশ্ন করেছিল যে, জান্নাতে আমার দেখা পাবে কি-না। তখন সে ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। তিনি এরশাদ করলেনঃ

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

অর্থাৎ দুনিয়াতে যার সঙ্গে যার মহব্বত এবং ভালবাসা থাকবে আখেরাতের তার সঙ্গেই হবে সে ব্যক্তির হাশর।

এতদ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে আশান্বিত করলেন যে, যদি তুমি আমার প্রতি মহব্বত রাখ তবে আখেরাতে আমার দেখা পাবে।

এবনে জরীর রবীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম বলেছেনঃ আমরা জানি জান্নাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মর্তবা অতি উচ্চে হবে এবং সকলের উপর তাঁর মর্তবা প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবে, তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, জান্নাতে একত্রিত হবে কিন্তু একে অন্যের সঙ্গে কিভাবে দেখা হবে? কেননা, প্রত্যেকের মর্তবা বিভিন্ন হবে। তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যারা উচ্চ মর্তবায় আসীন থাকবে তারা বেহেশতের নিম্ন এলাকায় আসবে না এবং জান্নাতের বাগানে একত্রিত হয়ে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের আলোচনা করবে এবং আল্লাহ পাকের শানে হাম্‌দ ও সানা পেশ করবে। মুসলিম, আবু দাউদ এবং নেসায়ী লিখেছেন, হযরত রাবিয়া এবনে কা'ব আসলামী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির থাকতাম এবং তাঁর অজু ও এস্তেনজার পাত্র বহন করতাম। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আমার নিকট চাও, যদি কিছু চাওয়ার থাকে। তখন আমি আরয করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! জান্নাতে আপনার নিকট থাকার আরযী পেশ করি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "এতদ্ব্যতীত আর কিছু কি চাও"? আমি আরয করলাম শুধু এটিই চাই। তখন তিনি এরশাদ করলেন, "অধিক পরিমাণে সেজদা করে তোমার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর" (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দরবারে অধিক পরিমাণে সেজদা কর যাতে করে আমি তোমাকে জান্নাতে নিকটে রাখার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করতে পারি)।

হযরত একরামা (রঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে একজন যুবক হাযির হয়ে আরয করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! দুনিয়াতে তো আপনার জেয়ারত লাভ করতে পারি কিন্তু কেয়ামতের দিন আপনার জেয়ারত আমাদের নসীবে হবে না কেননা, আপনি অতি

উচ্চ মর্তবায় থাকবেন। তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "ইনশাআল্লাহ্, তুমি জান্নাতে আমার সঙ্গেই থাকবে"।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আযাদ করা গোলাম হযরত সওবান (রাঃ) সম্পর্কে। তাঁর অন্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে অত্যন্ত মহব্বত ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দীদার ব্যতীত তিনি শান্তি পেতেন না। একদিন তিনি দরবারে নববীতে হাযির হলেন। তাঁর চেহারা ছিল বিষন্ন, দুশ্চিন্তার আলামত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, সওবান, তোমার এ অবস্থা কেন?

সওবান (রাঃ) আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার কোন দুঃখ নেই, শুধু কথা এতটুকু যে, যখন আপনার জেয়ারত লাভে ধন্য হই তখন মনে কোন শান্তি থাকে না। এ অবস্থায় আখেরাতের চিন্তা করি তখন আরো ভয় লাগে। হয়তো সেখানে আপনার দীদার হবে না কেননা, আপনি আম্বিয়ায়ে কেরামের সঙ্গে অত্যন্ত উচ্চ মর্তবায় থাকবেন। যদি আমার জান্নাতে যাওয়াও হয় তবে আমরাতো অনেক নিম্নস্তরে থাকবো এমনি অবস্থায় কি গতি হবে? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর নেয়ামত প্রাপ্ত লোকদের চারটি প্রকার বর্ণনা করেছেনঃ

(১) নবীগণ (২) সিদ্দীকগণ (৩) শহীদগণ (৪) নেককারগণ।

(১) প্রথম প্রকার তথা আম্বিয়াগণ আল্লাহ্ পাকের দ্বারা নির্ধারিত, নিদৃষ্ট। অবশিষ্ট তিন প্রকারের যে কোন প্রকারে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে আলোচ্য আয়াতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

(২) সিদ্দীকগণঃ এরা সেসব লোক যারা আম্বিয়ায়ে কেরামের পরিপূর্ণ অনুসারী হন। গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁরা আম্বিয়াগণের অনুসরণ করেন। তাঁরা সত্যের প্রতীক হন। আম্বিয়ায়ে কেরামের নূরের তাজাল্লিতে তাঁরা নিমজ্জিত থাকেন, আর এ মর্তবা আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসরণের মাধ্যমেই তারা লাভ করেন।

(৩) শহীদগণঃ এরা সেসব লোক যারা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করেন। প্রাণের বিনিময়ে আল্লাহ্ পাকের নূরের তাজাল্লির বিশেষ অংশ তারা লাভ করেন।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৭০
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৭৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫ খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৫

(৪) নেককারগণঃ অর্থাৎ সেসব লোক যারা সর্বপ্রকার মন্দ কথা এবং কাজ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র রাখেন এবং সর্বদা আল্লাহ পাকের স্মরণে মুগ্ধ থাকেন। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে বিরত থাকেন এবং পাপাচারের ময়লা থেকে স্বীয় দেহকে পবিত্র রাখেন। যখন নিজেকে আল্লাহর স্মরণে সম্পূর্ণ ফানা করে দেন এবং বকা বিল্লাহর মকামে পৌঁছেন তখন আল্লাহ পাকের নূরের তাজাল্লির কিছু অংশ তাদের প্রতি বিচ্ছুরিত হয়।

এমন পূণ্যাত্মা লোকদেরকেই আওলিয়ায়ে কেরাম বলা হয়। মোট কথা আম্বিয়ায়ে কেরাম সরাসরি আল্লাহ পাকের তাজাল্লি লাভে ধন্য হন। আর সিদ্দীকগণ নবীগণের সৌজন্যে এবং তাঁদের অনুসরণের কারণে আল্লাহ পারে নূরের তাজাল্লি লাভ করে থাকেন। তারা সর্বদা এ তাজাল্লিতে নিমজ্জিত থাকেন, আর শহীদগণকে আল্লাহ পাকের নূরের তাজাল্লির একটা বিশেষ অংশ প্রদান করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক সমস্ত মোমেনদের সঙ্গে এ অঙ্গীকার করেছেন যে, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তাবেদারী করা হলে জান্নাতে দীদার নসীব হবে। অবশ্য এ তাবেদারী যার যত বেশী হবে দীদারের সুযোগও তার তত বেশী হবে। তথা এ তাবেদারীর ভিত্তিতেই নৈকট্য এবং মর্তবার সিদ্ধান্ত হবে।

وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

অর্থাৎ-এরা অত্যন্ত ভাল বন্ধু, এদের বন্ধুত্ব এবং সান্নিধ্য অতি উত্তম, সমগ্র উম্মতের মধ্যে এ চার শ্রেণীর লোকই সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। যারা সর্বদা আল্লাহর এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকেন, যারা নিজেকে আল্লাহর রাহে বিলীন করে দেন তারা উল্লেখিত চার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন। আর আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং তাদের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হওয়া এক আল্লাহ পাকের মেহেরবানী ব্যতীত আর কিছুই নয়। যারা মুশরেক বা পৌত্তলিক তারা এ সুযোগ থেকে চির বঞ্চিত একথা সর্বজনবিদিত এবং স্বীকৃত। আর যারা প্রকৃত খাঁটি মোমেন তাদের কার কি যোগ্যতা আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে অবগত এবং যারা ভন্ড মুনাফেক তাদের যাবতীয় পরিশ্রম যে পণ্ড এবং তাদের জীবন সাধনা যে ব্যর্থ একথাও সর্বজন বিদিত। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا

অর্থাৎ- সকলের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানের ব্যাপারে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। তাঁর জ্ঞান সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ পাকের নেয়ামত প্রাপ্ত সে সব ভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কার কি কারণ তা আল্লাহ পাকই জানেন।

অথবা এ বাক্যের অর্থ এ-ও হতে পারে যে, নেয়ামত প্রাপ্ত লোকদের তাদের উচ্চ মর্তবায় আসীন হওয়া এক আল্লাহ পাকের দয়া এবং মেহেরবানীর উপরই নির্ভরশীল। আমলের কারণে নয়, বরং আল্লাহ পাকের রহমত এবং দয়ার কারণে প্রত্যেকের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন। তোমাদের আমল ঠিক রাখ। কিন্তু মনে রেখো কারো আমলের দ্বারা সে নাজাত পাবে না। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনারও না।

তিনি এরশাদ করলেনঃ না আমারও না। তবে একথা সত্য যে, আল্লাহ পাকের রহমত এবং দান আমাকে সম্পূর্ণ ঢেকে রেখেছে।[১]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ۝ وَاِنَّ
مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ
اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ۝ وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ
مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ
مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا

তরজমা

(৭১) হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্র ধারণ কর। পরে বিভিন্ন দলভুক্ত হয়ে অথবা সমবেতভাবে (জেহাদ) অভিযান কর।

(৭২) এবং তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা (জেহাদের ন্যায় কর্তব্য পালনে) অবহেলা করে। অতঃপর যদি তোমাদের উপর বিপদ উপস্থিত হয় তবে সে বলে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমার উপর নেয়ামত নাযিল করেছেন যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না।

(৭৩) আর যদি আল্লাহ তায়ালার দান তোমাদের উপর হয় (অর্থাৎ যদি আল্লাহ পাক তোমাদেরকে যুদ্ধে জয়ী করেন) তবে যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোন

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬৩-৬৬

সম্পর্ক নেই। সে বলে আহ! কি ভাল হতো যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম তবে আমি এক বিরাট সাফল্য লাভ করতে পারতাম।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর প্রিয় রসূল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের তাগিদে রয়েছে। আল্লাহ পাকের হুকুম পালন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ একান্ত কর্তব্য ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ নির্দেশ জেহাদের কথা রয়েছে। কেননা, জেহাদ অত্যন্ত কঠিন নির্দেশ।[১] এ নির্দেশ পালনের সময় প্রয়োজনে মানুষকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়।

জেহাদের জন্যে প্রস্তুত থাকার আহবান

যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি প্রেম-প্রীতি, এশ্‌ক ও মহব্বত রয়েছে তাদের জন্যে আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করা সহজ। পক্ষান্তরে যাদের অন্তর আল্লাহর মহব্বত থেকে বঞ্চিত তাদের পক্ষে আল্লাহর রাহে প্রাণ দেয়া সহজ নয়। তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে জেহাদের তাগিদ করেছেন এবং আত্মরক্ষার্থে যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, জেহাদের মাধ্যমেই দ্বীন ইসলাম শক্তিশালী হয়। আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে দুশমনের বিরুদ্ধে সদা সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা জেহাদের জন্যে অস্ত্র সংগ্রহ কর, বুদ্ধি কৌশল অবলম্বন কর। আত্মরক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা কর, ভিন্ন ভিন্ন বাহিনীতে যোগ দিয়ে বেরিয়ে পড় অথবা সবাই একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে দুশমনের বিরুদ্ধে অভিযান কর, দুশমনের মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাক।

জেহাদের নির্দেশ সম্বলিত এ আয়াত সমূহের মর্মকথা উপলব্ধি করতে হলে এর পটভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। ৩য় হিজরীতে অনুষ্ঠিত ওহোদের যুদ্ধে বিভিন্ন কারণে সাময়িকভাবে মুসলমানদের পরাজয় হয়েছিল। পরিণামে মুশরেকদের সাহস বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক, আর শুধু মক্কার কোরায়শই নয়, বরং অন্যান্য গোত্র সমূহও একত্রিত হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী তৈরীর কাজে লিপ্ত ছিল। ঠিক সে সময় আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেছেন, যাতে করে মুসলমানগণ যে কোন বিপদের মোকাবেলা করতে সক্ষম হন।[২]

এ আয়াতে শুধু যে মুসলমানদেরকে দুশমনের বিরুদ্ধে সর্বদা সজাগ, সাবধান ও সচেতন থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাই নয়, বরং মুনাফেকদের ব্যাপারেও

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৭৬
২। তফসীরে মাজেদী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২০১

সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুনাফেকরা শুধু যে নিজেরা জেহাদ থেকে বিরত থাকত তাই নয়, বরং অন্যদেরকেও জেহাদ থেকে দূরে থাকার প্ররোচনা দিত। যেমন ওহোদের যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল প্রায় তিনশ’ লোক নিয়ে রণাঙ্গন থেকে সরে পড়েছিল।

فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ

মুনাফেকদের অবস্থা এই যে, তারা জেহাদের নির্দেশ পালনে অবহেলা করে, অযথা বিলম্ব ঘটায়, অভিযানের সময় দূরে সরে থাকে। হে মোমেনগণ! জেহাদের সময় যদি তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে তখন সে খুব অহংকার করে বলে, আমার ভাগ্য কত ভাল, আল্লাহ পাক আমাকে কত নেয়ামত দিয়েছেন যে, আমি মুসলমানদের সঙ্গে রণাঙ্গণে যাইনি। এজন্যে তাদের ন্যায় বিপদগ্রস্ত হইনি।

وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ

পক্ষান্তরে, যদি মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত নাযিল হতো তথা যুদ্ধে বিজয় লাভ হতো, যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ নিয়ে তারা ফিরে আসতো তবে সে অত্যন্ত আক্ষেপ করে বলতো হায় আফসোস! আমি যদি তাদের সঙ্গে এ যুদ্ধে থাকতাম, তবে বিরাট সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হতাম তথা যুদ্ধ লব্ধ সম্পদের অংশীদার হতাম।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এতদ্বারা দুটি কথা প্রমাণিত হয় (১) মুনাফেকদের মূল লক্ষ্য হলো পার্থিব জীবনের হীন স্বার্থ হাসিল করা। (২) মুসলমানগণ যখন বিজয় লাভ করতেন তখন মুনাফেকদের অন্তরে হিংসা এবং পরশ্রীকাতরতা সৃষ্টি হতো। অথচ মুসলমানদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ। মুসলমান যখন স্বাভাবিক জীবন যাপন করে, ব্যবসা-বাণিজ্য করে অথবা রণাঙ্গণে প্রাণ পন যুদ্ধ করে, সকল অবস্থায় এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই করে। তাই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

“(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার সকল এবাদত, আমার জীবন, জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এমনকি আমার মরণ পর্যন্ত এক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে”।

একবার হযরত আলী (রাঃ) এক দুশমনের সঙ্গে যুদ্ধ রত ছিলেন। দুশমন তাঁকে বধ করতে চায়, আর তিনিও তাকে শেষ করতে চান। তাই উভয়ের সর্বশক্তি নিয়োজিত হলো এ মোকাবেলায়। অবশেষে হযরত আলী (রাঃ) তাঁর এ দুশমনকে পরাভূত করলেন এবং তার বুকের উপর বসে গেলেন। ঠিক এমন সময় ধরাশায়ী

অবস্থায় সে হযরত আলী (রাঃ)-এর মুখে থু-থু দিল। হযরত আলী (রাঃ) তাকে ছেড়ে দিলেন। সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি এতক্ষণ পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে লড়াই করলেন অথচ আমাকে ধরাশায়ী করার পর ছেড়ে দিচ্ছেন এর কারণ কি? তখন হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমি তোমার সঙ্গে লড়াই করছিলাম এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু যখন তুমি আমার মুখমণ্ডলে থু-থু দিয়েছ তখন তোমার প্রতি আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ এসে গেছে। আর এমন অবস্থায় যদি আমি তোমাকে বধ করতাম তবে এ কাজের জন্যে আখেরাতে আমি সওয়াব পেতাম না তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হতো না। তাই আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি।

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মুনাফেকদের সাফল্য হলো এ পার্থিব জীবনের অর্থ সম্পদ লাভে। তাই আলোচ্য আয়াতের এ বাক্যে তাদের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছেঃ

فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا

(অর্থাৎ যদি আমি এ যুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্গে থাকতাম তবে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ লাভের মাধ্যমে বিরাট সাফল্য অর্জন করতাম) পক্ষান্তরে মুসলমানদের সাফল্যের কথাও পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন এভাবে-

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ط لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

"যারা প্রকৃত মোমেন এবং পরহেযগার তাদের জন্যে খোশ খবরী রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে। আল্লাহ্ পাকের কথায় কোন পরিবর্তন নেই, আর এটিই হলো বিরাট সাফল্য"।

﴿٧٣﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ
يَشْرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾ وَمَا لَكُمْ لَا
تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ
أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۙ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

তরজমা

(৭৪) যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তাদের কর্তব্য হলো আল্লাহর রাহে জেহাদ করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের রাহে জেহাদ করবে সে শহীদ হোক বা জয়ী হোক আমি তাকে মহা পুরস্কার দান করবো।

(৭৫) এবং তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর রাহে জেহাদ কর না? এবং পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা দুর্বল তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এ জনপদ যার অধিবাসী অত্যাচারী তা থেকে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও, তোমার তরফ থেকে আমাদের জন্যে কোন লোককে আমাদের অভিভাবক কর, এবং তোমার নিকট থেকে আমাদের জন্যে কোন সহায়ক প্রেরণ কর।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে যারা জেহাদে অবহেলা করে তাদের সমালোচনা রয়েছে আর এ আয়াতে আল্লাহর রাহে জেহাদের জন্যে অনুপ্রেরণা রয়েছে।

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, মুনাফেকরা জেহাদ থেকে বিরত থাকুক বা যা খুশী তাই করুক কিন্তু হে মোমেনগণ! তোমরা যারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের বিনিময়ে আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীকে ক্রয় করেছ, তোমরা আল্লাহর রাহে জেহাদ কর। দুদিনের এ জিন্দেগীর লোভ-লাভ, স্বার্থ ও পার্থিব ভোগ-বিলাসকে আদৌ গুরুত্ব দিও না। কেননা, আল্লাহ্ পাকের রাহে জেহাদের শুভ পরিণতি সকল অবস্থায়ই সুনিশ্চিত। যদি জেহাদে বিজয় লাভ হয় তবে তো কথাই নেই, আর তাই কাম্য। কিন্তু যদি কোন কারণে পরাজয়ও হয় তবুও তা বিজয়েরই নামান্তর। কেননা, জেহাদের মূল উদ্দেশ্যে হলো আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভ আর তা জয় পরাজয় উভয় অবস্থাতেই অর্জিত হয়। জেহাদে নিজের জীবন দিতে হয় তথা শাহাদাতের উচ্চ মর্তবা লাভ হয়, অথবা দুশমনের জীবন নিয়ে বিজয়ী হতে হয়। উভয় অবস্থায় আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অনন্ত অসীম সওয়াব প্রদান করা হয়। বিজয় লাভ হলে বিজয়ের আনন্দ গনিমত বা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু সওয়াব এতটুকুও কমে না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জেহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, আর শুধু আল্লাহর পাকের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরের প্রতি ঈমানী শক্তিতে জেহাদে অংশ গ্রহণের জন্যে অনুপ্রাণিত হয় (পার্থিব কোন উদ্দেশ্য থাকে না) আল্লাহ্ পাক এমন ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সওয়াব এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদসহ তাকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয়া হয় অথবা শাহাদাতের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আরও একখানি হাদীস রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহর রাহের মুজাহেদের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন রোজাব্রত পালনকারী এবং রাতে এবাদতকারীর ন্যায়। সে দিনে রোজার কারণে ক্লান্তি বোধ করে না এবং রাতে নামাজেও সে অবহেলা করে না। আলোচ্য আয়াতে يَشْرُوْنَ শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে অর্থাৎ ক্রয় করা এবং বিক্রয় করা। এজন্যে কোন কোন তফসীরকার এর অন্য অর্থও বর্ণনা করেছেন। ইতিপূর্বে আমরা যা বর্ণনা করেছি তাহলো, যারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে বিক্রয় করে দিয়েছে, তথা যারা প্রকৃত মোমেন তাদের আল্লাহর রাহে জেহাদ করা কর্তব্য। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, আলোচ্য আয়াতের 'ইয়াশরুনা" শব্দটি তখন "ইয়াশতারুনা" অর্থে ব্যবহৃত হবে

অর্থাৎ যারা আখেরাতের জিন্দেগীর বিনিময়ে দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে পছন্দ করে বা মুনাফেক দল। তাদের কর্তব্য হলো পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং মুনাফেকী পরিত্যাগ করা। আর আল্লাহর রাহে জেহাদ করা, যাতে করে দুনিয়া আখেরাতে উভয় জাহানে তাদেরকে আক্ষেপ না করতে হয়। তফসীরকারদের মধ্যে যারা প্রথমোক্ত অর্থ বর্ণনা করেছেন তারা বলেছেন, আয়াতখানি মোমেনদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, আর যারা শেষোক্ত অর্থ বর্ণনা করেছেন তারা বলেছেন, এ আয়াত মুনাফেকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। যেহেতু 'ইয়াশরুনা' শব্দটির আভিধাণিক অর্থ উভয় প্রকার তাই উভয় অর্থই বিশুদ্ধ। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এবং আল্লামা আবুদল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) এ আয়াতের দু'টি অর্থই বর্ণনা করেছেন।[১]

অবশ্য ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের উভয় অর্থ বর্ণনা করার পর আরো কিছু কথা বলেছেনঃ

১. মানুষ যখন নিজের এ জীবনকে আল্লাহর রাহে বিলীন করার ইচ্ছা করে তখন তার নফস বা প্রবৃত্তি তাতে কার্পণ্য করতে চায়। ঐ অবস্থায় সে আখেরাতের অসামান্য নেয়ামত লাভের আশায় নিজের নফ্স বা প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে ক্রয় করে যাতে করে স্বীয় জীবনকে আল্লাহর রাহে অকুণ্ঠচিত্তে বিলীন করতে পারে।

২. আল্লাহ পাক জেহাদের আদেশ দিয়েছেন, যে এ আদেশকে অবহেলা করবে তা দুনিয়ার এ জীবনের মায়ার কারণেই করবে। পরিণামে সে আখেরাতের সাফল্য থেকে বঞ্চিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ তুমি আল্লাহর রাহে জেহাদ কর এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনের লাভকে চিরস্থায়ী জীবনের ওপর প্রধান্য দিও না।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুদীর্ঘ ১৩টি বছর মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু পৌত্তলিকরা তাঁর প্রতি এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রতি শুধু অত্যাচার উৎপীড়নই করেছে। অবশেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে মক্কা শরীফ থেকে অত্যাচারিত উৎপীড়িত অবস্থায় মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করতে হয়েছে। তাঁর সান্নিধ্য লাভের আশায় সমবেত হয়েছিলেন সারা আরব থেকে বহু নির্যাতিত মুসলমান। পৌত্তলিকরা তাঁদের বাড়ী-ঘর, স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পদ দখল করে নেয়। শুধু তাই নয়, বরং যেসব মুসলমান মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় রয়ে গেলেন তাদেরকে অসহায় নিরুপায় অবস্থায় পেয়ে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬৮
তফসীরে মাজেদী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২০১
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৮১

তাদের প্রতি নির্যাতন-উৎপীড়ন দ্বিগুণ করে দেয়। ফলে মুসলমান নর-নারী-শিশু–কাফেরদের অত্যাচারে তাদের সকলের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তারা আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করলেন, "হে আল্লাহ! এ জালেমদের এলাকা থেকে আমাদের বের হওয়ার তৌফিক দান কর। এবং আমরা অসহায় অবস্থায় রয়েছি। আমাদের জন্যে কোন অভিভাবক বা বন্ধু এবং সাহায্যকারী প্রেরণ কর"।

আলোচ্য আয়াতে মক্কার সেই মজলুম মুসলমানদের কথা আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন এবং জালেমদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে জেহাদে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে অনুপ্রাণিত করেছেন। মানবতার দুশমনরা সকল যুগেই মানুষের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করেছে। বিপন্ন মানবতাকে রক্ষা করার জন্যে, অসহায় নিরুপায় মানুষকে আত্মরক্ষার সুযোগ দেয়ার জন্যে, মানবতার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে এবং বিশ্ব শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইসলামে জেহাদ নীতির অবদান অতুলনীয়, দুষ্টের দমনে শিষ্টের লালনে ও অন্যায় অবিচার অনাচারের পথ বন্ধ করতে জেহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِىْ سَبِيلِ اللّٰهِ

আর তোমাদের কি হলো তোমরা আল্লাহর রাহে কেন জেহাদ কর না? কেন মজলুম ও দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণে, জালেমের জুলুম অত্যাচার বন্ধ করার লক্ষ্যে তোমরা অগ্রসর হও না? মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় যে অসহায় নিরুপায় মুসলমানগণ নির্যাতিত অবস্থায় রয়েছে তাদেরকে দূরাত্মা কাফেরদের জুলুম থেকে রক্ষা করা তোমাদের কর্তব্য। যারা আল্লাহ্ পাকের দরবারে সর্বদা হেফাজতের জন্যে দোয়া করছেন এবং মজলুম মুসলমানদেরকে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে রক্ষা করেছেন।

মক্কা বিজয়ের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত এতাব এবনে ওসায়েদরকে মক্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন মজলুমের সাহায্যকারী এবং সুবিচারক।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি এবং আমার মাতাও মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অসহায় লোকদের মধ্যে ছিলাম।

আমালুল কোরআন

যদি কোন ব্যক্তি কোন জালেমের হাতে গ্রেফতার হয় এবং তার মুক্তি লাভ কঠিন হয় তবে নিম্নোক্ত আয়াত অধিক পরিমাণে পাঠ করলে আল্লাহ্ পাক এর বরকতে তার আশু মুক্তির তওফিক দান করেন, আয়াত খানি হলোঃ

رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ
وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا (সূরা নেছা)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ
كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا
اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ
اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ
وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ
قَرِيْبٍ ؕ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۫ وَ
لَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا

তরজমা

(৭৬) যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করে আর যারা কাফের তারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে। অতএব, তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও। নিশ্চয় শয়তানের প্রচেষ্টা দুর্বল।

(৭৭) (হে রসূল!) আপনি কি তাদের কথা জানেন না যাদেরকে বলা হয়েছিল তোমাদের হাত সংযত রাখ। নামাজ ঠিক রাখ ও যাকাত আদায় করতে থাক। তবে যখন তাদের উপর জেহাদ ফরজ হলো তখন একদল আল্লাহ তায়ালাকে যেমন ভয় করে তেমন অথবা তার চেয়ে অধিক মানুষকে ভয় করতে থাকল এবং তারা বলতে লাগল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর জেহাদ কেন ফরজ করলে? কিছুদিন আমাদেরকে অব্যাহতি দিলে না কেন? (হে রসূল!) আপনি (তাদেরকে) বলে

দিন যে, পার্থিব জীবনের সম্পদ অতি তুচ্ছ, আর পরহেযগারদের জন্যে আখেরাতই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে জেহাদ অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে, আর এ আয়াতে জেহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পথ নির্দেশনা রয়েছে।

জেহাদের উদ্দেশ্যঃ যারা মোমেন তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের জন্যে, আল্লাহ্ পাকের নাম বুলন্দ করার জন্যে তথা শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে শয়তানের প্রতি তাদের আনুগত্যের কারণে। আর এ আয়াতে একথার প্রমাণ রয়েছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লড়াই করে না তারা শয়তানের পথে লড়াই করে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ যারা ঈমানদার, প্রকৃত মোমেন তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের শত্রুদের বিরুদ্ধে মানবতার দুশমনদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে, রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যারা মুসলমানদের শত্রু তথা মানবতার শত্রু তারা লড়ে শয়তানের পথে। অতএব, হে মোমেনগণ! তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। তাদের ষড়যন্ত্র বান্চাল কর, তাদের জুলুম অত্যাচার থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষা কর। মানবতার দুশমনদের পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন কর। আর মনে রেখো জেহাদের আদেশ পালনে তোমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণই নেই। কেননা, মুসলমানদের জেহাদ শুধু আল্লাহর পথে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। অথচ কাফেরদের যুদ্ধ হলো শয়তানের পথে। যারা আল্লাহর অনুগত কাফেরদের সঙ্গে তাদের লড়াই অনিবার্য। আর একথাও মনে রেখো শয়তানের চাল বা চক্রান্ত খুবই দুর্বল। অতএব, শয়তানের বন্ধুদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ কর। শয়তান মানুষকে প্রতারণা করে। যেমন বদরের জেহাদের দিন শয়তান কাফেরদেরকে বলেছিল, আমি তোমাদের পেছনে আছি। আজ কেউ তোমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না, কিন্তু শয়তান ফেরেশতাদের দলকে রণাঙ্গনে দেখা মাত্র পলায়ন করে। আর তার অনুসারীদেরকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে চলে যায় এবং বলে, আমার সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমি এমন কিছু দেখেছি যা তোমরা দেখছো না। আমি আল্লাহকে ভয় করি। আর আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন, "শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল"। কেননা, আল্লাহ্ পাক সাহায্য করেন তাঁর বন্ধুদেরকে আর শয়তান সাহায্য করে তার বন্ধুদেরকে আর একথা ধ্রুব সত্য

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬৯-৭০

যে, শয়তান তার বন্ধুদেরকে যে সাহায্য করে তা আল্লাহর বন্ধুদের জন্যে আল্লাহর সাহায্য থেকে অত্যন্ত দুর্বল। যারা পৃথিবীতে আল্লাহর প্রেমে মুগ্ধ মত্ত মাতোয়ারা হয়, যারা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করে তারা অমরত্ব লাভ করে। তারা হয়তো জীবদ্দশায় অভাব-অভিযোগের মধ্যে দিন গুজরান করে কিন্তু সকল যুগে সকল দেশে চির স্মরণীয় হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, যারা শয়তানের পথে চলে দুনিয়াতে অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হয় তাদের নাম পৃথিবী থেকে মুছে যায়। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ

শানে নুযুল

নেসায়ী এবং হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলন করেছেন যে, হিজরতের পূর্বে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফে ছিলেন তখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাযিঃ), হযরত মেকদাদ এবনে আসওয়াদ (রাযিঃ), হযরত কোদামা এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা যখন মুশরেক অবস্থায় ছিলাম তখন অত্যন্ত সম্মানিত ছিলাম কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর আমরা অপমানিত অত্যাচারিত উৎপীড়িত হচ্ছি। আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরা কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করি। কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আমাকে এখনও জেহাদের অনুমতি দেয়া হয়নি। তোমরা নিজেদেরকে সংযত রাখ, কাফেরদের সঙ্গে এ মুহূর্তে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়োনা। এখন তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় করতে থাক এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে সব আদেশ আসে তা পালন করতে থাক। আত্মশুদ্ধি লাভে আত্মোন্নতি অর্জনে আত্মপ্রত্যয় গ্রহণে আত্মশক্তি অর্জনে সচেষ্ট থাক। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি? যাদেরকে বলা হয়েছিল তোমরা কাফেরদের মোকাবেলায় নিজেকে সংযত রাখ, চরম জুলুম অত্যাচারের ক্ষেত্রেও সবর অবলম্বন কর। ধৈর্য ধারণ কর।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

এবং নামাজ কায়েম কর, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি যে হক্ব বা কর্তব্য রয়েছে তা সঠিকভাবে পালন কর। আর যাকাত আদায় করতে থাক এবং তোমাদের প্রতি বন্দার যে হক্ব রয়েছে তা আদায় কর। এক কথায় আল্লাহ পাকের

হুকুম পালনে সুদৃঢ় হও, আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করতে এবং ধন সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত হও। যেভাবে মানুষের বাহুবল না থাকলে তার পক্ষে অস্ত্র ধারণ করা সম্ভব হয় না ঠিক তেমনি ঈমানী শক্তি তথা মনোবল না থাকলে অস্ত্র বল বাহুবল কোন কিছুই উপকারে আসেনা। একথা সর্বজন-বিদিত, নিজের রিপুকে যে কাবু করতে পেরেছে, যে নিজের প্রবৃত্তিকে পরাজিত করতে পেরেছে সে আত্মশক্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। আর আত্মশক্তি অর্জনের প্রথম স্তর হলো আত্মসংযম। যা নামাজ এবং যাকাতের মাধ্যমে অর্জিত হয়। তাই মক্কায়ে মোয়াজ্জমার জীবনে মুসলমানদেরকে আত্মসংশোধন, ব্যক্তি চরিত্র গঠন এবং আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করলেন তখন জেহাদ ফরজ করা হলো। জেহাদের বিধান প্রবর্তন করার পর কিছু লোকের নিকট তা কঠিন মনে হলো। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ

অর্থাৎ যখন তাদের প্রতি জেহাদ ফরজ করা হলো তখন তাদের একদল লোক মানুষকে এমনভাবে ভয় করতে লাগল যেন আল্লাহর ভয় অথবা তার চেয়েও বেশী। কাফেরদের সঙ্গে জেহাদকে তারা ভয় করতে শুরু করলো। যেখানে জেহাদের জন্যে আগ্রহ হওয়া উচিত সেখানে আক্ষেপ করে তারা বললো, হায়! আরো কিছুদিন কেন অব্যাহতি পেলাম না? জেহাদের চিন্তা করে কিছু লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। রণাঙ্গনে নিহত হওয়ার, স্ত্রী বিধবা হওয়ার, সন্তান-সন্ততি এতিম হওয়ার দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে লাগলো। আর ঐ অবস্থায়ই তারা বলতে লাগলো যে, আরো কিছুদিন দুনিয়াতে অবকাশ পেলে কত ভাল হতো! এসব কথার জবাবে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى

যেহেতু এ ক্ষণস্থায়ী জগতের এবং ক্ষণভঙ্গুর জীবনের প্রতি অহেতুক আসক্তিই তাদের জেহাদ ভীতির মূল কারণ। তাই (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন যে, আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর তুলনায় এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের স্বার্থ, এখানকার আরাম-আয়েশ এবং আনন্দ অত্যন্ত নগণ্য, নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর। দুনিয়ার এ জিন্দেগী ক্ষণিকের ব্যাপার মাত্র। অতএব, আখেরাতের তুলনায় এ ক্ষণস্থায়ী জীবন ও স্বার্থকে তোমরা আদৌ গুরুত্ব দিও না। কেননা যারা পরহেযগার, যারা আল্লাহকে ভয় করে, যারা আখেরাতের কথা চিন্তা করে সতর্ক এবং সাবধান হয়ে জীবন যাপন করে

তাদের জন্যে আখেরাতের জীবন অতি উত্তম। এর কয়েকটি কারণ আছেঃ

১. দুনিয়ার নেয়ামত সামান্য এবং সীমিত অথচ আখেরাতের নেয়ামত অনেক এবং অনন্ত অসীম।

২. দুনিয়ার নেয়ামত ক্ষণস্থায়ী, কয়েক দিন পরই শেষ হয়ে যায় অথচ আখেরাতের নেয়ামত চিরস্থায়ী।

৩. দুনিয়ার নেয়ামতের সঙ্গে থাকে বহু অশান্তি, অনেক দুশ্চিন্তা, এখানকার প্রতিটি দিন কন্টকাকীর্ণ অথচ আখেরাতের জীবন নিষ্কন্টক, নিঃশঙ্ক, সকল বিপদাপদ থেকে মুক্ত।

৪. দুনিয়ার নেয়ামত সন্দেহযুক্ত নয়, আর যার কাছে সবচেয়ে বেশী নেয়ামত আছে সে-ও একথা জানে না যে, কাল তার কি অবস্থা হবে, আর আখেরাতের নেয়ামত সুনিশ্চিত, ভবিষ্যত সুনির্ধারিত। অতএব, আখেরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবন হীন, তুচ্ছ। অবশ্য আখেরাতের এ নেয়ামত সমূহ তারাই লাভ করবে যারা পরহেযগারী অবলম্বন করে, যারা পাপাচার পরিহার করে, যারা সত্যকে গ্রহণ করে এবং যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শকে বরণ করে।[১] এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

الدنيا سجن المؤمن وجنة للكافر

দুনিয়া হলো মোমেনের জন্যে কারাগার এবং কাফেরের জন্যে বাগান। কারাগারে শত সুখ-সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও সেখানে কারো মন টেকে না ঠিক তেমনি যারা প্রকৃত মোমেন যারা আল্লাহ পাকের ভক্ত প্রেমিক তাদের মন দুনিয়াতে টেকে না। তারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে প্রয়াসী হয়।

وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا

অর্থাৎ– কারো প্রতি সামান্যতম জুলুম করা হবে না। তোমাদের বিন্দুমাত্র হক্বও বিনষ্ট হবে না, বরং প্রত্যেককে তার নেক আমলের পূর্ণ সওয়াব প্রদান করা হবে। এতটুকু কম করা হবে না। এমনকি তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না তথা তাদের সওয়াব বিনষ্ট হবে না। অতএব, আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক আল্লাহর রাহে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়াই প্রকৃত মোমেনের কর্তব্য। অথবা এ বাক্যটির অর্থ হলো, তোমাদের যার বয়স যতদিন নিদৃষ্ট আছে জেহাদের কারণে তাতে এতটুকু কম করা হবে না।[২]

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৮৬
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৭৩

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ
فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ
كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
حَدِيثًا ۝ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ
سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
شَهِيدًا ۝

তরজমা

(৭৮) তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে অবশ্যই পাবে যদিও তোমরা সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে থাক। আর যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ নাযিল হয় তখন তারা বলে, এতো আল্লাহর তরফ থেকে এবং যদি কোন কিছু অকল্যাণকর হয়, তবে তারা বলে এতো তোমার তরফ থেকে। (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, সব কিছুই আল্লাহর তরফ থেকে। তবে এ জাতির কি হলো যে, তারা কথা বোঝার নিকটবর্তীও হয়না।

(৭৯) যা কিছু তোমার জন্যে কল্যাণকর হয় তা আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই হয় এবং যা কিছু অমঙ্গলজনক হয় তা তোমারই কারণে হয়। (হে রসূল!) আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি এবং সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

মুনাফেকরা ওহোদের যুদ্ধের শহীদগণ সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছিল, যেভাবে আমরা রণাঙ্গণ থেকে পালিয়ে এসেছি তারাও যদি সেভাবে আমাদের সঙ্গে চলে

আসতো তবে মৃত্যুমুখে পতিত হতো না। তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন এবং সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, তোমরা যত সুরক্ষিত ইমারতে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা কর না কেন মৃত্যু তোমাদের অবশ্যম্ভাবী। এ পৃথিবীতে যার আগমন হয়েছে তাকে এখান থেকে গমন করতেই হবে। কেননা পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়, বরং ক্ষণস্থায়ী। একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্তই মানুষকে পৃথিবীতে অবস্থানের অনুমতি দেয়া হয়েছে পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ

"আর তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে এক নিদৃষ্ট কাল পর্যন্ত অবস্থিতি ও ভোগের সম্পদ রয়েছে"। এছাড়া পবিত্র কোরআনে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۞ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ

অর্থাৎ- এ বিশ্বে যা কিছু আছে সবই নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার প্রতিপালকের সত্ত্বা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব। পবিত্র কোরআনে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

(প্রাণী মাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।) আরো এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ

"(হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর রয়েছ সে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করবে। অতঃপর তোমাদেরকে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির করা হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত। তিনি তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করবেন"।

অতএব, একথা চির নির্ধারিত যে, জন্ম গ্রহণ করলে মরতেই হবে। জীবন এমন এক বস্তু যাকে ধরে রাখা যায় না। মৃত্যু এমন এক বিষয় যাকে প্রতিরোধ করা যায় না। কোন প্রকার তদ্বির বা কৌশল মৃত্যুর মোকাবেলায় কার্যকর হয় না। লৌহ নির্মিত দুর্গে আত্মরক্ষার চেষ্টা এখানে ব্যর্থ হয়। মানুষ যেখানেই থাকে সময় হলে মৃত্যুর অলজ্ঘনীয় বিধান তার উপর সেখানেই কার্যকর হয়। রণক্ষেত্রেও হতে পারে, গৃহ শয্যায়ও হতে পারে। মারণাস্ত্রের আঘাতেও হতে পারে, রোগের আক্রমণেও হতে পারে। যখন একথাই সত্য তবে কাপুরুষের মত মৃত্যু বরণের চেয়ে বীর পুরুষের ন্যায় মৃত্যু বরণই শ্রেয়।

পূর্ববর্তী আয়াতে যাদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছিল যে, মৃত্যু ভয়ে তারা জেহাদে গমনকে কঠিন মনে করেছিল তাদের জন্যে এ আয়াতে রয়েছে সঠিক পথ নির্দেশনা

এ মর্মে যে, যদি মৃত্যুর সময় না আসে জেহাদে গমন করলেও মৃত্যু হবে না। আর যদি মৃত্যুর সময় আসে তখন বাড়ীতে থাকলেও মৃত্যু আসবে। এজন্যেই বিখ্যাত সাহাবী হযরত খালেদ এবনে ওয়ালীদ (রাযিঃ) তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বলেছিলেন, "তোমরা দেখ, আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্ষতচিহ্ন দেখতে পাবে। কোথাও বর্শার, কোথাও তরবারীর আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান, কিন্তু রণাঙ্গনে আমার মৃত্যু লিপিবদ্ধ ছিল না বলে আমি আজ শয্যাশায়ী হয়ে মৃত্যু বরণ করছি। যারা মৃত্যুর ভয়ে জেহাদ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতা তারা যেন আমার জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে"।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যা এবনে জরীর এবং এবনে আবি হাতেম বিখ্যাত মুফাচ্ছের হযরত মুজাহেদ (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। পূর্বকালে একজন মহিলা অন্তসত্ত্বা হয়েছিল। নিয়মিতভাবে যখন তার প্রসব বেদনা উঠলো তখন তার একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলো। সে তার চাকরকে বললো তুমি কোথাও থেকে একটু আগুন নিয়ে আস। সে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয়ে দেখলো একজন আগন্তুক সে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। ঐ ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করলো কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে না পুত্র? চাকরটি জবাব দিল কন্যা। তখন ঐ আগন্তুক বললো, শোন! এ মেয়েটি ১০০ লোকের সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হবে। এরপর তার এখানে এখন যে চাকর আছে তার সাথে তার বিয়ে হবে। অবশেষে একটি মাকড়সা তার মৃত্যুর কারণ হবে। তখন ঐ চাকরটি ঘরে ফিরে আসলো এবং একটি তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে ঐ নবজাত মেয়েটির উদর চিরে ফেললো। আর তাকে মৃত ভেবে সেখান থেকে পলায়ন করলো। মেয়েটির মাতা এ অবস্থা দেখে তার চিকিৎসা করলো। ফলে তার ক্ষত ভাল হয়ে গেল। এরপর এক যুগ পার হলো, ঐ মেয়েটিও এখন বয়ঃ প্রাপ্ত হয়েছে, সে অত্যন্ত সুন্দরী ছিল কিন্তু পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এদিকে ঐ চাকরটি সমুদ্র পথে বিদেশে চলে যায়। বহু দিন সে বিদেশে থেকে অনেক অর্থ-সম্পদ সহ দেশে ফিরে আসে এবং একজন বৃদ্ধাকে ডেকে বললো, আমি বিয়ে করতে চাই। যদি কোন সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যায় তবে আমার বিয়ের ব্যবস্থা কর। অবশেষে ঐ মেয়েটির সঙ্গেই এ ব্যক্তির বিয়ে হলো। এভাবে তাদের সংসার জীবন শুরু হলো। একদিন কথায় কথায় ঐ স্ত্রীলোকটি তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনিতো এখানে অল্প কিছু দিন হয় এসেছেন। আপনি কোথা থেকে এসেছেন এবং আপনার পরিচয় কি? তখন লোকটি বললোঃ আমি এখানে একজন স্ত্রীলোকের চাকর ছিলাম। তার একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। আমি নবজাত শিশুটিকে হত্যা

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫ খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৬০

করে এখান থেকে পলায়ন করেছিলাম। তখন সে মেয়েটি বললো, তুমি যার পেট কেটে চলে গিয়েছ আমিই সে মেয়ে। এরপর সে তার ক্ষত চিহ্ন দেখিয়ে দিল।

তখন সে বুঝতে পারলো এটিই সেই মেয়ে এবং বললো, যখন তুমি ঐ মেয়েই তাহলে তোমার সম্পর্কে আমি আরেকটি কথাও জানি যে, ইতিপূর্বে তুমি ১০০ জন লোকের সঙ্গে মন্দ কাজ করেছ। মেয়েটি বললো তুমি ঠিকই বলেছ তবে সংখ্যা ঠিক আমার মনে নেই। লোকটি বললো, তোমার সম্পর্কে আমি আরও একটি কথা জানি. তাহলো তোমার মৃত্যুর কারণ হবে একটি মাকড়সা। যাহোক যেহেতু তোমার সঙ্গে আমার অতি ভালবাসা তাই আমি তোমার জন্যে একটি সুরক্ষিত উঁচু ইমারত নির্মাণ করে দিচ্ছি। তুমি তাতে বাস কর। কোন কীট-পতঙ্গ তাতে আসতে দিও না। একদিন তারা স্বামী স্ত্রী উভয়ে বসে আছে। এমন সময় দেখলো বাড়ীর ছাদে একটি মাকড়সা রয়েছে। তখন ঐ ব্যক্তি বললো দেখো, এ ঘরের ছাদে একটি মাকড়শা দেখা যাচ্ছে। তখন স্ত্রী বললো এ মাকড়সাই কি আমার প্রাণ কেড়ে নেবে? তাহলে তার পূর্বেই আমি তাকে শেষ করে দেই। এরপর সে তার লোকজনকে হুকুম দিল ঐ মাকড়শাটিকে জীবিত অবস্থায় আমার নিকট ধরে আন। চাকররা তাকে ধরে নিয়ে আসলো এবং তাকে সে পদদলিত করলো এবং ঐ মাকড়সার শরীর থেকে এক প্রকার রস বের হলো যার আধ ফোটা তার আঙ্গুলে পড়লো, ফলে তার চেহারা বিষাক্ত হলো এবং বর্ণ কালো হয়ে গেল। এভাবে তার মৃত্যু হলো।[১]

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর স্থান এবং সময় নিদৃষ্ট। সে সময় হলে প্রত্যেককেই মৃত্যু মুখে পতিত হবে, একথা চির নিশ্চিত।

وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

শানে নুযুল

যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা মোনাওয়্যারায় আগমন করেন তখন দূরাত্মা ইহুদী এবং মুনাফেকরা বললো, যখন থেকে এ ব্যক্তি (হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদের এখানে এসেছেন তখন থেকে আমাদের ক্ষেত খামারে এবং ফুল-ফলারিতে শুধু ক্ষতিই হচ্ছে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, যদি এদের কোন প্রকার কল্যাণ লাভ হয় তবে তারা বলে এতো আমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ মেহেরবানী। পক্ষান্তরে যখন তাদের কোন বিপদ হয় তখন তারা বলে, এ অবস্থাতো শুধু তোমার

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৬১

কারণে। বস্তুতঃ মুনাফেকদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। যদি মুসলমানদের জয়লাভ হতো তবে বলতো এ-তো আমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানী। যখন এর বিপরীত অবস্থা হতো তখন বলতো (নাউযুবিল্লাহ মিন জালেক) "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই দুগর্তির মূল, তাঁর অদূরদর্শিতার কারণে এমন অঘটন ঘটেছে"।

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, ভাল-মন্দ সবকিছুই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অর্থাৎ আল্লাহ পাক নিজের ইচ্ছায় কারো জন্যে কল্যাণ এবং কারো প্রতি প্রতিশোধ স্বরূপ অকল্যাণ সৃষ্টি করেছেন। অতএব, ভাল-মন্দ সবকিছুরই অধিপতি একমাত্র আল্লাহ পাক, এতে মানুষের কোন অধিকার নেই। মানুষের ক্ষয়-ক্ষতি, দুর্গতি অকারণে নয়, এর মধ্যে রয়েছে বিরাট রহস্য এবং হেকমত, এতে রয়েছে তোমাদের শিক্ষা এবং পরীক্ষা।

فَمَالِ هٰؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا

এ সম্প্রদায়ের কি হলো? যে, তারা কথা বোঝে না, বুঝতেও চায় না এমনকি এর কাছেও আসে না। কেননা, যদি তারা কোরআনে করীমের মহান শিক্ষার উপর চিন্তা করতো তাহলে এ সত্য উপলব্ধি করতে বিলম্ব হতো না যে, সব কিছুই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হয়। আর একজনের আমলের জন্যে অন্যজনকে শাস্তি দেয়া হয়না।

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ

(তোমার নিকট যে কল্যাণ পৌঁছে তা শুধু আল্লাহ পাকের তরফ থেকে।)

এ আয়াতে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, মানুষ পৃথিবীতে যা কিছু কল্যাণ লাভ করে তা শুধু আল্লাহ পাকের করুণা স্বরূপ, এতে মানুষের যোগ্যতা বা দাবীর কোন প্রশ্নই উত্থিত হয় না। আর মানুষকে কল্যাণ দান করা আল্লাহ পাকের উপর কোন কর্তব্য নয়। কেননা, মানুষ যে আল্লাহর বান্দা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশই তার কাজ, যদি কেউ সারা জীবন আল্লাহর অনুগত থাকে, কোন প্রকার পাপ কার্যে সে শরীক না হয় এবং সর্বদা শুধু আল্লাহর বন্দেগীতেই মশগুল থাকে এতদসত্ত্বেও মানুষের কোন দাবী থাকতে পারে না। কেননা, স্বয়ং মানুষের অস্তিত্বই আল্লাহ পাকের নেয়ামত, আর সৎ কাজের তৌফিক পাওয়া আল্লাহ পাকের আরো একটি নেয়ামত। অতএব, সবকিছু আল্লাহ পাকের নেয়ামত ব্যতীত

আর কিছুই নয়। এমন অবস্থায় নেক আমলের জন্যে আখেরাতে সওয়াবের কোন যোগ্যতা বা দাবী থাকতে পারে না। মানুষকে আল্লাহ্ পাক যদি মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেন তবে তা মানুষের প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ নেয়ামত। এ নেয়ামত সমূহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন মানুষ আল্লাহর রহমত ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনিও না? তিনি বললেনঃ না।[১] (বোখারী, মুসলিম)

وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ

হে মানব জাতি! যদি তোমাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় তবে তা তোমাদের তরফ থেকে অর্থাৎ তোমাদের পাপাচারের শাস্তিস্বরূপ, অন্য কারো অন্যায়ের কারণে নয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন মুসলমানের প্রতি যদি কোন বিপদ আসে তবে আল্লাহ্ পাক তাকে তার গুনাহর কাফ্ফারা করে দেন। এমনকি যদি কারো গায়ে কোন কাঁটা বিদ্ধ হয় তার কারণেও আখেরাতের শাস্তি লাঘব হয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষের উপর যখন কোন দুঃখ বা রোগ তাপ আসে বা তার দেহে কাঁটা বিদ্ধ হয়, আল্লাহ পাক তার বিনিময়ে তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন বন্দা যখন কোন কষ্ট পায় বা তার প্রতি কোন মসিবত আসে তা তার গুনাহর কারণেই আসে। আর আল্লাহ পাক এর বরকতে যে গুনাহ্ মাফ করেন তা অনেক বেশী। (তিরমিজী)

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ পাক মুনাফেক ও কাফেরদের অন্যায় অসত্য কথার প্রতিবাদ করেছেন যা তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতো। এরপর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَأَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৭৪

অর্থাৎ এ দূরাত্মা কাফেররা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে যে ভিত্তিহীন কথা বললো যে, যত মসিবত এ ব্যক্তির কারণেই (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক) অথচ (হে রসূল!) আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছি, শুধু তাই নয়;

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

(আপনাকে আমি সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যে রহমত রূপে প্রেরণ করেছি।) অবশ্য এ দূরাত্মা কাফেররা সে রহমত থেকে বঞ্চিত, আর তাদের এ মসিবত আল্লাহর রসূলের অনুকরণ না করার কারণে। যখনই কোন মানুষ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে তখন সে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতের যোগ্য বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে যে বা যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণে অনীহা প্রকাশ করে তারা বিপদগ্রস্ত হয়। এ বিপদ দুনিয়াতেও হতে পারে, আর আখেরাতে তো অবশ্যই হবে।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, কাফের মুনাফেকদের এসব কথায় আপনি মর্মাহত হবেন না। কেননা, আপনি আল্লাহর প্রেরিত রসূল। মানুষের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়াই আপনার কাজ। অতএব, আপনি এ কাজ করে যান। আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

(হে রসূল!) আপনার জন্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। দুনিয়াতে আপনাকে অলৌকিক ক্ষমতা বা মোজেযা দান করে আল্লাহ পাক আপনার রেসালতের সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আর আখেরাতেও আল্লাহ্ পাকই আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের সাক্ষ্য প্রদানের কারণে কাফেররা লা-জবাব হবে এবং দোযখের শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ
عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝٨٠ وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۖ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ
طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ۖ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۖ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝٨١ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۖ
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۝٨٢ وَاِذَا
جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ۖ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ
وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ۖ وَلَوْ
لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝٨٣

তরজমা

(৮০) যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের তাবেদারী করে সে বস্তুতঃ আল্লাহ পাকেরই তাবেদারী করে এবং যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয় (হে রসূল!) তাতে আপনার চিন্তিত বা দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই (কেননা), আমিতো আপনাকে তাদের রক্ষক করে প্রেরণ করিনি।

(৮১) এবং তারা বলে থাকে যে, আমরা (আল্লাহ ও তাঁর রসূলের) তাবেদার, অতঃপর যখন আপনার নিকট থেকে দূরে সরে যায় তখন তাদের একদল লোক আপনার কথার বিরুদ্ধে কুপরামর্শ করে এবং আল্লাহ পাক তাদের পরামর্শকে লিখে রাখছেন। অতএব, (হে রসূল!) আপনি তাদের আচরণ উপেক্ষা করুন এবং আল্লাহ পাকের উপর ভরসা রাখুন, কার্য সম্পাদক রূপে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট।

(৮২) তারা কি কোরআনের মধ্যে চিন্তা করে না? যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো তরফ থেকে হতো তবে তাতে তারা অনেক গরমিল দেখতে পেতো।

(৮৩) এবং যখন তাদের নিকট শান্তির অথবা ভয়ের কোন সংবাদ পৌঁছে তখন তারা তা খুব প্রচার করে বেড়ায় এবং যদি তারা তা রসূল এবং নিজেদের কর্তৃপক্ষের

গোচরে আনতো তবে তাদের তথ্য সন্ধানীরা তা অনুসন্ধান করে দেখতো। আল্লাহ পাকের বিশেষ দান এবং রহমত যদি তোমাদের প্রতি না হতো তবে তোমরা অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই শয়তানের তাবেদারী করতো।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে আমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলো সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অনুগত হলো। আর যে আমার প্রতি মহব্বত রাখলো সে নিশ্চয় আল্লাহ পাকের প্রতি মহব্বত রাখলো। একথা শ্রবণ করে কতিপয় মুনাফেক বলতে লাগলো খৃষ্টানরা যেভাবে ঈসা এবনে মরয়মকে (আঃ) তাদের রব বা প্রতিপালক বানিয়ে ফেলেছে মনে হয় ইনিও আমাদের কাছ থেকে তাই চান। তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন।[১]

এ আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, যে আমার রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে সে প্রকৃত অবস্থায় আমারই অনুগত হবে। কেননা, রসূল আমারই প্রেরিত। আর তাঁর নিকট যে বিধি-নিষেধ রয়েছে তা-ও আমারই প্রদত্ত। আর যেহেতু আল্লাহ পাকের তৌফিক ব্যতীত রসূলের আনুগত্যও সম্ভব হয় না তাই রসূলের আনুগত্যের মাধ্যমেই প্রকারান্তরে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক একথাও ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى

(আল্লাহর রসূল নিজের ভাবাবেগে কোন কথা বলেন না, বরং তিনি যা কিছু বলেন তা আল্লাহর ওহী ব্যতীত আর কিছুই নয়।) অর্থাৎ আল্লাহর রসূলের কথা তা শুধু আল্লাহ পাকেরই কথা। যেভাবে আল্লাহর রসূলের কথাকে নিজের কথা বলে ঘোষণা করেছেন ঠিক তেমনি আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাজকেও নিজের কাজ বলে ঘোষণা করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

অর্থাৎ-হে নবী! আপনি কাফেরদের প্রতি যে মাটি নিক্ষেপ করেছেন তা আপনি নন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকই নিক্ষেপ করেছেন। এমনিভাবে যাঁরা ষষ্ঠ হিজরীতে

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৭৬
তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৯৪

অনুষ্ঠিত হোদায়বিয়ার চুক্তির পূর্ব মুহূর্তে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারকে জেহাদের বয়আত করেছেন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন তারা প্রকৃত অবস্থায় আল্লাহ পাকের হাতেই বয়আত করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

"(অর্থাৎ) নিশ্চয় (হে রসূল!) যারা আপনার হাতে হাত দিয়ে বয়আত করেছে বস্তুতঃ তারা আল্লাহ পাকের দরবারে বয়আত করেছে। তাদের হাতের উপর ছিল স্বয়ং আল্লাহ পাকের হাত"।

ঠিক এভাবেই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহর রসূলের তাবেদারীই হলো আল্লাহ পাকের তাবেদারী। অতঃপর আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) যারা আপনার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বিমুখ হবে তাদের জন্যে আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না, আপনি তাদের ব্যাপারে বিব্রতবোধ করবেন না। কেননা, আমি আপনাকে রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, রক্ষক হিসেবে নয়। আমার বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দেয়াই আপনার কাজ, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা আমার কাজ।

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ

(হে রসূল!) যখন আপনি তাদেরকে কোন আদেশ দেন) তখন তারা বলে আমাদের কাজই তো আনুগত্য প্রকাশ করা।

فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ

কিন্তু যখন তারা আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যায় তখন তাদের একথা আর থাকে না,

بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ

তাদের একদল লোক রাত্রিকালে কুপরামর্শ করে, তারা যা বলেছে সে পরামর্শ হয় তার বিরোধী। তারা দিনের বেলায় আপনার সাথে যে কথা দেয় রাতে কুপরামর্শ করে দিনের কথা বিনষ্ট করে এবং ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ আয়াতে মুনাফেকদের দুস্কৃতি ও দুর্নীতি বর্ণিত হয়েছে। যখন তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির থাকতো তখন তারা বলতো আপনার সকল আদেশ মাথা পেতে নিলাম। আপনার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাই যে আমাদের

কাজ। কিন্তু দরবারে নববী থেকে বের হওয়ার পরই তাদের আসল চেহারা প্রকাশ পায়। রাতের অন্ধকারে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কুপরামর্শ করে থাকে। তাদের ধারণা এই, তাদের এসব দুষ্কৃতি সম্পর্কে কেউ কিছুই জানতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের এ ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেনঃ

وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ

অর্থাৎ- তারা রাতে যেসব কুপরামর্শ করে আল্লাহ পাক তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। আল্লাহর যেসব ফেরেশতাগণ মানুষের আমলনামা লিপিবদ্ধ করেন তারা আল্লাহ পাকের হুকুমে মুনাফেকদের এ সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখেন যেন তাদেরকে যথাযোগ্য শাস্তি দেয়া যায়।

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ

(হে রসূল!) আপনি এ দূরাত্মাদের থেকে দূরে থাকুন। তাদের অন্যায় আচরণকে উপেক্ষা করে চলুন। তাদের প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করবেন না। কেননা, তাদের শাস্তির জন্যে আল্লাহ পাক যথেষ্ট। আর তাদের শাস্তি অবধারিত। অথবা এর অর্থ হলো (হে রসূল!) আপনি তাদের প্রতি রাগ করবেন না এবং এদের নাম প্রকাশ করবেন না।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

আর সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখুন। তারা যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন আল্লাহ পাকের রহমতে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহ পাকই তাদের প্রতিশোধ নেবেন।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ ইসলামের প্রথম যুগে তথা হিযরতের পর যখন মদীনা মোনাওয়্যারাকে কেন্দ্র করে ইসলামের পবিত্র সংগ্রাম শুরু হয় তখন এ মুনাফেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত, তখন আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার এবং তাদের নাম প্রকাশ না করার নির্দেশ দান করলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ইসলাম শক্তিশালী হলো তখন এ আদেশের পরিবর্তে আদেশ জারী হলো কাফের এবং মুনাফেকদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তখন মুনাফেকদের নামও প্রকাশ করা হলো। একদিন স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী থেকে প্রত্যেকটি মুনাফেকের নামোল্লেখ করে তাদেরকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন এবং তাঁর আদেশ সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হলো।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের রসূল। রসূলের অনুগত হওয়া আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশেরই নামান্তর, পক্ষান্তরে আল্লাহর রসূলের অবাধ্য হওয়া আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়ারই শামিল। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ব্যতীত কোন গত্যন্তরই থাকে না। কিন্তু দূরাত্মা মুনাফেকরা নাফরমানীর জন্যে নতুন পন্থা অবলম্বন করলো। তারা বললো, আল্লাহ পাকের হুকুম পালনে তো আমাদের কোন দিনই আপত্তি ছিল না, এখনও নাই, আমরা আল্লাহর আদেশ পালনে সর্বদা প্রস্তুত। কিন্তু কোরআন যে আল্লাহর বাণী, কোরআন যে আল্লাহরই নির্দেশ একথার কি প্রমাণ আছে? আর এ ব্যাপারে আমরা কিভাবে নিশ্চিন্ত হতে পারি?

এ প্রশ্নের জবাবেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করেছেন এবং এরশাদ করেছেন, পবিত্র কোরআন যে আল্লাহ পাকের কালাম তোমরা একথার প্রমাণ চাও? বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনই তার সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহ ব্যতীত আর কারো বাণী হতেই পারে না। কেননা, যদি পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো বাণী হতো তবে নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে পবিত্র কোরআনে অনেক ভুল-ভ্রান্তি, অনেক অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথা-বার্তা থাকত এবং অনেক গরমিল দেখা যেতো। কেননা, মানুষ এক অবস্থাতে থাকতে পারে না। যখন সে উত্তেজিত হয় তখন ভালবাসার কথা তার মনের কাছেও থাকে না। আর যখন কারো প্রতি কারো ভালবাসা এবং অনুরাগে মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন ক্রোধ আর উত্তেজনার অস্তিত্ব থাকে না। দুনিয়ার লোভ-লাভের সময় আখেরাতের কথা আদৌ মনে থাকে না। এমনি অবস্থায় মানুষের কথায়-কাজে, চিন্তা-চর্চায়, জীবন ধারায় একটা গরমিল বা অসামঞ্জস্যতা সর্বদা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু পবিত্র কোরআন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এতে কোন অসাম স্যপূর্ণ কথাবার্তা নেই। কোন প্রকার গরমিল নেই, যে কথাটি যেমন হওয়া উচিত তেমনই আছে। কোন প্রকার বৈষম্য বা বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় না। পবিত্র কোরআনের এ বৈশিষ্ট্যই এ মহাসত্যের জ্বলন্ত প্রমাণ যে, পবিত্র কোরআন সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকেরই কালাম। যারা বুদ্ধিমান, যারা পরিণামদর্শী তারা চিন্তা করে এবং এ সত্য অতি সহজেই উপলব্ধি করে যে, পবিত্র কোরআন সত্য সত্যই আল্লাহ পাকের কালাম, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। যদি মুনাফেকরা এ বিষয়ে চিন্তা করতো তবে তারাও প্রকৃত মোমেন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতো।[১]

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১১৭

এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র এবং দুর্নীতির বিবরণ স্থান পেয়েছিল আর তা এজন্যে যে, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতে বিশ্বাস করতো না। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, তোমরা পবিত্র কোরআনের প্রতি লক্ষ্য কর এবং পবিত্র কোরআনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের অনেক সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ রয়েছে তাতে চিন্তা কর, তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ

তারা কি পবিত্র কোরআনে চিন্তা ও গবেষণা করেনা? অর্থাৎ যদি তারা চিন্তা করতো তবে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতার অনেক প্রমাণ দেখতে পেতো। ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেন, পবিত্র কোরআনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতার প্রমাণের তিনটি দিক রয়েছে–

১. পবিত্র কোরআনের ভাষার অলংকার,

২. পবিত্র কোরআনে অদৃশ্য জগতের খবর পরিবেশন এবং

৩. গরমিল এবং অসামঞ্জস্যতা থেকে মুক্ত থাকা যা এ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ

অর্থাৎ- যদি পবিত্র কোরআন আল্লাহর বাণী না হয়ে অন্য কারো কথা হতো তবে তাতে তারা অনেক গরমিল দেখতে পেতো। অথচ পবিত্র কোরআনে এ ত্রুটি নেই। তাই একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কোরআন সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের কালাম, আর যাঁর নিকট এই পবিত্র কালাম প্রেরিত হয়েছে তিনি আল্লাহ পাকের রসূল। অতএব, যারা পরিণামদর্শী তাদের কর্তব্য হলো তাঁর প্রতি ঈমান আনা।

আবু বকর আসাম (রঃ) বলেছেন, এ মুনাফেকরা রাতের অন্ধকারে ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব কুপরামর্শ করতো সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন। ক্ষেত্র বিশেষে তা পবিত্র কোরআনের অংশ হিসেবে পরিগণিত হতো এবং যেভাবে তারা পরামর্শ করতো আল্লাহ পাক ঠিক সেভাবেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে

দিতেন। ফলে তাঁর কথায় তারা সত্য ছাড়া কিছুই পেতো না। এতদ্বারা তাঁর সত্যতার প্রমাণ এবং পবিত্র কোরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার সত্যতা তারা দেখতে পেতো।

وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ

"এবং যখন তাদের নিকট শান্তির অথবা ভয়ের কোন সংবাদ পৌঁছে তখন তারা তা খুব প্রচার করে বেড়ায়"।

(কিন্তু আল্লাহ্ পাক যাকে তৌফিক দান করেন সে-ই ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করে।)[১]

শানে নুযুল

আল্লামা বগবী (রহঃ) লিখেছেন, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন এলাকায় ছোট-বড় সৈন্য দল প্রেরণ করতেন। তাঁরা দুশমনের মোকাবেলা করতেন। কোথাও তারা বিজয়ী হতেন আবার কোথাও পরাজিত কিন্তু মুনাফেকরা সর্বদা আগেই খবর সংগ্রহের চেষ্টা করতো এবং খবর পাওয়া মাত্রই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে কোন ঘোষণার পূর্বেই সে খবর প্রচার তারা শুরু করে দিত। যদি পরাজয়ের খবর হতো তবে মুনাফেকরা তা ফলাও করে প্রচার করতো এবং দুর্বল চিত্ত মুসলমানদেরকে আরো দুর্বল করার চেষ্টা করতো। এতে নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হতো, আর এসব খবরের কারণে দুশমনের উপকৃত হওয়ারও সুযোগ থাকতো। তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَا جَآءَهُمْ

এবং যখন মুনাফেকদের অথবা দুর্বলচিত্ত মুসলমানদের নিকট শান্তির অথবা ভয়ের কোন সংবাদ পৌঁছে তখন তারা তা প্রচার করে বেড়ায়।

وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ

যদি তারা তা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এবং নিজেদের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিকট যারা এসব বিষয়ে পারদর্শী যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) প্রমুখ বিখ্যাত সাহাবায়ে কেরামের নিকট পেশ করতো তথা তাদের গোচরে আনতো তবে তাঁরা এ

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৯৬

সম্পর্কে অনুসন্ধান করতেন। বিখ্যাত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে আলোচ্য আয়াতে "উলিল আম্‌র" বলা হয়েছে কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় সাহাবায়ে কেরামকে কোথাও প্রেরণ করতে হলে তাদের মধ্য থেকেই কাউকে নেতা মনোনীত করতেন। অথবা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের সাথেই পরামর্শ করতেন। অথবা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাধারণ সাহাবায়ে কেরামকে নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামের কথা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, পৃথিবীতে আমার দু'জন উজির। আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)। (তিরমিজী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার পরে তোমরা আবু বকর ও ওমরের কথা মেনে চল। (তিরমিজী)

মূলতঃ এসব কারণেই তাঁদেরকে "উলিল আম্‌র" বলা হয়েছে।

لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ

অর্থাৎ- যদি তারা যুদ্ধ সম্পর্কীয় খবর বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামকে জানাতো তাহলে তারা চিন্তা করে দেখতেন যে, ঐ খবর প্রচার করা উচিত নাকি গোপন রাখা উচিত। আর তাই তাদের জন্যে ভাল হতো।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কারো সঙ্গে শান্তি ও নিরাপত্তার খাতিরে সন্ধি করতেন, কারে সাথে যুদ্ধের সময় জয় হতো বা পরাজয় হতো– এসব খবর পরিস্থিতি বিচার না করে প্রচার করা সঠিক হতো না। তাই প্রচারের পূর্বে নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামের নিকট পেশ করাই ছিল কর্তব্য। তারাই সিদ্ধান্ত নেবেন কোন্ খবর প্রচার হবে, আর কোন্‌টি প্রচারিত হবে না।

হাদীস শরীফে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে যাকাত উসুলের জন্যে প্রেরণ করলেন। সে এলাকার লোকজন তাকে সম্বর্ধনা জানাতে প্রস্তুতি নেয়। তাদের প্রস্তুতি দেখে তিনি মনে করলেন হয়তো তারা আক্রমণ করবে। ফলে তিনি সেখান থেকে পলায়ন করলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ সংবাদ দিলেন যে, তারা সকলেই মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়েছে। অথচ খোঁজ নিয়ে জানা গেল কথাটি সত্য নয়।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দান এবং অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে বারে বারে সতর্ক করেছেন, যদি তিনি দয়া না করতেন এবং তোমাদেরকে সতর্ক না করতেন তবে তোমরা অঘটন থেকে রক্ষা পেতে না। অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই শয়তানের ধোকায় পড়তো। অতএব, তোমরা আল্লাহ্ পাকের এমন সতর্ক নির্দেশ মেনে চল। শয়তানের প্রতারণা থেকে রক্ষা করার জন্যে প্রেরিত হয়েছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, নাযিল হয়েছে পবিত্র কোরআন। অতএব, আল্লাহ্র রসূলের অনুমতি ব্যতীত মুসলমানদের কোন খবর প্রচারে তাড়াহুড়া করোনা।

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ
عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ
تَنْكِيْلًا ۝ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَ
مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ مُّقِيْتًا ۝ وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ۗ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا

তরজমা

(৮৪) অতএব (হে রসূল!) আপনি আল্লাহ্ তায়ালার পথে জেহাদ করুন, নিজের ভিন্ন অন্যের জন্যে আপনি দায়ী নন। এবং মোমেনগণকে জেহাদের জন্যে উৎসাহিত করে তুলুন। অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্ পাক কাফেরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন এবং আল্লাহ্ পাক জেহাদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন ও শাস্তিদানে অতিশয় কঠোর।

(৮৫) এবং যে ব্যক্তি (অপরকে) ভাল কাজের জন্যে অনুরোধ করবে সে তা থেকে অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ কাজের জন্যে সুপারিশ করবে সে সেই মন্দের বোঝার ভাগী হবে। এবং আল্লাহ্ তায়ালাই সব বিষয়ে শক্তি দানকারী।

(৮৬) এবং যখন তোমাদেরকে কেউ সালাম দেয় তখন তোমরা তার চেয়ে ভাল কথায় জবাব দাও অথবা অনুরূপ কথাই বলে দাও, নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা সব বিষয়ই হিসেব গ্রহণ করবেন।

তফসীরুল কোরআন

যেহেতু ইতিপূর্বে মুনাফেক এবং দুর্বল চিত্ত মুসলমানদের জেহাদ সম্পর্কে গড়িমসি করার কথা বর্ণিত হয়েছে তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে জেহাদের নির্দেশ দান করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ (হে রসূল!) জেহাদে কেউ শরীক হোক বা না হোক আপনি একাই রণাঙ্গণে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আল্লাহ পাকই সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট। অতএব, আপনি এতটুকু পরোয়া করবেন না। কেউ আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।

এবনে সা'দ হযরত খালেদ এবনে মেদান (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমাকে সমগ্র মানব জাতির নিকট রসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। যদি সবাই আমাকে না মানে তবে আমার প্রেরণ সমগ্র আরব জাহানের জন্যে হবে। যদি তারাও না মানে তবে পারস্যের জন্যে হবে। আর যদি বনি হাশেম না মানে তবে আমার রেসালত হবে শুধু আমার জন্যে।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেনঃ ওহোদের যুদ্ধের পর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানের সাথে এ অঙ্গীকার করেছিলেন যে, জিলক্বদ মাসে বদরে ছোগরায় পুনরায় দু' দলের মধ্যে মোকাবেলা হবে। যখন নিদৃষ্ট সময় আসে তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে জেহাদের জন্যে আহবান করলেন কিন্তু কিছু লোক তখন এ আহবানে সাড়া দিতে প্রস্তুত হলোনা। এ অবস্থায় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে এ বর্ণনা পেশ করেছেন।[১]

وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ

(হে রসূল!) মোমেনদেরকে জেহাদের জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে থাকুন। আশা করা যায় আল্লাহ পাক কাফেরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন তথা তারা নিজেরাই যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। অবশেষে ঘটনাও তাই হয়েছিল। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেনঃ আমার সঙ্গে কেউ জেহাদে শরীক হোক বা না হোক আমি জেহাদে রওয়ানা হলাম। অবশেষে ৭০ জন সাহাবী তাঁর সঙ্গী হলেন। ওহোদের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে আবু সুফিয়ান যে বলেছিল–

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮০
তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২০৪

"বদরে ছোগরায় পুনরায় দেখা হবে"। সে কথা অনুযায়ী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখানে গমন করলেন। এদিকে আল্লাহ পাক আবু সুফিয়ান-ও তাঁর লোকদের মনে এমন ভয় সৃষ্টি করেছিলেন যে, তারা মুসলমানদের সম্মুখীন হবার সাহস হারিয়ে ফেলে। শুধু তাই নয়, তারা প্রাণের মায়ায় এ স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। এভাবে আল্লাহ পাকের ঘোষণা ঘটনায় পরিণত হলো। যুদ্ধ বন্ধ হলো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নিরাপদে মদীনা মোনাওয়্যারা ফিরে আসলেন এবং কাফেররা সাহস হারিয়ে ফেলল।[১]

وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا

এবং আল্লাহ পাক জেহাদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন, আর আল্লাহ পাক শাস্তি দানে অতিশয় কঠোর। অর্থাৎ কোরায়শদের আক্রমণের যে ভয় রয়েছে আল্লাহর আযাব তার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন। এ আয়াতে সতর্কবাণী রয়েছে সেসব লোকদের উদ্দেশ্যে যারা জেহাদের ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে পিছপা হয়েছিল।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, فَقَاتِلْ শব্দটির ف অক্ষরটি তাৎপর্য হচ্ছে এই, যে আল্লাহর রাহে জেহাদ করে শাহাদাত বরণ করে অথবা বিজয়ী হয় আমি তাকে অবশ্যই বিশেষ সওয়াব দান করবো। অতএব, (হে রসূল!) আপনি নিজেই আল্লাহর রাহে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ুন এবং মুসলমানদেরকে জেহাদের জন্যে উদ্বুদ্ধ করুন।

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً

এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি ভাল কাজে উত্তম সুপারিশ করে তথা এমন কাজে সুপারিশ করে যা মুসলমানদের জন্যে উপকারী হয় এবং মুসলমানদের উপকারের জন্যে সচেষ্ট হয় এবং সে চেষ্টা শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয় তবে সুপারিশকারীর জন্যেও সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে। যেমন জেহাদের জন্যে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা অত্যন্ত মহৎ কাজ। এতদ্বারা অনেক বেশী সওয়াব হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ মহা পূণ্যময় কাজই করেছেন। অতএব, তিনি এর সওয়াবের অংশীদার হবেন।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে কেউ যদি কোন প্রয়োজনে বা সাহায্যে

১। সূরা আলে এমরানে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

হাযির হতো তখন তিনি আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলতেন, তোমরা সুপারিশ কর। তোমরা সওয়াব পাবে। আর আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীর রসনায় যে বাক্য ইচ্ছা জারী করবেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ কল্যাণকর কাজের পথপ্রদর্শক যে কল্যাণকর কাজ করে তার সমমর্যাদা লাভ করে। এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কোন মুসলমানের জন্যে দোয়া করাও উত্তম সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত হয়। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি মুসলমান ভাইয়ের জন্যে তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করে তবে ফেরেশতারা বলে আল্লাহ এমনই করুন, আর তোমার জন্যে এমনই হোক।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, মানুষের মধ্যে মীমাংসা করাও উত্তম শাফায়াতের অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, মানুষকে ভাল কথা বলাও উত্তম শাফায়াত যার দ্বারা কল্যাণ সাধিত হয়, সওয়াব অর্জিত হয়।

وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا

পক্ষান্তরে যে মন্দ কাজের সুপারিশ করে, মুসলমান তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তবে মন্দ কাজের সুপারিশকারীও মন্দ কাজের গুনাহর অংশ পায়। কেননা, মন্দ কাজের সুপারিশও মন্দ। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, চোগলখোরী মন্দ সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলেম বলেছেন, পরনিন্দা, মানুষকে মন্দ কথা বলা-এর সবই মন্দ কাজের সুপারিশ। যে ব্যক্তি মন্দ কাজের সুপারিশ করে তার তেমন গুনাহই হবে যেমন সে ব্যক্তির গুনাহ্ যে মন্দ কাজ করে।

লক্ষ্যনীয়, পৃথিবীতে কাজ দু' ভাবে হয়। হয়তো নিজেকে কাজ করতে হয় অথবা কাউকে দিয়ে করাতে হয়। অন্যকে দিয়ে কাজ করানোকেই শাফায়াত বলা হয়। যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এমন কাজ করা হয় যা মানুষের জন্যে উপকারী এমন কাজকে উত্তম শাফায়াত বলা হয়। পক্ষান্তরে, যদি সে কাজ মানুষের জন্যে ক্ষতিকর হয় তবে এটি মন্দ শাফায়াতের অন্তর্ভুক্ত। চোগলখোরী, বদনাম, কুপরামর্শ দেয়া, পাপাচারে সাহায্য করা, কারো দোষ প্রচার করা, মন্দ কাজের ওকালতি করা– এসবই মন্দ সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট।

এরশাদ হয়েছেঃ

مَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِه

"যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজনের আয়োজন করে আল্লাহ পাক স্বয়ং তার প্রয়োজন পূর্ণ করেন"।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছেঃ

مَنْ مَشَى مَعَ مَظْلُوْمٍ يَشْبِتُ لَهُ حَقَّهُ ثَبَّتَ اللّٰهُ قَدْمِيَهُ عَلَى الصِّرَاطَ يَوْمَ تَزُوْلَ الاَقْدَامُ

"যে ব্যক্তি কোন মজলুমের সাহায্য করে ফলে সে মজলুমের হক্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলে আল্লাহ পাক পুলসিরাতে তার পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখবেন, যেদিন মানুষের পদযুগল নড়বড়ে হয়ে যাবে"।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করবে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমানের দোষ গোপন করে রাখবে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ فِىْ عَوْنِ العَبْدِ مَاكَانَ العَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ

"আল্লাহ পাকের সাহায্য বন্দার প্রতি ততক্ষণ নিবদ্ধ থাকে যতক্ষণ সে বন্দা তার মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে নিরত থাকে"।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ আল্লাহ পাকের কিছু বন্দা রয়েছে যাদেরকে নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে যেন তারা মানুষের উপকার করে। সে নেয়ামত তাদের নিকট ততদিন থাকে যতদিন তারা মানুষের জন্যে ব্যয় করতে থাকে। যখন তারা মানুষের জন্যে ব্যয় করতে বিরত হয় তখন আল্লাহ পাক সে নেয়ামত তাদের থেকে নিয়ে অন্যদের দিয়ে দেন। হাদীস শরীফে আরো এরশাদ হয়েছেঃ কেয়ামতের দিন দোযখীদের একদল বের হবে, তাদের সঙ্গে একজন লোকের দেখা হবে, তারা তাকে বলবে তুমি কি আমার পরিচয় পাওনি? সে ব্যক্তি বলবে-না। তখন সে বলবে একদিন (দুনিয়াতে) তুমি আমার নিকট অজুর পানি চেয়েছিলে, আমি দিয়েছিলাম। তখন সে ব্যক্তি এ দোযখী ব্যক্তির জন্যে সুপারিশ করবে।[১]

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪১৮

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا

(আর আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।)

মুজাহেদ (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক সব বিষয় প্রত্যক্ষ করেন। আর কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক সব বিষয়ের নেগাহবান। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক প্রাণী মাত্রেরই রিয্কদাতা।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন, এর পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে এ আয়াতের একটি সম্পর্ক রয়েছে তাহলো, আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পূর্ববর্তী আয়াতে আদেশ দিয়েছেন যে, মোমেনদেরকে জেহাদের জন্যে উদ্বুদ্ধ করুন। আর জেহাদ হলো অত্যন্ত বড় নেক আমল। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতকে জেহাদের জন্যে উদ্বুদ্ধ করা একটি উত্তম সুপারিশ। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে উত্তম সুপারিশের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ

এবং যখন তোমাদেরকে কেউ সালাম দেয় তখন তোমরা তার চেয়ে ভাল কথায় জবাব দাও অথবা অনুরূপ কথাই বলে দাও। হযরত এমরান এবনে হোসাইন (রাঃ) বর্ণনা করেন, জাহেলিয়াতের যুগে আমরা সালামের স্থলে বলতামঃ

انعم الله بك علينا انعم صباحا

কিন্তু যখন ইসলামের আবির্ভাব হলো তখন আমাদেরকে ঐকথা থেকে বিরত রাখা হলো এবং সালামের প্রথা প্রচলিত হলো। (আবু দাউদ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আদম (আঃ)-কে যখন সৃষ্টি করা হলো তখন তার দেহের দৈর্ঘ্য ছিল ৬০ হাত। আল্লাহ পাক তাঁকে হুকুম দিলেন এই দলকে সালাম কর। আর তারা জবাবে যা বলে তাও শ্রবণ কর। কেননা, তাই হবে তোমার এবং তোমার বংশধরদের সালাম।

হযরত আদম (আঃ) ফেরেশতাদের দলের নিকট গমন করে বললেন, "আসসালামু আলাইকুম," ফেরেশতারা জবাবে বললো, "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ"। ফেরেশতাদের জবাবে "ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বাক্যটি বৃদ্ধি করা হলো।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮২

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, সালামের জবাব দেয়া অবশ্য কর্তব্য আর জবাবে কোন বাক্য বাড়িয়ে বলা মুস্তাহাব, আর বাড়তি বাক্যের জন্যে বাড়তি সওয়াব পাওয়া যায়।

হযরত এমরান এবনে হোসায়েন (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললো, আসসালামু আলাইকুম। তিনিও তাঁকে অনুরূপ জবাব দিলেন এবং এরশাদ করলেন, দশ নেকী সওয়াব হলো, তখন ঐ ব্যক্তি বসে পড়লো। এরপর বললো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুরূপ জবাব দিয়ে বললেন, বিশ নেকী সওয়াব হয়েছে। এরপর লোকটি বসে গেল। এরপর অপর এক ব্যক্তি আসলো এবং বললো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে জবাব দিয়ে বললেন, ত্রিশ নেকী সওয়াব হয়েছে। (তিরমিজী, আবু দাউদ)

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলেমের মতে, পরিপূর্ণ সালাম হলো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। এর চেয়ে বাড়ানো ঠিক নয়।

এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে সালাম করলো এবং বললো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। এরপরও 'দু' একটি বাক্য বৃদ্ধি করলো। তখন হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, সালাম বরকতের উপর শেষ হয়েছে। (বগবী)

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, সালামের জবাব দেয়া ফরজে কেফায়া। দলের একজন জবাব দিলেই সবার জন্যে যথেষ্ট হবে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যদি এক দলের একজন সালাম দেয় তবে তা সকলের পক্ষে যথেষ্ট হবে। এভাবে উপবিষ্ট দলের একজন জবাব দিলে তাও যথেষ্ট হবে। (বগভী)

যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ ব্যক্তির নাম ধরে সালাম দেয় তবে সে ব্যক্তির প্রতিই জবাব দেয়া ওয়াজিব হয়। অন্য ব্যক্তির জবাব দেয়া এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। প্রথমে সালাম দেয়া সুন্নত এবং এটিই উত্তম।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা যতক্ষণ ঈমান না আনবে ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, আর যতক্ষণ একে অন্যকে ভাল না বাসবে ততক্ষণ তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাকে এমন কথা বলবো? যার উপর আমল করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মহব্বত হবে। তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রসার কর। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাকের সাথে সর্বাধিক সম্পর্ক থাকে সে ব্যক্তির যে প্রথমে সালাম দেয়। (আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলোঃ ইসলামী আখলাক বা ইসলামী শিক্ষার মধ্যে কোন্‌টি সর্বাধিক উত্তম?

তিনি এরশাদ করলেনঃ খাবার খাওয়ানো এবং প্রত্যেককে সালাম দেয়া, পরিচিত হোক কি অপরিচিত (বোখারী ও মুসলিম)

সালামের রীতি

যে ব্যক্তি আরোহী সে সালাম দেবে সে ব্যক্তিকে যে পদব্রজে চলে, আর যে পদব্রজে চলে সে সালাম দেবে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে। আর ক্ষুদ্র দল সালাম দেবে বড় দলকে।

এ সম্পর্কে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর হাদীস বর্ণিত হয়েছে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে। তবে বোখারী শরীফে আরো একটি বাক্য রয়েছে তা হলো, যে ছোট সে বড়কে সালাম দেবে।

শিশু এবং স্ত্রীলোকদেরকেও সালাম দেয়া উচিত। কেননা, হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লামের আলাইহে ওয়াসাল্লাম শিশুদের নিকট থেকে পথ অতিক্রম করার সময় তাদেরকে সালাম দিতেন। (বোখারী ও মুসলিম)

হযরত জরীর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের নিকট দিয়ে গমন করার সময় তাদেরকে সালাম দেন। (আহমদ)

কোন বাড়ীর মালিক বাড়ীতে প্রবেশ করার সময় বাড়ীর লোকদেরকে সালাম করবে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হে আমার সন্তান! তুমি বাড়ীতে প্রবেশ করার সময় বাড়ীর লোকদেরকে সালাম দিও। এতদ্বারা তোমার এবং তোমার বাড়ীর লোকদের জন্যে বরকত হবে। (তিরমিজী)

আর যদি বাড়ীতে কেউ না থাকে তবে একথা বলবে–

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

অর্থাৎ সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের প্রতি। ফেরেশতাগণ এ সালামের জবাব দেবেন। কেননা, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً

"যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ কর তখন নিজেদের প্রতি সালাম দাও আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোহফা স্বরূপ। আর এটি অত্যন্ত মোবারক, উত্তম তোহফা"। এতদ্ব্যতীত, কথা বলার আগে সালাম দেয়া সুন্নত।

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছেঃ

السلام قبل الكلام

(সালাম কথার পূর্বে।)

এতদ্ব্যতীত, সালামের এ নিয়মও রয়েছে যে, মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে যতবারই দেখা হয় ততবারই সালাম দেয়া উচিত। এমনকি, দেওয়াল বা বৃক্ষের আড়ালে চলে গেলে পুনরায় দেখা হলে তাকেও সালাম দিতে হবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে তবে যেন তাকে সালাম দেয়, যদি তাদের মাঝে কোন বৃক্ষ বা দেয়ালের আড়াল হয়ে যায় পুনরায় তারা মুখোমুখি হয় তখন সালাম করবে। (আবু দাউদ)

আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য তা হলো মজলিশ থেকে বিদায়ের সময় সালাম দেয়া সুন্নত।

কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন তুমি কোন গৃহে প্রবেশ কর তখন সে গৃহের অধিবাসীদের তুমি সালাম দিও, আর যখন সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ কর তখনও সালাম দিও। (বায়হাকী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন মজলিসে উপস্থিত হয় তার কর্তব্য হলো সালাম দেয়া। যদি উপবিষ্ট হওয়ার ইচ্ছা হয় তবে উপবিষ্ট হতে পারে কিন্তু বিদায়ের সময় যেন পুনরায় সালাম দেয়।

প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালামের চেয়ে অধিক জরুরী নয় অর্থাৎ প্রথম সালামের ন্যায়ই দ্বিতীয় সালামও জরুরী।[১] (তিরমিজী, আবু দাউদ)

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮২

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, যদি কেউ কারো সালাম পৌঁছায় তবে যাকে সালাম পৌঁছায় সে বলবে,

(আলাইকা ওয়ালাই হিস সালাম) عليك وعليه السلام

গালেব তার পিতার সূত্রে তার পিতামহের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমাকে আমার পিতা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রেরণ করেছেন এবং বলেছেনঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আমার সালাম পৌঁছে দাও। আমি হাযির হয়ে সালাম পৌঁছাই। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমার প্রতি এবং তোমার পিতার প্রতি সালাম। (আবু দাউদ)

যে সালাম অবৈধ

কাফেরকে প্রথম সালাম দেয়া বৈধ নয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ইহুদী এবং ঈসায়ীদেরকে প্রথমে সালাম দিও না।

যদি মুসলমান, মূর্তি-পূজক, মুশরেক, ইহুদী একত্রিত হয়ে থাকে তখন তাদেরকে সালাম দেবে তবে সে সালাম শুধু মুসলমানকে দেবে অর্থাৎ শুধু মুসলমানের নিয়তে সালাম দেবে।

যদি আহলে কিতাবরা সালাম দেয় তবে তার জবাবে শুধু বলবে ওয়ালাইকুম।

যে সালামের জবাব দেয়া বৈধ নয়

নামাজ এবং খোৎবার সময় সালামের জবাব দেয়া বৈধ নয়। যদি কেউ এমন অবস্থায় সালামের জবাব দেয় তবে নামাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

যে সালামের জবাব দেয়া জরুরী নয় তবে বৈধ

উচ্চস্বরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার সময়, হাদীস লিপিবদ্ধ করার সময় এবং দ্বীনি এলমের আলোচনার সময়, আযান এবং একামত বলার সময় সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব বা জরুরী নয় তবে বৈধ।[১]

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَسِيْبًا

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮৪-৮৬

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছুর হিসাব গ্রহণ করবেন"।

মুজাহেদ (রঃ) আলোচ্য আয়াতের 'হাসীবা' শব্দটির অর্থ করেছেন হাফিজা অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের সমস্ত বিষয়ের উপর নেগাহবান তথা বন্দাদের পারস্পরিক হক্ব এবং অধিকার সংরক্ষণকারী। যেমন- সালাম করা এবং কোন মুসলমান হাঁচী দিলে দোয়া করা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একজন মোমেনের প্রতি অন্য মোমেনের ৬টি হক রয়েছেঃ

১. যদি মুসলমান ভাই অসুস্থ হয় তবে অন্য মুসলমানের কর্তব্য হলো তার খোঁজ খবর নেয়ার জন্যে যাওয়া,

২. যদি মোমেন মৃত্যু মুখে পতিত হয় তবে তার জানাযায় শরীক হওয়া,

৩. যদি সে দাওয়াত করে তবে তা কবুল করা,

৪. সাক্ষাতের সময় তাকে সালাম দেয়া,

৫. যদি মোমেনের হাঁচী আসে তবে দোয়া করা এবং

৬. সে উপস্থিত থাকুক অথবা অনুপস্থিত থাকুক সর্বাবস্থায় তার কল্যাণ কামনা করা।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা রাস্তার ওপর উপবিষ্ট হওয়া থেকে বিরত থাক। আমরা আরয করলাম, আমরা রাস্তার ওপর বসে কথাবার্তা বলি, এছাড়া কোন গতিও নেই, তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ যদি রাস্তার উপর উপবিষ্ট না হওয়া ছাড়া কোন গতি না থাকে, তবে রাস্তার হক্ব আদায় করবে। সাহাবাগণ আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! রাস্তার হক্ব কি? তিনি এরশাদ করলেন, রাস্তার হক্ব হল-

১. চক্ষু নিচের দিকে রাখা,

২. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া,

৩. সালামের জবাব দেয়া,

৪. ভাল কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা,

এ ঘটনায় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে ঃ

৫. মানুষকে পথ প্রদর্শন (আবু দাউদ)

আর হযরত ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে, বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য কর এবং পথভ্রষ্ট মানুষকে পথ দেখাও (আবু দাউদ)

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, সালামের পরিপূর্ণতা আসে মুছাফেহা এবং মুআনেকার মাধ্যমে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের পরস্পরের সালামের পরিপূর্ণতা হল মুছাফেহা। (আহমদ, তিরমিজী)

হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখনই আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মোলাকাত করেছি তখন তিনি অবশ্যই আমার সঙ্গে মুছাফেহা করেছেন। একদিন তিনি আমাকে ডাকার জন্যে বাড়ীতে লোক পাঠালেন, আমি তখন বাড়ীতে ছিলাম না। বাড়ীতে এসে খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দরবারে হাযির হলাম। তিনি উপবিষ্ট ছিলেন, আমাকে তিনি আলিঙ্গন করলেন, আর এ মুআনেকা বা আলিঙ্গন ছিল অতি উত্তম।

শা'বী বর্ণনা করেনঃ যখন হযরত জাফর এবনে আবু তালেব (রাঃ) সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর এস্তেকবাল করেন এবং আলিঙ্গন করেন। আতা খোরাসানীর বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা পারস্পরিক মুছাফেহা কর, তাহলে বিদ্বেষ দূর হবে, একে অন্যকে হাদিয়া দিও, তাহলে পরস্পরের মধ্যে মহব্বত হবে এবং দুশমনী দূর হবে।

হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন দু'জন মুসলমান পরস্পর মুছাফেহা করে তখন তাদের উভয়ের গুনাহ ঝরে যায়, বাকী থাকে না।[১] (বায়হাকী)

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সালামের তাগিদ দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

افشوا السلام

অর্থাৎ- তোমরা সালামের প্রসার কর, এতে একথা প্রমাণিত হয় সালাম দেয়া অবশ্য কর্তব্য। এখানে আরো একটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য, যখন কোন ব্যক্তি কারো নিকট যায় তখন সে ব্যক্তি আদৌ জানে না যে আগমনকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্য ভাল নাকি মন্দ, এমন অবস্থায় যখন সে বলে

السلام عليكم

এতদ্বারা সে শান্তির খোশ খবর দেয় এবং ভয় থেকে নিরাপত্তা প্রদান করে এবং ক্ষতির আশঙ্কা দূর করে, যা মুসলমানের বৈশিষ্ট্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮৭

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমান যে ব্যক্তি সে অন্য মুসলমানকে তার হাত ও রসনা থেকে নিরাপদ রাখে।

অর্থাৎ- অন্য মুসলমানকে সে কোনভাবেই কষ্ট দেয় না। আর সালামের মাধ্যমে এ নিরাপত্তা বিধান করা হয়। এটি মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য। ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ সালামের জবাব না দেয়ার মাধ্যমে সালাম দাতাকে অপমান করা হয়, আর মুসলমানকে অপমান করা বা ক্ষতিসাধন করা অবৈধ।[১]

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۭ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ﴿٨٧﴾ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ۭ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿٨٨﴾

তরজমা

(৮৭) আল্লাহ পাক, তিনি ভিন্ন কেউই বন্দেগীর উপযুক্ত নেই। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তিনি নিশ্চয় তোমাদেরকে একত্রিত করবেন এবং কথা-বার্তায় আল্লাহ তায়ালার চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে হবে?

(৮৮) (হে মোমেনগণ!) তোমাদের কি হলো যে, তোমরা মুনাফেকদের ব্যাপারে দু' দলে বিভক্ত হলে? অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি চাও তাকে হেদায়েত করবে? আর (মনে রেখো) যাকে আল্লাহ পাক পথভ্রষ্ট করে রাখেন তোমরা তার জন্যে কখনও কোন পথ পাবেনা।

তফসীরুল কোরআন

ইসলামের মূল শিক্ষা হলো, আল্লাহ পাকের একত্ববাদ বা তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপন করা। যদি এ মৌলিক শিক্ষা কেউ গ্রহণ না করে তথা তৌহিদে বিশ্বাস না

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২১১-১২

করে তবে সে সারা জীবন যত ভাল কাজই করুক না কেন আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না। এ আয়াতে তাই সর্বপ্রথম তৌহিদের ঘোষণা রয়েছে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। এবাদতের যোগ্য শুধু আল্লাহ, আর কেউই নয়। কেননা তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিয্‌ক দাতা, তিনিই যথা সর্বস্বের অধিকর্তা। অতএব, এবাদত বন্দেগীর যোগ্য একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনই, আর কেউ নয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাকের তৌহিদ সম্পর্কে বহু আয়াতে এমনি ঘোষণা রয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

(আল্লাহ পাক সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই।) আরো এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّنِیْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ

"নিশ্চয় আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নাই। অতএব, তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী কর এবং আমার স্মরণের জন্যে নামাজ কায়েম কর"।

এ আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের তৌহিদের ঘোষণা রয়েছে। এরপর আল্লাহ পাক সুবিচার কায়েম করার কথা ঘোষণা করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

لَیَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ لَا رَیْبَ فِیْهِ

নিশ্চয় তিনি তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন। এ দিন সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তোমাদের সকলকে আল্লাহ পাক অবশ্য অবশ্যই কবর থেকে বের করে কেয়ামতের ময়দানে একত্রিত করবেন।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ ঐ দিনকে কেয়ামতের দিন বলা হয় এজন্যে যে, সেদিন সমস্ত মানুষ তাদের কবর থেকে বের হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে দণ্ডায়মান হবে। এর অন্য একটি কারণও বলা হয়েছে, যেহেতু মানুষ সেদিন জীবনের যাবতীয় কর্মের হিসাব দেয়ার জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে দণ্ডায়মান হবে। আর এ দিনের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

فَمَا لَكُمْ فِی الْمُنٰفِقِیْنَ فِئَتَیْنِ

শানে নুযুল

বোখারী শরীফে হযরত যায়েদ এবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা শরীফ থেকে ওহোদের রণাঙ্গনের দিকে গমন করেন তখন কিছু সংখ্যক মুনাফেক লোক পথ

থেকে মদীনা শরীফ ফিরে যায়। তারা জেহাদ থেকে বিরত থাকে। এদের সম্পর্কে মোমেনদের মধ্যে দ্বিমত হলো। এক দলের ধারণা ছিল, এদের সঙ্গে লড়াই করা উচিত। কেননা এরা মুনাফেক। আর অন্য দলের ধারণা ছিল যে, তাদের সঙ্গে লড়াই করা উচিত হবে না। কেননা, তারা ঈমানের দাবীদার তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

হযরত সা'দ এবনে মাআজ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। তিনি এরশাদ করলেনঃ যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিচ্ছে এবং নিজের ঘরে এমন লোককে একত্রিত করে যে আমাকে কষ্ট দেয় তার বিষয় সমাধা করার জন্যে কে আমাকে সাহায্য করবে? হযরত সা'দ এবনে মাআজ (রাঃ) বললেন, যদি সে ব্যক্তি আওস গোত্রের হয় তাহলে আমরা তাকে হত্যা করবো, আর যদি সে খাজরাজ গোত্রের হয় তবে আপনি হুকুম দিলে আমরা হুকুম পালন করবো। একথা শ্রবণ করে হযরত সা'দ এবনে ওবাদা (রাঃ) দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেনঃ এবনে মা'আজ এটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আনুগত্য নয়। কেননা, তুমি জান এ ব্যক্তি তোমাদের গোত্রীয় নয়। এরপর হযরত উসায়েদ এবনে হোযায়ের (রাঃ) দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, এবনে ওবাদা, তুমি মুনাফেক। কেননা, মুনাফেকের সঙ্গে তোমার প্রীতির সম্পর্ক রয়েছে। এ মতভেদ দেখে মোহাম্মদ এবনে মোসলমা দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নীরব হও, আমাদের মাঝে রয়েছেন স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনি আমাদেরকে যা আদেশ দেন তাই আমরা পালন করবো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, আরবের কিছু লোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে মদীনা মোনাওয়্যারায় হাযির হয়। কিন্তু তারা আবহাওয়ার বিভিন্নতার কারণে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়, তাদেরকে এজন্যে নিজস্ব এলাকায় ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। পথিমধ্যে কয়েকজন সাহাবীর সঙ্গে তাদের দেখা হয় এবং তারা তাদের প্রত্যাবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তারা বলে, আমরা মদীনা শরীফের মহামারীতে আক্রান্ত হই। তখন সাহাবায়ে কেরাম বলেন, তোমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তাবেদারী করোনি। কেননা, তিনিতো হিজরতের পর থেকে মদীনা শরীফে অবস্থান করছেন। অথচ তোমরা রোগের ভয়ে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করছো। যাহোক, তাদের সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের অভিমত দু' ধরণের হলো। কিছু লোক বললেন যে, এরা মুনাফেক হয়ে গেছে আর কিছু লোকের ধারণা মুনাফেক হয়নি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা বগবী (রঃ) মুজাহেদ (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, কিছু লোক মদীনায় আসলো, মুসলমান হলো, এরপর মুরতাদ হয়ে গেল (ধর্মত্যাগী হলো) এবং

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে মক্কা প্রত্যাবর্তন করে ব্যবসায়ের মালপত্র নিয়ে আসার অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভের পর তারা বিদায় হয়ে যায়। আর মক্কায় পৌঁছে সেখানে অবস্থান করে। তাদের সম্পর্কে মুসলমানদের মত বিভিন্ন রকম হলো। এক দলের মতে তারা মুনাফেক হয়ে গেছে। আরেক দল তাদেরকে মোমেন মনে করেছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলেমের মতে, ঘটনার বিবরণ এই যে, কোরায়শ বংশীয় কিছু লোক মদীনা শরীফে এসে মুসলমান হয়ে গেল। কিন্তু পরে প্রমোদ ভ্রমণকারীদের পন্থায় মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে গেল। যখন মদীনা শরীফ থেকে অনেক দূরে চলে গেল তখন তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামে চিঠি লিখলো যে, আমরা আমাদের সাবেক বিশ্বাসের উপরই রয়েছি। কিন্তু মদীনায় আমরা পেটের পীড়ার শিকার হয়েছি। আর আমাদের দেশে আসার প্রবল আকাঙ্খা প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এজন্যে আমরা চলে এসেছি। কিছুদিন পর তারা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ফিরে যায়। মুসলমানদের নিকট তাদের সংবাদ পৌঁছে। তখন কিছু লোক এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এদের সঙ্গে লড়াই করা উচিত এবং তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া উচিত। কেননা, তারা আমাদের ধর্মকে পরিত্যাগ করেছে। আর অন্যরা বললো, এমন সব লোক যারা তোমাদের ধর্মের উপরই রয়েছে অথচ নিজের বাড়ী-ঘর ছাড়েনি তাদের সাথে কিভাবে লড়াই করবে? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, এ লোকগুলো মক্কা শরীফেই ছিল, ইসলাম কবুল করেছিল তবে হিজরত করেনি। আর মুশরেকদেরকে সাহায্য করেছিল। তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদা (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন। আর যারা বলেছেন এ আয়াত নাযিল হয়েছে ওহোদের যুদ্ধে যেসব লোক অংশ গ্রহণ থেকে বিরত ছিল তাদের সম্পর্কে, তাদের ব্যাপারে মুসলমানদের মতবিরোধ হয়েছিল। একদল বলেছিল তারা কাফের হয়েছিল, আরেক দল বলেছিল কাফের হয়নি তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এ মত পোষণ করেছেন হযরত যায়েদ এবনে সাবেত (রাঃ)।

অন্য একটি অভিমত হলো এ আয়াত নাযিল হয়েছে সেসব লোকদের সম্পর্কে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, মুসলমানদের অর্থ সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে এবং সে অর্থ সম্পদ নিয়ে ইয়ামামা চলে গেছে। তখন মুসলমানগণ তাদের সম্পর্কে মতভেদ করেন। এ সময় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আর এ মত পোষণ করতেন একরামা (রঃ)।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮৯-৯০
২। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৯
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫ খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৬৮-৬৯

আয়াতের মর্মকথা

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে যদিও একাধিক মত রয়েছে যা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি তবে এ আয়াতের মর্মকথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট তাহলো হেদায়েত আল্লাহ্ পাকের হাতে, তিনি যাকে হেদায়েত করেন সে-ই হেদায়েত লাভ করে, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় রাখতে চান তাকে কেউ হেদায়েত করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ মুনাফেকদের যে দলটি ঈমান না এনেও ঈমানের দাবীদার ছিল, মুসলমানদের মজলিসে তাদের যাতায়াত ছিল অবাধ। মুসলমানদের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে তারা এ কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল। যখন মুসলমানগণ তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হলেন তখন এ প্রশ্ন উত্থিত হলো যে, এরা যখন খাঁটি মুসলমান নয় তখন তাদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করাই শ্রেয়। আর এক দল মুসলমান বললেন, তাদেরকে মুসলমানদের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে দাও, হয়তো এর বরকতে তারা ইসলাম কবুল করতেও পারে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের এ মতভেদের কথাই উল্লেখিত হয়েছে এবং এ পর্যায়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, হেদায়েত এবং গোমরাহী এক আল্লাহর হাতে। অতএব, মুনাফেকদের সম্পর্কে কর্তব্য নির্ধারণে তোমাদের দ্বিমত থাকা উচিত নয়।

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ
أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَ
اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا
نَصِيرًا ﴿٨٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ
أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ
يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

তরজমা

(৮৯) কাফেররা এ আকাঙ্খা করে যেন তোমরাও তাদের মত কাফের হয়ে যাও যেন তোমরাও (আল্লাহর নাফরমানীতে) তাদের সমান হয়ে যাও। অতএব, তোমরা

তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ তায়ালার রাহে হিজরত করে। তবুও যদি তারা না মানে তবে যেখানে তাদেরকে পাও ধর এবং তাদেরকে হত্যা কর। আর তাদের মধ্য থেকে কোন লোককে তোমরা বন্ধু এবং সহায়ক হিসাবে গ্রহণ করোনা।

(৯০) কিন্তু (তাদেরকে হত্যা করোনা) যারা এমন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে যাদের এবং তোমাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, অথবা যারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আসে যে, তোমাদের সাথে লড়াই করতে তাদের অন্তর বাধা প্রাপ্ত হয়, অথবা তাদের স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে সংকোচ করে। আর (তোমাদের একথা মনে রাখা উচিত যে) আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে তোমাদের উপর তাদেরকে শক্তিশালী করতে পারতেন তবে তারা নিশ্চয় তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতো, এরপর যদি তারা তোমাদের নিকট থেকে দূরে সরে থাকে ও তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে শান্তি রক্ষা করে তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোন পন্থা দেননি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ

অর্থাৎ তোমরা কি এ আকাঙ্খা কর যে, এমন লোককে হেদায়েত করবে যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করে রেখেছেন। অর্থাৎ তাদেরকে হেদায়েত করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে তাদেরকে হেদায়েত করার তো প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, তারা গোমরাহীতে এতদূর এগিয়ে গেছে যে, তারা মনে মনে এ আকাঙ্খা করে যে, 'তোমরাও যেন তাদের মত কাফের হয়ে যাও। তোমরাও যেন তাদের মত ঈমান পরিত্যাগ করে বেঈমান ও কাফেরে পরিণত হও'। অতএব, কিভাবে তোমরা তাদের হেদায়েতের আকাঙ্খা করতে পার? এখন তাদের ব্যাপারে তোমাদের নীতি নির্ধারণে কোন প্রকার দ্বিমত থাকা উচিত নয়।

তোমাদের সবার জন্যে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের নির্দেশ হলো, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সে ঈমান বা বিশ্বাসের দাবী অনুসারে তারা হিজরত করে তোমাদের নিকট না আসে সে পর্যন্ত তাদের সাথে কোন প্রকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা চলবে না। যেমন এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতেও এরশাদ করেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ

"(অর্থাৎ) হে মোমেনগণ! তোমরা আমার শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা"। অন্য আয়াতে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ

"হে মোমেনগণ! তোমরা ইহুদী এবং নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না"।

আলোচ্য আয়াতখানি নিঃসন্দেহে এ আয়াত সমূহের অনুরূপ, যারা মুশরেক, কাফের মুনাফেক মুসলমানগণ যেন তাদের সথে বন্ধুত্ব না করে। তবে এর জন্যে একটি শর্তারোপ করা হয়েছে। যদি তারা প্রকৃত ঈমান আনে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে হিজরত করে অর্থাৎ দুনিয়ার কোন লাভ-লোভে নয়, বরং শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যারা হিজরত করে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে পারে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ হিজরত তিন প্রকারঃ

১. ইসলামের শুরুতে মুসলমানগণ মক্কা শরীফে থেকে যে হিজরত করেছিলেন।

২. মুজাহেদগণের হিজরত অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হয়ে যারা জেহাদের জন্যে বের হয়েছিলেন।

৩. মুসলমানগণ যখন আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করে তাকেও এক প্রকার হিজরত বলা হয়।

فَاِنْ تَوَلَّوْا

অর্থাৎ যদি তারা ঈমান আনার পর ইসলাম থেকে অথবা হিজরত করা থেকে বিমুখ হয়,

فَخُذُوْهُمْ

তবে তাদেরকে বন্দী কর। কাফেরদের মত এদেরকেও যেখানে পাও হত্যা কর, এদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা। এমনকি, এদের কারো কাছ থেকে কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করোনা। ইমাম জুহরী বর্ণনা করেছেনঃ যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওহোদের রণাঙ্গনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে পিছু টান দেয়। তখন সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন যে, এসব ইহুদীদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি রয়েছে আমরা কি তাদের নিকট থেকে সাহায্য নিতে পারি?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ ওরা খবিস, ওদের সাহায্যের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ

অর্থাৎ- দুটি কারণে এ নীতির পরিবর্তন হতে পারবে।

১. যেসব সম্প্রদায় তোমাদের (মুসলমানদের) সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ রয়েছে তারাও যদি সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ থাকে।

২. যদি তাদের অবস্থা এই হয় যে, তারা তোমাদের সঙ্গে এবং তাদের স্ব-জাতির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে প্রস্তুত না হয় তথা যুদ্ধে তাদের মন যদি সাড়া না দেয়।

তোমাদের বিরুদ্ধে বা তোমাদের হয়ে স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নয় বলে যদি তারা তোমাদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চায় এবং এ মর্মে আবেদন করে তবে তাদের এমন আবেদন মঞ্জুর করে লও।

আর একথাও মনে রেখো, যুদ্ধ বিরতি ও শান্তি প্রস্তাব যা তাদের তরফ থেকে আসে তা মূলতঃ তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত এবং দান। আল্লাহ পাকই তাদের মনকে প্রভাবান্বিত এবং শঙ্কিত করে দিয়েছেন। ফলে তারা তোমাদের নিকট শান্তির প্রস্তাব পেশ করতে বাধ্য হয়েছে। প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতে পারতেন। তখন তোমাদের কি অবস্থা হতো, তা চিন্তা করে দেখ।

আলোচ্য আয়াতে একথা বলা হয়েছে- "তোমাদের সঙ্গে যে সম্প্রদায়ের শান্তি চুক্তি রয়েছে যদি তারাও এমন শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে"। এর ব্যাখ্যায় আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে 'কওম' শব্দ দ্বারা যে সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তাহলো বনী আসলাম গোত্র। ঘটনার বিবরণ হলো, এ গোত্রের হেলাল এবনে ওয়াইমের আসলামীর মক্কা যাওয়ার পূর্বে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এ মর্মে চুক্তি হয়েছিল যে, হেলাল হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করবে না এবং তাঁর বিরুদ্ধে ইসলামের দুশমনদেরকে সাহায্য করবে না (তথা সে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে) আর তার গোত্রের বা অন্য কোন গোত্রের কেউ যদি হেলালের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে তবে সেও হেলালের মতই নিরাপত্তার সুযোগ লাভ করবে (অর্থাৎ তাকে গ্রেফতার করা হবে না এবং হত্যাও করা হবে না)।

এবনে আবি হাতেম মুজাহেদ (রঃ) থেকে এ বিবরণ পেশ করেছেন। এবনে আবি হাতেম এবং এবনে মরদবিয়া হাসানের (রঃ) সূত্রে লিখেছেন যে, সোরাকা

এবনে মালেক বর্ণনা করেন, যখন বদর এবং ওহোদের যুদ্ধের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এক বিরাট প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হলো এবং চারপাশের লোকেরা ইসলাম কবুল করলো তখন আমি জানতে পারলাম যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ এবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-কে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আমার সম্প্রদায় বনী মোদরাজ গোত্রের নিকট প্রেরণ করার ইচ্ছা করেছেন, তখন আমি অনতিবিলম্বে দরবারে নববীতে হাযির হলাম এবং আরয করলাম, আমি জানতে পেরেছি যে আপনি খালেদ এবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-কে আমার সম্প্রদায় বনী মোদরাজের নিকট প্রেরণ করার ইচ্ছা করেছেন।

আমার সম্প্রদায়ের উপর ইতিপূর্বে আপনি যে এহসান করেছেন তার উল্লেখ করে আরয করতে চাই যে, আমার সম্প্রদায়কে দয়া করে বর্তমান অবস্থায় থাকতে দিন। যদি আপনার সম্প্রদায় (কোরায়শ) ইসলাম কবুল করে তবে আমার সম্প্রদায়ও মুসলমান হবে। আর যদি আপনার সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ না করে তবে আমার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন আশঙ্কা নেই। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ এবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-এর হাত ধরে এ নির্দেশ দেন যে, এর সঙ্গে যাও এবং সে যা চায় তাই কর। হযরত খালেদ এবনে ওয়ালীদ (রাঃ) বনী মোদরাজ গোত্রের নিকট গমন করলেন এবং তাদের সঙ্গে এই শর্তে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন যে, বনী মোদরাজ গোত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না। যদি কোরায়শ ইসলাম গ্রহণ করে তবে তারাও মুসলমান হবে। এই সময় আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ

(অর্থাৎ যারা এমন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে যাদের এবং তোমাদের মধ্যে অঙ্গীকার রয়েছে।)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর যে কেউ বনী মোদরাজ গোত্রের নিকট গমন করতো, তাকে সে গোত্রের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হতো এবং তার সঙ্গেও শান্তি চুক্তি আছে বলে বিবেচনা করা হতো।

এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতখানি হেলাল এবনে ওয়াইমের আসলামী এবং সোরাকা এবনে মালেক মোদরাজী এবং বনী খোদামা এবনে আসের এবনে আবদে মনাফ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

যাহ্যাক হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে যে সম্প্রদায়ের সঙ্গে শান্তি চুক্তি রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলো বনী বকর। এবনে যায়েদ এবং মোকাতেল বলেছেন, এরা হলো বনী খাজাআহ।[১]

أَوْجَآءُوكُمْ

অথবা তারা যদি তোমাদের নিকট আসে আর এমন অবস্থায় আসে যে, তোমাদের সাথে অথবা নিজেদের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে তারা প্রস্তুত নয়। যেহেতু তোমাদের সাথে তাদের চুক্তি রয়েছে সেজন্যে তারা লড়াই করতে চায় না। আর তোমাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে কোরায়শের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে চায় না। কেননা, কোরায়শ তাদের নিজেদেরই সম্প্রদায়।

বস্তুতঃ এরাই হলো বনী মোদরাজ গোত্র। তারা নিরপেক্ষ থাকার অঙ্গীকার করেছিল। যেসব ধর্মত্যাগী তাদের নিকট আশ্রয় নেয় তাদের সঙ্গে লড়াই না করার নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ

যদি তারা তোমাদের নিকট থেকে দূরে থাকে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব পেশ করে তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন কর্মসূচী গ্রহণের পথ আল্লাহ পাক রাখেননি অর্থাৎ হত্যা করার অনুমতি দেননি।

ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। আলোচ্য আয়াতে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার তাদেরকে গ্রেফতার বা হত্যা না করার নির্দেশ রয়েছে তারা কি কাফের না মোমেন? অতঃপর তিনি এ প্রশ্নের জবাব দিয়ে বলেছেন তারা কাফের। এ প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হলো পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক যদিও কাফেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন কিন্তু কোন কাফের সম্প্রদায় যদি মুসলমানদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে অথবা মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করার ইচ্ছা পোষণ না করে তবে তাদের সঙ্গে লড়াই না করার নির্দেশ রয়েছে।

আবু মুসলিম আল ইসপাহানী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন আল্লাহ পাক প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি হিজরত করা অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯২
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০৯
তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২২২

তখন যারা কোন বিশেষ অসুবিধার কারণে হিজরত করতে অক্ষম হয়েছে তাদের সম্পর্কে এ হিজরতের আদেশ শিথিল করা হয়েছে। যেমন হিজরতের পথে যদি কাফেররা থাকে এবং হিজরতের সময় তাদের তরফ থেকে ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা থাকে এমন অবস্থায় মুসলমানদের কর্তব্য হলো এমন সম্প্রদায়ের কাছে চলে যাওয়া যাদের সঙ্গে মুসলমানদের শান্তি চুক্তি রয়েছে, আর ততদিন পর্যন্ত তাদের নিকট থাকা যতদিন কাফেরদের জুলুম থেকে আত্মরক্ষা করার প্রয়োজন হয়। এরপর আল্লাহ পাক সেই সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এমন অবস্থায় হাযির হয় যে, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে লড়াই করতে চায় না। কেননা তারা আল্লাহকে ভয় করে। আর কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করতে চায় না, কেননা, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন অথবা তাদের কারো পরিবারবর্গ কাফেরদের নিকট রয়েছে। যদি কাফেরদের সঙ্গে তারা লড়াই করে তবে কাফেররা তাদের সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করবে। যাহোক আলোচ্য দুটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে লড়াই না করার নির্দেশ রয়েছে যারা হিজরত করেনি এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইও করেনি।[১]

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا
رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ
يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾

তরজমা

(৯১) তোমরা অনতিবিলম্বে এমন কিছু লোক পাবে যারা তোমাদের সাথে ও তাদের সম্প্রদায়ের সাথে শান্তি রক্ষা করে থাকতে ইচ্ছা করবে। যখনই তাদেরকে অশান্তির দিকে ফেরত আনা হয় তখন তারা তাতেই লিপ্ত হয়। অতএব, যদি এসব লোক তোমাদের নিকট থেকে দূরে থাকতে না চায় এবং তোমাদের সাথে শান্তি রক্ষা করতেও প্রস্তুত না হয় এবং তোমাদের উপর অত্যাচার থেকে স্বীয় হস্ত সংবরণ না করে তবে তাদেরকে ধর এবং যেখানেই পাও হত্যা কর, আর আল্লাহ পাক এদের উপর তোমাদেরকে প্রকাশ্যে ক্ষমতা দান করেছেন।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২২৪

তফসীরুল কোরআন

কালবী (রঃ) আবু সালেহের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বনী আসাদ এবং বনী গাতফান গোত্রের লোকেরা মদীনা শরীফে বসবাস করতে শুরু করে। লোক দেখানোর জন্যে তারা কলেমা পাঠ করতো এবং সর্বত্র নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আদৌ মুসলমান ছিল না। তাদের কাউকে যদি তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা জিজ্ঞাসা করতো যে, তুমি কেন মুসলমান হয়েছ? তখন তারা বলতো বানর এবং বিচ্ছুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষর্থে ঈমান এনেছি। অথচ যখন সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে সাক্ষাত হতো তখন বলতো আমরাতো আপনাদের ধর্মের উপরই আছি। এ দ্বিমুখী নীতির উদ্দেশ্যে হলো দুদিক থেকে নিরাপত্তা লাভ করা অর্থাৎ মুসলমানদের নিকট মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিলে, মুসলমানদের ব্যাপারে আর কোন আশঙ্কা থাকে না। ঠিক এমনিভাবে কাফেরদের কাছে যখন তারা যায় তখন কাফেরদের কথাই বলে শুধু তাই নয়; বরং যখন তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আহবান জানান হয় তখন তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে।[১] তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا

অর্থাৎ যখনই তাদেরকে ফেৎনার দিকে ফেরানো হয় তখন তারা ফেৎনার দিকে ফিরে যায়।

বস্তুতঃ এরা সেসব লোক যে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি ও নিরাপত্ত চুক্তি করা সত্ত্বেও সুযোগ পাওয়া মাত্রই তারা সর্বপ্রকার চুক্তি ভঙ্গ করে এবং শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে অস্ত্র ধারণ করে। অতএব, তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো এই,

فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ

যদি যুদ্ধ থেকে বিরত না হয় এবং শান্তি প্রস্তাব মেনে না নেয় এবং তোমাদের প্রতি জুলুম ষড়যন্ত্র থেকে বিরত না হয় তবে তাদেরকে ধর এবং যেখানে পাও হত্যা কর।

وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ

এরা সেসব লোক যাদেরকে কোন অবস্থাতেই রেহাই দেয়া যাবে না। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দলিল প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। তাদের শত্রুতা সুস্পষ্ট,

---

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯২-৯৩
তফসীরে কবীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২২৫

মুসলমানদেরকে প্রতারণা করা, তাদের কাফের হওয়া, আর ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। অতএব, আল্লাহ্ পাক তাদের জান-মালে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তোমাদেরকে দান করেছেন।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا
خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ
إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

তরজমা

(৯২) এবং কোন মোমেনের উচিত নয় যে, অন্য মোমেনকে হত্যা করে, কিন্তু ভুলবশতঃ এবং যে ব্যক্তি কোন মোমেনকে ভুলবশতঃ হত্যা করবে তাকে একটি মুসলিম গোলাম আজাদ করতে হবে, এবং যদি নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনগণ ক্ষমা না করে তবে তাদেরকে (দিয়ত) হত্যা-বিনিময় দিতে হবে। অতঃপর যদি সে তোমাদের শত্রুদলের অন্তর্ভুক্ত হয় কিন্তু নিহত ব্যক্তিটি মুসলমান হয় তবে মুসলিম গোলাম আজাদ করতে হবে এবং যদি নিহত ব্যক্তিটি এমন দলের লোক হয় যাদের মধ্যে তোমাদের মধ্যে চুক্তি আছে তবে হত্যা-বিনিময় নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে দিতে হবে এবং একটি মুসলিম গোলাম আজাদ করতে হবে। কিন্তু যদি কেউ মুসলিম গোলাম আজাদ করার সামর্থ না রাখে তবে আল্লাহ্ তায়ালার দরবার থেকে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্যে একাধারে দু' মাস রোজা রাখতে হবে। আর আল্লাহ্ পাক সর্বজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেনঃ ইয়াশ এবনে রবীয়া মাখযুমী (আবু জাহেলের মায়ের দিকের ভাই) হিজরতের পূর্বে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে মুসলমান হন। এরপর তাঁর দুশ্চিন্তা হয় যে, আমার মুসলমান হওয়ার খবর আমার পরিবারের নিকট গোপন থাকবে না। তাই তিনি পলিয়ে মদীনা শরীফ চলে আসেন এবং সেখানে পৌঁছে পাহাড়ের উপরে একটি গর্তের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখলেন। এদিকে ইয়াশ চলে যাওয়ায় তাঁর মাতা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং নিজের দু' পুত্র আবু জাহেল ও হারেসকে বললো, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যতক্ষণ না তোমরা ইয়াশকে এনে দেবে ততক্ষণ আমি পানাহার করবো না। এমনকি কোন ছাদের নীচেও যাব না, ঘরেও প্রবেশ করবো না। মায়ের শপথ শ্রবণ করে তারা উভয়ে ইয়াশের খোঁজে বের হয়ে পড়ে। হারেস এবনে যায়েদ এবনে আমেরী তাদের সঙ্গী হলো। ইয়াশের নিকট তারা পৌঁছে দেখে যে, সে পাহাড়ের উপর দুর্গে আবদ্ধ রয়েছে। তাকে বলা হয়, তুমি নীচে চলে আস। তোমার বিরহে তোমার মাতা কাতর হয়ে পড়েছে এবং শপথ করেছে যে, যতক্ষণ তোমাকে না দেখবে ততক্ষণ পানাহার করবে না, গৃহেও প্রবেশ করবে না। আমরা শপথ করে বলেছি যে, তোমাকে কোন বিষয়ে আমরা বাধ্য করবো না। তোমার ধর্মের ব্যাপারে আমরা তোমাকে বিরত রাখবো না। ইয়াশ তার মায়ের দুর্গতির কথা শ্রবণ করে গর্ত থেকে বের হয়ে আসে। এরপর তাঁকে মদীনা শরীফের বাইরে এনে তারা বেঁধে ফেলে এবং তার উপর দৈহিক নির্যাতন চালায়। এরপর তাকে তার মায়ের নিকট পৌঁছে দেয়। মা তাকে দেখে পুনরায় শপথ করে বলে, যে পর্যন্ত তুমি সে বিষয়ে অস্বীকার করবে যার প্রতি বিশ্বাস করেছ- সে পর্যন্ত আমি তোমার বন্ধন খুলবো না। এরপর তাকে বাঁধা অবস্থায় তপ্ত রৌদ্রে ফেলে রাখে এবং যতক্ষণ আল্লাহর মর্জি ছিল সে অবস্থায়ই পড়েছিল। অবশেষে কাফেরা যা চেয়েছিল তাই ইয়াশ করে ফেললো, তখন তার বন্ধন খুলে দেয়া হলো। এমন সময় হারেস এবনে যায়েদ হাযির হলো এবং বললো, ইয়াশ এতটুকুই কথা ছিল যার প্রতি তুমি ঈমান এনেছিলে? অর্থাৎ তোমার ঈমানের এতটুকুই শক্তি ছিল যা সামান্য কষ্টের কারণে তুমি পরিত্যাগ করলে? যা তুমি অবলম্বন করেছিলে তা যদি হেদায়েত থাকে তবে তুমি হেদায়েত বর্জন করেছ, আর যদি তা পথভ্রষ্টতা হয় তবে তুমি এতদিন পথভ্রষ্ট ছিলে। হারেসের একথায় ইয়াশ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললো, আল্লাহর শপথ! যদি তোমাকে আমি একা পাই তবে হত্যা না করে ছাড়বো না। কিছু দিন পর ইয়াশ পুনরায় মুসলমান হলো এবং মক্কা শরীফ ছেড়ে মদীনা শরীফ চলে গেল। কিছু দিন পর হারেস এবনে

যায়েদও মুসলমান হলো এবং হিজরত করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়। হারেস যখন সেখানে পৌঁছল ইয়াশ তখন সেখানে ছিল না, আর হারেসের মুসলমান হওয়ার খবরও সে পায়নি। কোবা নামক স্থানে একদিন হারেসের সঙ্গে ইয়াশের দেখা হলো, ইয়াশ সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করলো। লোকেরা বললো, তুমি একি করলে? হারেসতো মুসলমান হয়েছিল। একথা শ্রবণ করা মাত্রই ইয়াশ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমার এবং হারেসের এ ঘটনা ঘটেছে (যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে)। আর আপনি অবগত রয়েছেন যে, সে যে মুসলমান হয়েছে সে কথা আমি মোটেই জানতাম না, এ অজানা অবস্থায় আমি তাকে হত্যা করেছি।

এবনে জরীর একরামার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হারেস এবনে যায়েদ এবনে আমেরী আবু জাহেলের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ইয়াশকে নির্যাতন করতো। পরবর্তীতে হারেস ইসলাম গ্রহণের পর মদীনা শরীফ চলে আসে। "হাররা" নামক স্থানে তারা একত্রিত হয়। ইয়াশ ভেবেছিল, হারেস এখনও কাফের রয়েছে। তাই সে তরবারি দ্বারা তাকে হত্যা করে। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করে। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে এ ঘটনা সহ আরো দু'টি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ওরওয়া এবনে যোবায়ের বর্ণনা করেন, হোজায়ফা এবনুল ইয়ামান (রাঃ) ওহোদেরর যুদ্ধের দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু মুসলমানগণ ভুলবশতঃ তাঁর পিতা আলী আমানকে কাফের ভেবে হত্যা করে ফেলেন, যদিও হযরত হোজায়ফা (রাঃ) চিৎকার করে "আমার পিতা", "আমার পিতা" বলেছিলেন কিন্তু তখন কেউ তা বুঝতে পারেনি। ফলে হযরত হোজায়ফা (রাঃ)-এর পিতা ওহোদের যুদ্ধে নিহত হন। হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ ঘটনা শ্রবণ করেন তখন তাঁর নিকট হযরত হোজায়ফা (রাঃ)-এর মর্তবা অনেক বৃদ্ধি পায়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, এ আয়াত নাযিল হয় হযরত আবু দারদা (রাঃ) সম্পর্কে। তিনি একটি জেহাদে শরীক হয়েছিলেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) একজন কাফেরের উপর হামলা করে তরবারি উঁচু করে আঘাত করেছিলেন। ঠিক এমন

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯৪-৯৫

সময় সে কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করে ফেললো। কিন্তু এরই মধ্যে তরবারি তার কাজ করে ফেলেছে। লোকটি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু হযরত আবু দারদা (রাঃ) বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, লোকটি প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যেই হয়তো কলেমা পাঠ করেছে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তুমি কি তার বুক চিরে দেখেছিলে? ঐ সময় হযরত আবু দারদা (রাঃ) অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতে ভুলবশতঃ কোন মুসলমানকে হত্যা করা হলে সে সম্পর্কে বিধি-নিষেধ এরশাদ হয়েছে। কোন মুসলমানকে হত্যা করা মুসলমানদের শান এবং বৈশিষ্ট্যের খেলাপ। এটি ঈমান বিরোধী কাজ। এমনকি হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন মুসলমান মুসলমান থাকা অবস্থায় অন্য মুসলমানকে হত্যা করে না; অর্থাৎ এটি ঈমান বিরোধী কাজ এবং মহা পাপ। এতদসত্ত্বেও এমন ঘটনা ঘটে গেলে কি করণীয় তা এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে। ভুলবশতঃ হত্যা করার বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে। যেমন শিকারকে লক্ষ্য করে গুলি করা হলো কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মুসলমান নিহত হলো।

অথবা কাফেরদের মধ্যে থাকার কারণে মুসলমানকেও কাফের ভেবে হত্যা করা হলো। জেহাদের সময় এমনি হত্যার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশী। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে দু'টি নির্দেশ রয়েছেঃ

১. আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এ অনিচ্ছাকৃত পাপ কার্যের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া এবং এ উদ্দেশ্যে একজন মুসলমান গোলাম আজাদ করা।

২. নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে দিয়ত তথা রক্ত-পণ আদায় করা, যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশরা দিয়ত মাফ করে দেয় তবে তা মাফ হবে অন্যথায় 'দিয়ত' অবশ্যই আদায় করতে হবে।

এ পর্যায়ে ফকীহগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নিহত মুসলমানের অবস্থার বিভিন্নতার কারণে দিয়ত বা কাফ্‌ফারার তারতম্য হবে। যে ব্যক্তি নিহত হলো দেখতে হবে তার ওয়ারিশগণ কি মুসলমান না অমুসলমান, যদি অমুসলমান হয় তবে আবার দেখতে হবে তাদের সঙ্গে সন্ধি রয়েছে কি-না। যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২২৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫ খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৭০-৮০
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১২

মুসলমান হয় অথবা অমুসলিম হলেও মুসলমানদের সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে তবে তাদেরকে দিয়ত অবশ্যই দিতে হবে। কেননা, এক্ষেত্রে দিয়ত ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ অমুসলিম শত্রু হয় তবে দিয়ত দিতে হবে না। তবে গোলাম আজাদ করতে হবে। কিন্তু যদি গোলাম আজাদ করার সামর্থ না থাকে তবে হত্যাকারীকে দু' মাস যাবত একাধরে রোজা রাখতে হবে।

দিয়তের পরিমাণ

আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) তাঁর রচিত 'ফাওয়ায়েদে ওসমানী' গ্রন্থে লিখেছেনঃ ইংরেজ আমলের টাকার হিসেবে হানাফী মাজহাব মোতাবেক দিয়তের পরিমাণ হবে প্রায় ২,৭৪০.০০ টাকা। নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের বিভিন্ন কিস্তিতে ৩ বছরে এ অর্থ আদায় করতে পারবে। এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ইংরেজ আমলে টাকার যে মান ছিল তা এখন অচিন্তনীয়। তাই বর্তমান অবস্থায় প্রেক্ষিতে দিয়তের পরিমাণ অতি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাবে।

যদিও কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, এ যুগে ২,৭৪০ ভরি রূপার মূল্য হবে উক্ত দিয়তের পরিমাণ কিন্তু এ পর্যায়ে এটি শেষ কথা হতে পারেনা কেননা, এ পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে অনেক কিছুই অহরহ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

অতএব, দিয়তের পরিমাণ নির্ধারিত হবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে। অবশ্য ইংরেজ আমলে উল্লেখিত অংককে মান হিসেবে গ্রহণ করে সে অনুযায়ী দিয়তের পরিমাণ নিদৃষ্ট করা যেতে পারে।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে মুসলমান আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং আমার রেসালতের সাক্ষ্য দেয় তার জন্যে কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়, শুধু তিনটি অবস্থায় তা বৈধ হতে পারেঃ

১. যদি সে ব্যক্তি কোন লোককে হত্যা করে থাকে,

২. বিবাহিত ব্যক্তি যদি ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়,

৩. ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে যদি কেউ মুরতাদ হয়ে যায়।

তবে লক্ষনীয় বিষয় এই, যদি এ তিনটি গর্হিত কাজের কোন একটি কারো দ্বারা হয়ে যায় তবে সে ব্যক্তিকে হত্যা করা সাধারণ মানুষের এখতিয়ারভুক্ত নয়, বরং বিচারালয়ে তথা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

অর্থাৎ আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, তিনি খুব ভাল ভাবেই জানেন যে, হত্যাকারীর কোন ইচ্ছা হত্যা কার্যে ছিল কি-না আর তিনি বিজ্ঞানময়। তাই তিনি ভুলবশতঃ যে পাপ কার্য হয়েছে তার জন্যে শাস্তি বিধান করেন না, শাস্তি হয় তখন যখন মানুষ ইচ্ছাকৃত অন্যায় করে।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا
وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿٩٣﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْۤا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰۤى
اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؗ فَعِنْدَ اللّٰهِ
مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۚ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٩٤﴾

তরজমা

(৯৩) এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে কোন মোমেনকে হত্যা করবে তার শাস্তি দোযখ। সে তাতে চিরদিন থাকবে, আল্লাহ পাক তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তার প্রতি লা'নত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করেছেন।

(৯৪) হে মোমেনগণ! যখন তোমরা আল্লাহর রাহে জেহাদ কর তখন সকল বিষয় উত্তমরূপে অনুসন্ধান করে কাজ কর এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে (স্বীয় ইসলাম প্রকাশ করে) তাকে বলোনা যে, তুমি মুসলিম নও, তোমরা কি এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ধন-সম্পদ চাও? তবে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রচুর পরিমাণে গনিমতের মাল রয়েছে, তোমরাও ইতিপূর্বে তাদের মত ছিলে (অর্থাৎ কাফের ছিলে) পরে আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন (অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার তৌফিক দান করেছেন)। অতএব, উত্তমরূপে অনুসন্ধান করে কাজ কর। নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে খবর রাখেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ভুলবশতঃ কোন মোমেনকে হত্যা করার শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে, আর এ আয়াতে ইচ্ছাকৃত কোন মুসলমানকে হত্যা করার শাস্তির বিবরণ রয়েছে। অবশ্য এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কোন মোমেনকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করলে তার যে শাস্তি আখেরাতে হবে তারই বিবরণ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। দুনিয়াতে আততায়ীর যে শাস্তি হবে তার বিবরণ রয়েছে সূরা বাকারায় ক্বেসাস সম্পর্কীয় আয়াতে।

শানে নুযুল

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, মোকাইয়াস এবনে যাবাবাহ কানদী এবং তার ভাই হেশাম মুসলমান হয়েছিল। একদিন মোকাইয়াস বনী নাজ্জার মহল্লায় তার ভাই হেশামের লাশ দেখতে পেলো। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মোকাইয়াসের সঙ্গে বনী ফাহর গোত্রের এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন এবং বনী নাজ্জারের লোকদেরকে এ সংবাদ দেয়ার নির্দেশ দিলেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হুকুম হলো, যদি তোমরা হেশামের ঘাতক কে তা জান তবে তাকে মোকাইয়াসের হাতে তুলে দাও যেন সে তার ভাইয়ের ক্বেসাস নিতে পারে। আর যদি ঘাতক কে তোমরা না জান তবে হেশামের দিয়ত আদায় কর। ফাহরী নামক এ ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাণী বনু নাজ্জার গোত্রকে পৌঁছে দেয়। তারা জবাবে বলে, আল্লাহর রসূলের আদেশ শিরোধার্য। হেশামের ঘাতক কে তা আমরা জানি না তবে আমরা দিয়ত আদায় করে দেব। তারা মোকাইয়াসকে একশত উট দিয়ে দেয়। মোকাইয়াস এবং ফাহরী বনী নাজ্জারের মহল্লা থেকে প্রত্যাবর্তন করলো। এদিকে মোকাইয়াসকে শয়তান পথভ্রষ্ট করলো। সে ধারণা করলো, আমি যদি দিয়ত (রক্তপণ) নিয়ে বসে পড়ি তবে তা অত্যন্ত অপমানজনক ব্যাপার। অতএব উত্তম হলো আমি বনি ফাহর গোত্রের এ ব্যক্তিকে হত্যা করি। যাতে করে প্রাণের বদলা প্রাণ হয়ে যায়, আর দিয়ততো বাড়তি লাভ রইলই। তাই মোকাইয়াস ফাহরীকে প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা করলো। এরপর উটের উপর আরোহন করে সমস্ত উটগুলো সঙ্গে নিয়ে মক্কা গমন করে এবং মুরতাদ হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১৫
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২১৫

এ ঘটনা বর্ণনার পর আল্লামা আলুসী (রঃ) আহমদ এবং নেসায়ী সংকলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত মাবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ পাক হয়তো সব গুনাহ মাফ করবেন কিন্তু যে ব্যক্তি কাফের অবস্থায় মারা যায় অথবা কেউ যদি ইচ্ছা করে কোন মোমেনকে হত্যা করে (অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদেরকে মাফ করবেন না)।

এবনুল মুনজের হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এমনি হাদীস সংকলন করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি কেউ কোন মুসলমানের হত্যার ব্যাপারে অর্ধেক বাক্য দ্বারাও সহযোগিতা করে তবে কেয়ামতের দিন সে আল্লাহ পাকের দরবারে এভাবে হাযির হবে যে, তার কপালে লিপিবদ্ধ থাকবে– "এ ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অন্য হাদীসে এরশাদ করেছেনঃ যদি আসমান জমিনের সমস্ত লোক একজন মোমেনের হত্যায় শরীক হয় তবে আল্লাহ পাক সকলকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যে কোন মোমেনকে ইচ্ছা করে হত্যা করে তার তওবা কবুল হয়না। এবনে যোবায়ের (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি বললেন আলোচ্য আয়াতই শেষ আয়াত যাকে কোন আয়াত মনসুখ করেনি।

আবুল যা'আদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, জীবনের শেষ দিনগুলোতে যখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, আমরা তখন তাঁর নিকট বসেছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট হাযির হলো এবং উচ্চস্বরে তাঁকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে কোন মোমেনকে হত্যা করে তবে তার সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, তার শাস্তি হলো দোযখ। সে তাতে চিরদিন থাকবে। তার প্রতি আল্লাহর গজব এবং আল্লাহর লা'নত, আর তার জন্যে কঠিন-কঠোর শাস্তি তৈরী আছে। ঐ ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো, যদি আততায়ী তওবা করে এবং নেক আমল করে এবং হেদায়েত মতে জীবন যাপন করে?

তখন তিনি বললেনঃ তার মাতা তার জন্যে ক্রন্দন করুক তার তওবা এবং হেদায়েত কোথায়? সেই আল্লাহর শপথ যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, আমি তোমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শ্রবণ করেছি, তার

মাতা তার জন্যে ক্রন্দন করুক, যে কোন মোমেনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে কেয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি তার ঘাতককে আল্লাহ পাকের আরশের সম্মুখে ধরে নিয়ে আসবে আর তার ধমনী থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে, আর সে আল্লাহ পাকের দরবারে আরযী পেশ করে বলবেঃ হে আল্লাহ! এ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন, সে কেন আমাকে হত্যা করেছে?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আরো বলেন, সেই আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! এ আয়াত নাযিল হবার পর এ আয়াত মনসুখকারী কোন আয়াত নাযিল হয়নি।

আর অন্য বর্ণনায় রয়েছে, "আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরে কোন ওহী নাযিল হবে না"।

হযরত যায়েদ এবনে সাবেত (রাঃ), হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ), হযরত আবু সালমা এবনে আবদুর রহমান (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতই পোষণ করতেন।

বিখ্যাত মোফাচ্ছের কাতাদা এবং যাহ্যাকও আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় একথাই বলেছেন।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا

অর্থাৎ যে কোন মুসলমানকে ইচ্ছা করে হত্যা করে তথা মুসলমানকে মুসলমান হওয়ার কারণে হত্যা করে অথবা এর অর্থ হলো কোন মুসলমানকে হত্যা করা হালাল মনে করে হত্যা করে।

فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ

(তবে তার শাস্তি হলো দোযখ এবং সে দোযখে চিরদিন থাকবে।)

যেহেতু সে ঈমানের সাথে শত্রুতা রাখে অথবা মোমেনকে হত্যা করা বৈধ মনে করে এজন্যে নিঃসন্দেহে সে কাফের। আর যে কাফের চিরকাল দোযখে বাস করাই তার অনিবার্য শাস্তি। আলোচ্য আয়াতে "খুলদ" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ চিরকাল। তবে ক্ষেত্রবিশেষ এ শব্দটি সুদীর্ঘ কাল অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا

অর্থাৎ যে কোন মোমেনকে হত্যা করবে তার প্রতি আল্লাহর গজব রয়েছে, আল্লাহ পাক তাকে লা'নত দিয়েছেন এবং তার জন্যে বিরাট কঠোর শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় সূরা ফোরকানের আয়াতে

وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ

হত্যাকারীর শাস্তির কথা ঘোষণা করে অবশেষে তওবা করার কথা উল্লেখিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, হত্যাকারীর তওবা কবুল হয়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর জবাবে বলেন, এ বিধান ছিল প্রাক-ইসলামী যুগের। কয়েকজন মুশরেক যারা হত্যা করেছে, ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছে তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করলো, আপনি যে কথার দাওয়াত দিচ্ছেন তাতো অত্যন্ত ভাল কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা যা কিছু করেছি তথা হত্যা, ব্যাভিচার এবং অন্যান্য পাপাচার সেগুলো কি ঈমান আনার সঙ্গে সঙ্গে মাফ হবে? তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করলেনঃ

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ......... اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ

অর্থাৎ যারা ইতিপূর্বে যাবতীয় অন্যায় করেছে এবং পরে তওবা করেছে ও ঈমান এনেছে, এই ঈমানের কারণে আল্লাহ পাক তাদের তওবা কবুল করবেন। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে যা এরশাদ হয়েছে তার অর্থ হলো, যে ব্যক্তি মুসলমান হয়েছে এবং ইসলামের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে অবগত হয়ছে, এরপর সে কোন মোমেনকে হত্যা করেছে তবে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম।

অন্য একটি সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার আরও একটি উদ্ধৃতি রয়েছে যা এ বিবরণের ব্যতিক্রম। এতে তিনি বলেছেন, মোমেনের ঘাতকের শাস্তি দোযখ, সে তাতে চিরদিন থাকবে, যদি আল্লাহ পাক তাকে চিরদিনের তরে শাস্তি দান করেন। কিন্তু আল্লাহ পাক দয়া করবেন এবং তার ঈমানের কারণে তাকে চিরদিন দোযখে রাখবেন না।

সাঈদ এবনে মনসুর এবং বায়হাকী লিখেছেনঃ এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলো, আমি আমার জলাধারে পানি পূর্ণ করে আমার চতুঃষ্পদ জন্তুগুলোর অপেক্ষা করছিলাম যে তারা আসবে এবং পানি পান করবে। এরই মধ্যে আমি নিদ্রিত হলাম যখন জাগ্রত হলাম তখন দেখলাম এক ব্যক্তি দ্রুত তার উষ্ট্রীকে নিয়ে আসলো এবং জলাধারের পাশটি ভেঙ্গে ফেললো। ফলে সমস্ত পানি এদিক সেদিক প্রবাহিত হয়ে গেল। আমি তখন অত্যন্ত ব্যাকুল হলাম এবং তরবারির আঘাতে তাকে মেরে ফেললাম। এমন অবস্থায় আমার জন্যে কি হুকুম রয়েছে?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) তাকে তওবা করার আদেশ দিলেন।

সাঈদ এবনে মনসুর বলেন, সুফিয়ান এবনে উয়াইনা আমাকে বলেছে যখন আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মোমেনের ঘাতকের কি অবস্থা হবে? তখন তারা বলে, তার তওবা নেই। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি এমন অপরাধ করে বসে তখন তারা বলেন তওবা কর। হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্য ওলামাদের বিভিন্নধর্মী কথার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করা যায় যে, ইচ্ছাকৃত হত্যার মধ্যে দ্বিগুণ অপরাধ রয়েছে। প্রথমতঃ একজন মানুষকে খুন করা।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর হুকুম অমান্য করা।

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যে ইচ্ছা করে কোন মোমেনকে হত্যা করে তার তওবা নেই অর্থাৎ তার তওবা কবুল হবে না। এর অর্থ হলো তার নিকট থেকে কেসাস অবশ্যই গ্রহণ করা হবে। বন্দার হক্ব সে বা তার ওয়ারিশগণ যদি মাফ না করে তবে অবশ্যই আদায় করা হবে। দুনিয়াতেও হতে পারে, আখেরাতেও হতে পারে। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে এর সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ রয়েছে। যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক গুনাহর ব্যাপারেই আশা করা যায় যে, আল্লাহ পাক মাফ করবেন শুধু ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে শেরক অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে, অথবা কোন মোমেনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর সূত্রে এই হাদীস ইমাম আবু দাউদ (রঃ) সংকলন করেছেন। এই হাদীসের অর্থ হলো তাকে কেসাস অবশ্যই দিতে হবে এবং মোমেনের ঘাতকের তওবা কবুল হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ পাক তার হক্ব মাফ করে দেবেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আকীদা হলো, কোন মোমেন সর্বদা দোযখে থাকবে না। কেননা, কবীরা গুনাহ মানুষকে ঈমান থেকে বঞ্চিত করে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ

অর্থাৎ যে সামান্যতম ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে, আর ঈমান সবচেয়ে ভাল কাজ যদিও তা গুনাহর সঙ্গে মিশে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে সম্বোধন করে কেসাসের আদেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى

এতেও একথা প্রমাণিত হয় যে, মোমেনের ঘাতক ঈমান থেকে বঞ্চিত হয় না। ফলে তার অপরাধের জন্যে শাস্তি হবে কিন্তু চিরদিন সে দোযখের শাস্তি ভোগ করবে না।

হাদীস শরীফেও একথার প্রমাণ রয়েছে। হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে তথা কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করে তার প্রতি বিশ্বাস করবে সে জান্নাতে যাবে, যদিও তার দ্বারা ব্যাভিচার বা চুরির কাজ হয়।

অন্য হাদীসে রয়েছে, যে মুশরেক হওয়ার অবস্থায় নয় (বরং মোমেন অবস্থায়) মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে যাবে। (মুসলিম)

আরও একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা এ শর্তে আমার নিকট থেকে বয়আত গ্রহণ কর, কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচারে লিপ্ত হবে না, নিজের সন্তান-সন্ততিদেরকে হত্যা করবে না এবং কোন মানুষের প্রতি অপবাদ দেবে না. আর কোন ভাল কাজে বিরোধিতা করবে না। যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকার পূর্ণ করবে আল্লাহ পাকের দরবারে রয়েছে তার সওয়াব, আর যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটি অন্যায় করবে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তিও হয় তবে সে শাস্তি তার গুনাহব কাফ্ফারা হবে। আর যে ব্যক্তি এসব গুনাহ করবে এবং আল্লাহ পাক তার উপর আবরণ রেখে দেবেন অর্থাৎ তার গুনাহকে গোপন রাখবেন তবে তার ব্যাপার আল্লাহ পাকের সোপর্দ হবে। তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিতে পারেন (এই হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ)। তিনি বর্ণনা করেন যে, আমরা এসব শর্ত মেনে নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বয়আত করেছি। (বোখারী, মুসলিম)

ইচ্ছাকৃত কোন মোমেনকে হত্যা করার ব্যাপারে হাদীস শরীফে অনেক সতর্কবাণী রয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম পরস্পর খুন-খারাবী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হবে।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আরয করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! সবচেয়ে বড় গুনাহ কি?

তিনি এরশাদ করলেন, কাউকে আল্লাহর ন্যায় সাব্যস্ত করা অথচ আল্লাহ পাকই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। প্রশ্নকারী পুনরায় প্রশ্ন করলো অতঃপর সবচেয়ে বড় অপরাধ কি? তিনি এরশাদ করলেন, নিজের সন্তানকে এ ভয়ে হত্যা করা যে, সে তোমার খাদ্যে অংশীদার হবে। (বোখারী, মুসলিম)

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২১৮-১৯

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে তোমরা আত্মরক্ষা কর। তন্মধ্যে তিনি অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, কোন মোমেন যখন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে তখন ঈমানের অবস্থায় হত্যা করেনা। (বোখারী শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি দেখেছি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফ তওয়াফ করছিলেন এবং এরশাদ করেছিলেনঃ (হে কা'বা) তুমি কত পবিত্র, তোমার সুগন্ধি কত উত্তম, তোমার মর্তবা কত উচ্চ, তোমার সম্মান কত বেশী, কিন্তু শপথ সেই আল্লাহর! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, একজন মোমেনের প্রাণ এবং সম্পদের সম্মান তোমার সম্মানের চেয়ে অধিকতর।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোমেন দোযখ থেকে মুক্ত থাকে, আর সে সময় পর্যন্ত নেককার থাকে যতক্ষণ সে কোন অন্যায় হত্যা কার্যে লিপ্ত না হয়। যখন সে কোন অবৈধ হত্যা কার্যে লিপ্ত হয় তখন সে ধ্বংস হয়ে যায়। (আবু দাউদ)

বোখারী শরীফ ও তিরমিজী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে। বনি সোলায়েম গোত্রের এক ব্যক্তি তার বকরীগুলো নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের একটি দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলো এবং তাঁদেরকে সালাম দিল। সাহাবাগণ বললেন, এ ব্যক্তি আমাদেরকে এজন্যে সালাম দিয়েছে যেন সে আমাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এরপর এ ধারণা করে তাঁরা তাকে মেরে ফেলেন এবং তার বকরীগুলো নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হন। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا

হে মোমেনগণ! যখন তোমরা আল্লাহর রাহে জেহাদ কর তখন সকল বিষয় উত্তমরূপে অনুসন্ধান করে নিও অর্থাৎ কোন কর্মসূচী গ্রহণের পূর্বে অনুসন্ধান করে নাও। অনুসন্ধানের পূর্বে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করোনা।

আল্লামা বগবী (রঃ) কালবীর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ঐ নিহত ব্যক্তি ছিলেন মুসলমান। ফোদক নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন, তাঁর নাম ছিল মেরদাছ এবনে সোহাইক। তাঁর সম্প্রদায়ের

লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। তারা ইসলামী ফৌজের আগমনের সংবাদ পেয়ে পলায়ন করেছিল। কিন্তু যেহেতু মেরদাছ মুসলমান ছিলেন এজন্যে তিনি স্বস্থানে রয়ে গেলেন। অশ্বারোহী লোকদেরকে আসতে দেখে তিনি আশঙ্কা করলেন, যদি এরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রেরিত লোক না হয় (তবেতো অসুবিধা হবে) তাই তিনি তাঁর বকরীগুলোকে পাহাড়ের পাদদেশে একটি সংরক্ষিত স্থানে পৌঁছে দিলেন এবং নিজে পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় আরোহন করলেন। যখন অশ্বারোহীগণ পৌঁছে গেলেন, মেরদাছ তাঁদের তকবীরের আওয়াজ শ্রবণ করলেন, তখন তিনিও কলেমা পাঠ করতঃ নিচে নেমে এলেন এবং বললেন, আসসালামু আলাইকুম, কিন্তু হযরত উসামা এবনে যায়েদ (রাঃ) তাঁকে হত্যা করলেন এবং তাঁর বকরীগুলো নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন এবং ঘটনার বিবরণ পেশ করলেন। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পূর্বেই এ সংবাদ পেয়েছিলেন। এ ঘটনা তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করে ফেলেছিল। তাই তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা সম্পদের লোভে তাকে মেরেছ।

তখন হযরত উসামা এবনে যায়েদ (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করুন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর" কি হবে? (অর্থাৎ সেতো কলেমা পাঠ করেছিল, এরপরও তোমরা তাকে হত্যা করেছ। এখন আমি কিভাবে তোমার জন্যে দোয়া করব?)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কথাটি তিনবার বলেছেন। হযরত উসামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথাটি বার বার বলেছিলেন তখন আমার মনে হলো হায় আক্ষেপ! যদি আমি আজকের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করতাম এবং আজই ইসলাম গ্রহণ করতাম তবে কত ভাল হতো! তাহলে অতীতের গুনাহ ইসলামের কারণে মাফ হয়ে যেত। যাহোক তিন বার অস্বীকার করার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করলেন এবং এরশাদ করলেনঃ একটি গোলাম আজাদ করে দাও।[১] (সালাবী)

এ ঘটনা অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে একথা সংযোজিত হয়েছে যে, হযরত উসামা আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! সেতো অস্ত্রের ভয়ে কলেমা পাঠ করেছে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তুমি তার বুক চিরে দেখলে না কেন? যাতে করে তুমি জানতে পারতে যে, সে আন্তরিক ভাবে ইসলাম কবুল করেছিল কি-না।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩

এবনে জরীর সুদ্দীর সুত্রে বর্ণনা করেছেন যে,

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ

এ আয়াত মেরদাছ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এতে সমর্থন রয়েছে সে ঘটনার যা কালবী বর্ণনা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى

আর যে ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখে আনুগত্য প্রকাশ করে অথবা তোমাদেরকে আসসালামু আলাইকুম বলে তবে তোমরা একথা বলোনা যে, তুমি মোমেন নও। শুধু আত্মরক্ষার জন্যে তুমি কলেমা পাঠ করেছ।

এবনে জরীর হযরত ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মোহলেম এবনে খোসামাকে এক দলের সঙ্গে জেহাদে প্রেরণ করলেন। পথে তার সঙ্গে সাক্ষাত হলো আমের এবনে আজবাত নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে। আমের মোহলেমকে ইসলামী কায়দায় সালাম দিলেন। যেহেতু মোহলেম এবং আমেরের মধ্যে বর্বরতার যুগে শত্রুতা ছিল তাই মোহলেম তীর মেরে তাকে হত্যা করলো। এ ঘটনার খবর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছে গেল। অতঃপর মোহলেম তাঁর দরবারে হাযির হয়ে মাগফেরাতের দোয়া দরখাস্ত করলো। কিন্তু তিনি এরশাদ করেনঃ আল্লাহ তোমাকে মাফ না করুক। মোহলেম কাঁদতে কাঁদতে দাঁড়িয়ে গেলে এবং এক ঘন্টার মধ্যেই মারা গেল। লোকেরা তাকে দাফন করলো কিন্তু জমিন তাকে গ্রহণ করলো না; বরং বেরিয়ে আসলো। সাহাবায়ে কেরাম এ খবর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দিলেন। তিনি এরশাদ করলেন, জমিন এমন লোকদেরকেও গ্রহণ করে যে তোমাদের এই সাথী থেকেও মন্দ কিন্তু আল্লাহ পাক উপদেশ দিতে চান। অবশেষে লোকেরা তার লাশকে পাহাড়ের গর্তে ফেলে দিলো এবং তার উপর পাথর রেখে দিল। আর তখন এ আয়াত নাযিল হলো।

تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

তোমরা কি এ নশ্বর জগতের সম্পদ কামনা কর? তবে মনে রেখো আল্লাহ পাকের দরবারে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে অনেক অনেক গনিমতের মাল রয়েছে। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তা দ্বারা এমন সম্পদশালী করে দেবেন যা তোমাদেরকে অভাব মুক্ত করে দেবে। আর মনে রেখো পরহেযগার মোমেনের জন্যে আল্লাহ পাক অনেক সওয়াব রেখেছেন।

كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ

"আর ইতিপূর্বে তোমরা এমনই ছিলে," অর্থাৎ যখন তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলে, ইসলামের কলেমা পাঠ করেছিলে তখন তোমাদের জান মালের নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছিল। তোমাদের সম্পর্কে এ অনুসন্ধান করা হয়নি যে, তোমাদের অন্তরে ঈমান আছে কি-না।

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ- অতঃপর আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি এহ্সান করলেন তথা ঈমানের উপর তোমাদেরকে দৃঢ় সংকল্প হওয়ার তৌফিক দান করলেন। অথবা এর অর্থ হলো হিজরতের পূর্বে যখন তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে ছিলে তখন কলেমায়ে তৈয়েবা পাঠ করার কারণে মুসলমানদের তরফ থেকে তোমাদের নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ পাক হিজরতের আদেশ দিয়ে তোমাদের প্রতি এহ্সান করেছেন।

ইমাম কাতাদা (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, তোমরাও ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি এহ্সান করেছেন এবং ঈমান আনার তৌফিক দান করেছেন।

সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, এভাবেই তোমরাও মুশরেকদের থেকে নিজ নিজ ঈমান গোপন রাখতে। অতঃপর আল্লাহ্ পাকের দয়া হয়েছে তোমরা ইসলামের কথা প্রকাশ করতে পারছ। অতঃপর তোমরা চিন্তা কর যে, গনিমতের মাল হালাল কি হারাম। অথবা এর অর্থ হলো তোমরা চিন্তা করে দেখ যে, এভাবে হত্যা করা কত বড় অন্যায়। যদি তোমরা হত্যা কার্য ত্বরান্বিত না করতে তবে সে ব্যক্তির মধ্যে ইসলামের কোন নিদর্শন দেখতে পেতে।

অথবা এর অর্থ হলো ইসলামের কোন আলামত বা নিদর্শন দেখার পর শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে কাউকে হত্যা করা উচিত নয় যে পর্যন্ত না কুফর এবং মুনাফেকীর কোন নিদর্শন প্রকাশিত হয়।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

অর্থাৎ- আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তোমাদের নিয়ত সম্পর্কে তিনি ওয়াকেফহাল। নিয়ত অনুসারেই তোমাদেরকে বদলা দেয়া হবে।

এ আয়াত দ্বারা যা যা প্রমাণিত হয়

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি একান্ত বাধ্য হয়ে ঈমানের কথা প্রকাশ করে তবে দুনিয়াতে ইসলামের বিধি-নিষেধ জারী করার লক্ষ্যে তার ঈমানকে মেনে নেয়া হবে। যিনি মুজতাহেদ কখনো তার ভুলও হয়। কিন্তু যদি তিনি সত্যের সন্ধানে অক্লান্ত সাধনা করে থাকেন অথচ তবুও সত্যে পৌঁছতে পারেননি এবং ভুল করেছেন তার এ ভুল মাফ হবে বলে আশা করা যায়।

কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করে তৌহিদের কথা মেনে নেয়া কাফের, মুশরেক মুসলমান সকলের জন্যে সমভাবে জরুরী। অতএব, কেউ যদি কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করে তবে তার সম্পর্কে কাফের হওয়ার সিদ্ধান্ত করা সঠিক নয়। এবং তাকে হত্যা করা উচিত নয় যে পর্যন্ত না তার সম্পর্কে সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করা হয়।

যদি মুজাহেদগণ কোন শহরে বা বস্তিতে ইসলামের কোন নিদর্শন লক্ষ্য করে তবে সেখানে হত্যাকান্ড পরিচালনা করা বৈধ নয়। যেমন স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন কোন জনপদে অভিযান পরিচালনা করতেন, যদি সে জনপদ থেকে আজানের শব্দ শ্রুত হতো তবে তিনি আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন, আর যদি আজান শ্রুত না হতো তবে তিনি আক্রমণ করতেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যদি কোন এলাকায় ফৌজ প্রেরণ করতেন তবে এ হেদায়েত করতেন যে, তোমরা যদি সেখানে কোন মসজিদ দেখতে পাও অথবা মোয়াজ্জেনের কণ্ঠ শ্রবণ কর তবে সেখানে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করোনা।[১]

لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ
فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۚ
وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۚ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ
أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾

১। তফসীরে মাজাহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২২৪

তরজমা

(৯৫) যে মোমেনগণ কোন ওজর ব্যতীত বসে থাকে (যারা যুদ্ধে না যায়) তারা সেই বীর মুজাহেদগণের সমান হবে না যারা স্বীয় জান মাল দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার রাহে জেহাদ করেছে। যারা আল্লাহ্র রাহে স্বীয় জান মাল দ্বারা জেহাদ করেছে তাদের মর্যাদা আল্লাহ্ পাক বৃদ্ধি করে দিয়েছেন সে সব লোকের উপর যারা বসে রয়েছে। অবশ্য প্রত্যেককেই আল্লাহ্ পাক দান করেছেন কল্যাণ্যের প্রতিশ্রুতি তবে যারা জেহাদের সময় গৃহে বসে রয়েছে তাদের উপর মুজাহিদগণকে মহান প্রতিদান বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

(৯৬) আল্লাহ্ তায়ালার নিকট থেকেই পদমর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া, আর আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

ইতিপূর্বে আল্লাহ্ পাক জেহাদে শরীক হবার জন্যে উৎসাহিত করেছেন, অতঃপর জেহাদের বিধান ঘোষণা করেছেন। এ পর্যায়ে প্রথম যে বিধান পেশ করা হয়েছে তা হলো কোন মুসলমানকে যেন ভুলক্রমে হত্যা করা না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। এ পর্যায়ে ভুলক্রমে কোন মুসলমান নিহত হলে কি করণীয় তা বর্ণিত হয়েছে। আর যদি ইচ্ছাকৃত কাউকে হত্যা করা হয় তবে তার বিধান কি তাও বর্ণিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্র রাহে যারা জেহাদ করে তাদের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার উভয় আয়াতের মধ্যে যোগ সূত্র হিসেবে বলেছেন যে, পূর্ববর্তী আয়াতে ভুলবশতঃ কোন মুসলমানকে হত্যা করা মহা পাপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এ মহা পাপ যারা করেছে তাদের সম্পর্কে ভর্ৎসনা এবং সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এ কারণে মুজাহেদগণের মনে জেহাদ সম্পর্কে উৎসাহ হ্রাস পাওয়া এবং আশঙ্কা সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনা ছিল। এভাবে মুজাহেদগণের মন দমে যাওয়া এবং জেহাদী প্রেরণা স্তিমিত হওয়া স্বাভাবিক। তাই আলোচ্য আয়াতে মুজাহেদগণের বিশেষ ফজিলতের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।[১]

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিজী এবং নেসায়ীতে হযরত যায়েদ এবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণিত একটি ঘটনা স্থান পেয়েছে। আর তিরমিজীতে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৬

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন হযরত যায়েদ এবনে সাবেত (রাঃ) দ্বারা আলোচ্য আয়াতখানি লিখাচ্ছিলেন তখন তা এভাবে ছিলঃ

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ এরপর غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ ছিল না, এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ এবনে উম্মে মকতুম (রাঃ) হাযির হলেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। তিনি আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি আমি জেহাদ করতে পারতাম তবে অবশ্যই যেতাম। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে যাহ্যাস এবং আবদুল্লাহ এবনে উম্মে মকতুম (রাঃ) উভয়ে হাযির হয়ে বলেছিলেন আমরা যে অন্ধ, তখন নাযিল হয়েছিলঃ

غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ

হযরত যায়েদ এবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উরু মোবারক আমার উরুর উপর ছিল। ওহী নাযিল হওয়ার কারণে আমার উপর এত বেশী চাপ পড়ে যে, আমার আশঙ্কা হয়েছিল, হয়তো আমার উরু ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এভাবে এ আয়াত নাযিল হয়। হাদীসে একথাটিও আছে যে, উম্মে মাকতুম (রাঃ) তাঁর ওজর সম্পর্কে কথা শেষ করার আগেই তাঁর সম্পর্কে ওহী নাযিল হওয়া শুরু হয়। হযরত যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, এখনও সে দৃশ্য আমার চোখে ভাসে। মনে হয় আমি দেখছি যে, পরে যে শব্দগুলো অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোকে আমি স্বস্থানে লিখে দিয়েছি।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এতদ্বারা বদরের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। কেননা, বদরের যুদ্ধের সময়ই হযরত আবদুল্লাহ এবনে যাহ্যাস (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে উম্মে মকতুম (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করেছিলেন, আমরা উভয়ে অন্ধ। আমাদের জন্যে কি জেহাদে শরীক না হবার অনুমতি আছে? তখন এ আয়াত দ্বারা তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা ঘরে বসে থাকে, জেহাদে অংশ গ্রহণ করে না তাদের উপর আলোচ্য আয়াতে মুজাহেদদের যে ফজিলত দেয়া হয়েছে তারা সেসব লোক যারা সুস্থ। অর্থাৎ যারা সুস্থ থেকেও জেহাদে অংশ গ্রহণ করেনি তাদের উপর মুজাহেদদেরকে বিশেষ ফজিলত প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, যারা অন্ধ বা লেংড়া-লুলা, অথবা অসুস্থ তারা মুজাহেদদের মর্তবায় রয়েছে। বোখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

এরশাদ করেছেনঃ মদীনায় এমন লোক রয়েছে, তোমরা যে জেহাদের জন্যে ভ্রমণ কর অথবা কোন জঙ্গল অতিক্রম কর তারা তোমাদের সাথে সমান সওয়াবের অধিকারী। সাহাবাগণ আরয করলেন, যদিও তারা মদীনায় অবস্থান করছেন?

তিনি এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ। এজন্যে যে, তাদেরকে কোন ওজর-আপত্তি জেহাদ থেকে বিরত রেখেছে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা যা কিছু জেহাদের সময় আল্লাহর রাহে ব্যয় কর তার সওয়াব যেমন তোমরা পাও তেমনি তারাও পায়।

বস্তুতঃ যারা অন্ধ বা অসুস্থ হওয়ার কারণে জেহাদে অংশগ্রহণে অক্ষম অথবা যারা দারিদ্রের কারণে জেহাদে অংশ গ্রহণে অপরাগ, যদি তাদের এ নিয়ত থাকে যে, আল্লাহ পাক যখন তাদেরকে শক্তি সামর্থ দেবেন তখন তারা অবশ্যই জেহাদ করবেন, তাহলে এমন লোকেরা মুজাহেদদের মর্তবা লাভ করেন। ইতিপূর্বে বোখারী শরীফে সংকলিত যে হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি তা হযরত আনাস (রাঃ) এবং হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন নবম হিজরীতে অনুষ্ঠিত তবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মদীনা শরীফের নিকটবর্তী হন তখন তিনি এরশাদ করেছিলেন, মদীনা শরীফে এমন লোক রয়েছে যারা মদীনায় থেকেও তোমাদের সমান সওয়াব পাবে।[১]

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যারা বিনা ওজরে জেহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে, নিতান্ত অকারণে ঘরে বসে থাকে আল্লাহ পাক তাঁর রাহের মুজাহেদদেরকে সহস্র গুণ বেশী মর্যাদা দান করেছেন। ঈমান ও নেক আমলের কারণে তারা জান্নাতী এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মুজাহেদের মর্তবা অতি উচ্চে, তারা অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী, যদি তাদের অজ্ঞাতসারে তথা ভুলবশতঃ তাদের হাতে কোন মুসলমানও নিহত হয় তবে আল্লাহ পাক বিশেষ রহমতে তাদেরকে মাফ করবেন। অতএব, ভুলবশত কি হয়ে যায়– এ আশঙ্কায় জেহাদ থেকে দূরে থাকার কোন ন্যায্য কারণ নেই।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২২৫-২৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা–৫ খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৭৭
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১২১-২২

এ আয়াত দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথা প্রমাণ করেছেন যে, সব জেহাদ ফরয নয়, বরং ফরজে কেফায়া। কেননা, যদি ফরজে আইন হতো তবে প্রত্যেকের উপর ফরজ হতো। আর এ অবস্থায় যারা জেহাদ থেকে বিরত থাকতো তাদের জন্যে অবশ্যই কোন সতর্কবাণী উচ্চারিত হতো। অথচ আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

অর্থাৎ "প্রত্যেককেই আল্লাহর পাক দান করেছেন কল্যাণের প্রতিশ্রুতি"।[১]

জেহাদের তাৎপর্য

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেন যে, এ আয়াতে আল্লাহ পাক মুজাহেদদেরকে তাদের জেহাদের জন্যে এবং যারা জেহাদে অংশ গ্রহণ না করে তাদের অন্য নেক আমলের জন্যে পুরষ্কৃত করার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, এ আয়াতে নিশ্চয় মুজাহেদদের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে কিন্তু জেহাদকে শুধু কেতাল তথা রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে সীমিত রাখা উচিত হবে না, বরং জেহাদের অর্থ আরো ব্যাপক। দ্বীন ইসলামের সাহায্যের জন্যে, দ্বীন ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বপ্রকার চেষ্টাই জেহাদের অন্তর্ভুক্ত। ঠিক এমনিভাবে যারা জেহাদে অংশ গ্রহণ না করে ঘরে বসে রয়েছে, যাকে পবিত্র কোরআন "কায়েদ" বলেছে তার অর্থ শুধু রণাঙ্গণে উপস্থিত না হওয়া নয়, বরং শরীয়তের সকল বিধানের বাস্তবায়নে যে কোন প্রকার অবহেলা এবং অলসতাকে এতদ্বারা বোঝানো হয়েছে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন ইসলামের খেদমতে যারা মশগুল তাদের ফজিলত রয়েছে সেসব লোকদের উপরে যারা দ্বীন ইসলামের খেদমত থেকে দূরে সরে থাকে।[২]

وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ

পূর্ববর্তী আয়াতে বিশেষভাবে যারা জান মাল দিয়ে জেহাদ করে তাদের উল্লেখ করা হয়েছিল, আর এ আয়াতে সাধারণভাবে আল্লাহর রাহে জেহাদকারীদের উল্লেখ রয়েছে। এতদ্বারা সেসব লোকের ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে যারা সামগ্রিকভাবে জীবনকে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মোতাবেক গড়ে তোলে।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৯
২। তফসীরে মাজেদী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১০

এদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান তাদের যারা আল্লাহ ব্যতীত আর সব কিছুর সম্পর্ক ছিন্ন করে তথা তারা আশা করে শুধু আল্লাহর কাছে, ভরসা করে শুধু আল্লাহর প্রতি, জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিলীন করে দেয়। তাদের জন্যে রয়েছে উচ্চ মর্তবা, মাগফেরাত এবং রহমতের সুসংবাদ।

জেহাদ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কাফেররা যদি নিজের দেশেও থাকে এবং মুসলমানদের প্রতি হামলা না করে তবুও ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের কর্তব্য হলো জেহাদ ব্যতীত বছর অতিক্রম না করা। সে জেহাদে নিজে শরীক হোক অথবা সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করুক। অন্যথায় জেহাদের ধারা বন্ধ হয়ে যাবে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীন কখনও জেহাদ পরিত্যাগ করেননি।

যদি মুসলমানদের এক দল জেহাদের জন্যে প্রস্তুত হয় যার কারণে কাফেরদের ষড়যন্ত্র বানচাল হয় এবং আল্লাহর নাম বুলন্দ হয় তবে জেহাদে যারা শরীক হয়নি তাদের উপর জেহাদ ফরজ থাকে না। এমন অবস্থায় মনিবের অনুমতি ব্যতীত চাকরের, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর, ঋণ দাতার অনুমতি ব্যতীত গ্রহীতার, পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত সন্তানের জেহাদে যাওয়া জরুরী থাকে না, জেহাদে যারা গিয়েছেন তারা যখন যথেষ্ট এমন অবস্থায় বন্দার হক্ব নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে, কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্যে কেউ যদি প্রস্তুত না হয় তবে সকলেই গুনাহগার হবে। শুধু যারা অসুস্থ থাকার কারণে অথবা অন্য কোন ওজরের কারণে জেহাদ থেকে বিরত থাকে তারা গুনাহগার হবে না।

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারেও একমত, মুসলমানদের প্রতি ওয়াজিব হলো তাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সঙ্গে জেহাদ করা। যদি তাদের দল দুর্বল হয় তবে তাদের নিকটবর্তী মুসলমানদের কর্তব্য হলো মুজাহেদদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। যদি তারাও যথেষ্ট না হয় তবে যারা এদের নিকটবর্তী তাদের কর্তব্য হলো জেহাদে শরীক হওয়া। আর এ অবস্থা তখন হবে যখন কাফেরদের নিকটবর্তী মুসলমানগণ দুর্বল হয়ে যায় এবং জেহাদ না করে তবে তাদের নিকটবর্তী লোকদের প্রতি জেহাদ ফরজ হবে। এরপর তাদের নিকটবর্তী লোকদের উপর জেহাদ ফরজ হবে। এমনিভাবে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যত মুসলমান রয়েছে সকলের উপর জেহাদ ফরজ হবে। তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারেও একমত যে, যখন মুসলমান এবং কাফেরদের দল একে অন্যের মুখোমুখি হয় সে মুহূর্তে কোন মুসলমানের জেহাদ থেকে পলায়ন বৈধ নয়। তবে হ্যাঁ, কৌশলগত কোন কারণে যদি এমন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হয় তবে তা অবৈধ নয়। আর যদি কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের সংখ্যার

দ্বিগুণের চাইতেও বেশী হয় এমন অবস্থায় মোকাবেলা থেকে সরে দাঁড়ানো বৈধ হলেও এমন সময় উত্তম হলো দুশমনের মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাকা এবং প্রাণপন জেহাদ করা।

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারেও একমত যে, যদি কাফেররা মুসলমানদের কোন শহর বা বস্তির উপর আক্রমণ করে তবে সে এলাকার প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের উপর জেহাদ করা ফরজে আইন হয়ে যায়। তখন জেহাদ আর ফরজে কেফায়া থাকে না। এ হুকুম সকল মুসলমানের জন্যে। ধনী-দরিদ্র, মনিব-চাকর, সকলের প্রতি নামাজ রোজার ন্যায় জেহাদ ফরজ হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, চাকরের প্রতি মনিবের ঋণ দাতার প্রতি ঋণগ্রহীতার এবং পিতা-মাতার প্রতি সন্তান-সন্ততির যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালন ব্যতিরেকে জেহাদে শরীক হওয়া কর্তব্য হবে। তাদের হুকুম পালন করা তখন জরুরী হবে না। যেভাবে তারা যখন নামাজ রোজার বিরোধিতা করে তখন তাদের আদেশ পালন যোগ্য হয় না। এমনকি ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন যে, এমন অবস্থায় স্বামীর অনুমতি ব্যতীতই স্ত্রীর কর্তব্য হলো জেহাদে শরীক হওয়া। যদি কোন বস্তিতে কাফেররা আক্রমণ করে তবে তাদের নিকটবর্তী মুসলমানদের কর্তব্য হবে তাদের সাহায্য করা। তবে যারা অপারগ যেমন অন্ধ লেংড়া তাদের উপর জেহাদ ফরজ নয়।

وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا۝ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ
وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً

অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করে তাদের বিরাট মর্যাদা এবং মর্তবা রয়েছে সে সব লোকদের উপর যারা জেহাদের অংশ গ্রহণ করেনি। যারা গুনাহগার নয় তাদের মর্তবা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আর যারা গুনাহগার তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মাগফেরাত তথা গুনাহ মাফের সুসংবাদ। আর সবার জন্যেই রয়েছে আল্লাহ পাকের খাস রহমত অর্থাৎ আল্লাহ পাক মুজাহেদদেরকে দান করবেন উচ্চ মর্তবা, মাগফেরাত এবং রহমত। একজন মুসলমানের জন্যে এর চেয়ে বেশী আর কি চাওয়ার থাকতে পারে? যদি তিনি তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করেন তবে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছুই নেই।

আলোচ্য আয়াতে জেহাদের প্রতি অনুপ্রাণিত করার জন্যে সর্বপ্রথম মুজাহেদদের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। মুজাহেদ এবং অমুজাহেদ যে এক সমান নয় একথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। এতদ্বারা মুজাহেদদের ফজিলত প্রমাণিত হয়েছে। এরপর আরো সুস্পষ্ট ভাষায় মুজাহেদদের ফজিলত এবং মর্তবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে মুজাহেদদের উচ্চ মর্তবা প্রদান, তাদের মাগফেরাত এবং রহমতের ঘোষণা স্থান পেয়েছে।

হাদীসের আলোকে জেহাদ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের প্রতিপালক হওয়ার প্রতি, ইসলামের জীবন বিধান হওয়ার প্রতি এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবী হওয়ার প্রতি সন্তুষ্ট হয় তবে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) একথা শুনে আশ্চর্যন্বিত হন এবং আরয করেন, আবার একথাটি এরশাদ করুন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার একথাটি বললেন এবং পরে এরশাদ করলেন, আরেকটি কথাও রয়েছে যার জন্য আল্লাহ্ পাক জান্নাতে বন্দার ১০০টি মর্তবা বুলন্দ করবেন। আর প্রত্যেক দুটি মর্তবার মধ্যে এত উচ্চতা হবে যেমন জমিন ও আসমানের মধ্যে রয়েছে। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! সে কোন্ কথা?

তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহর রাহে জেহাদ। আল্লাহর রাহে জেহাদ। (মুসলিম)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে, নিয়মিত নামাজ আদায় করে এবং রমজানের রোজা রাখে আল্লাহ পাকের দায়িত্ব হলো তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো। আল্লাহর রাহে জেহাদ করুক বা নিজের জন্মভুমিতে বসে থাকুক।

সাহাবাগণ আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা কি লোকদেরকে এ সুসংবাদ দেব না? তিনি এরশাদ করলেনঃ জান্নাতে ১০০টি মর্তবা রয়েছে যা তিনি তাঁর রাহের মুজাহেদদের জন্যে তৈরী করে রেখেছেন আর প্রত্যেক দু' মর্তবার মধ্যে পার্থক্য এতখানি যতখানি জমিন এবং আসমানের মধ্যে। যখন তোমরা আল্লাহ্ পাকের নিকট কিছু চাও তখন জান্নাতুল ফেরদৌসের জন্যে প্রার্থনা কর। এটি মধ্যম এবং উচ্চতর জান্নাত। আর (বস্তু মাত্রেরই মধ্যম স্থান উচ্চতর হয়) এর উপর দয়াবান আল্লাহ পাকের আরশ রয়েছে আর আরশ থেকে জান্নাতের নদী প্রবাহিত হচ্ছে। (বোখারী)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ

অর্থাৎ-বেহেশত হলো তরবারির ছায়াতলে। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম?

তিনি এরশাদ করলেনঃ

مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ

যে মোমেন তার জান মাল নিয়ে আল্লাহর রাহে জেহাদ করে, দুশমনের মোকাবেলা করে সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়।

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

আর আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর তিনি অতীব দয়াময়, করুণাময়। অতএব, তিনি তাদের প্রতি দয়া করবেন।[১]

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ
كُنْتُمْ ۖ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۖ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ
اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ۖ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ
مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا
يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩٨﴾ فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ
اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ۖ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾

তরজমা

(৯৭) নিশ্চয় যারা পাপ কার্য দ্বারা নিজেদের উপর অত্যাচার করে তাদের প্রাণ সংহার করার সময় ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে আমরা দুনিয়াতে অত্যন্ত অসহায় ছিলাম। ফেরেশতাগণ বলে আল্লাহর দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করতে পারতে? তাদেরই বাসস্থান দোযখ, আর তা কত মন্দ বাসস্থান!

(৯৮) কিন্তু যে সব দুর্বল পুরুষ নারী হিজরত করতে সক্ষম না হয়, যারা কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং যারা পথেরও কোন সন্ধান পায় না (তাদের কথা স্বতন্ত্র)।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২২৮-৩১

(৯৯) এসব লোক সম্পর্কে আশা আছে যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত মার্জনাকারী, অতিশয় ক্ষমাশীল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে জেহাদের ফজিলত এবং মুজাহেদদের উচ্চ মর্তবার কথা ঘোষণা করা হয়ছে। আর আলোচ্য আয়াতে যারা জেহাদ থেকে বিরত রয়েছে এবং কাফেরদের সঙ্গে বসবাস করা পছন্দ করেছে তাদের পরিণামের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

শানে নুযুল

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, মক্কার কিছু অধিবাসী ইসলামের কলেমা পাঠ করেছে ঠিকই কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের মধ্যে ছিল কায়েস এবনে ফা'কাহ এবনে মগীরা এবং কায়েস এবনে ওয়ালিদ এবনে মগীরা এবং আরো কিছু লোক। বদরের যুদ্ধের সময় কাফেরদের সঙ্গী হয়ে এরাও এসেছিল এবং কাফেরদের সাথেই তারা মৃত্যু বরণ করে। এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলন করেছেন যে, কয়েকজন মুসলমান কাফেরদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে তাদের সঙ্গে এসেছিল। এবনে মান্দাহ তাঁর বর্ণনায় এদের নামও লিপিবদ্ধ করেছেন। তারা ছিল কায়েস এবনে ওয়ালিদ এবনে মগীরা, আবুল কায়েস এবনে ফাকাহ, ওয়ালিদ এবনে ওতবা এবনে মগীরা, আমর এবনে উমাইয়া, সুফিয়ান, আলী এবনে উমাইয়া এবনে খাল্‌ফ। এবনে মান্দাহ একথাও লিখেছেন যে, এরা মক্কা থেকে বদরে এসেছিল। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক মুসলমানদের দেখে তারা মনে মনে সন্দেহ করলো এবং বললা, এ ব্যক্তিদেরকে এদের ধর্ম ধোকা দিয়েছে। অবশেষে তারা বদরের রণাঙ্গণ নিহত হলো।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেন, "তাদের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে" একথা বলার অর্থ হলো তারা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়েছিল। কিন্তু কোরআনে করীমের ভাষায় তাদের কাফের হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেনা।

তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কার কিছু লোক মুসলমান হয়েছিল কিন্তু যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হিজরত করলেন তখন তারা ভীত হলো এবং হিজরত করা পছন্দ করলো না।

এবনে জরীর এবং এবনে মুনজের হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা এভাবে সংকলন করেছেন যে, মক্কায় কিছু লোক মুসলমান হয়েছিল কিন্তু তারা তাদের ঈমানকে গোপন রেখেছিল। কাফেররা তাদেরকে বদরের রণাঙ্গণে নিয়ে

গিয়েছিল। তাদের কিছু লোক নিহত হয়েছিল, মুসলমানগণ বললেন, তারাতো প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ছিল কিন্তু তাদেরকে বাধ্য করে এখানে আনা হয়েছে। অতএব, তাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া কর। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ

আয়াতের মর্মকথা

কোন কোন মুসলমান প্রকৃত মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও দারুল কুফর থেকে হিজরত করেনি এবং কাফেরদের সঙ্গে জীবন যাপন করেছে। কাফেরদের রাষ্ট্রে বসবাস করার কারণে তাদের ভয়ে ইসলামী বিধি-নিষেধ পালন করতে পারেনি। প্রকাশ্যে ইসলামী আচারানুষ্ঠানেও অংশ নিতে পারেনি। জেহাদ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমন অবস্থায় হিজরত করা তাদের উপর ফরজ হওয়া সত্ত্বেও তারা হিজরত করেনি, বরং কাফেরদের সঙ্গে মিলে মিশেই জীবন যাপন করেছে, আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কেই সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কেননা, তারা মহা অপরাধী। তাদের জীবন সায়াহ্নে যখন ফেরেশতাগণ তাদের রুহ কবজ করতে আসবে তখন তাদেরকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? কি ছিল তোমাদের ধর্ম? তারা বলবে আমরা মুসলমানই ছিলাম তবে আমাদের দুর্বলতার কারণে প্রকাশ্যে আমরা দ্বীন ইসলামের বিধি-নিষেধ পালন করতে পারিনি। ফেরেশতাগণ তখন তাদেরকে বলবে, যদি তোমাদের এ অবস্থাই হয় তবে আল্লাহর এ দুনিয়া সংকীর্ণ ছিল না, তোমরা ইচ্ছা করলে যে কোন স্থানে চলে যেতে পারতে তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করতে পারতে কিন্তু তোমরা তা করোনি। অতএব, এমন অপরাধীদের জন্যে রয়েছে দোযখের কঠোর শাস্তি। অবশ্য যে সব নর-নারী সত্যিই দুর্বল ছিল এবং কাফেরদের দেশ থেকে নাজাত লাভের ক্ষমতাও তাদের ছিল না, হিজরতের পথ বা পন্থা তাদের জানা ছিল না এমন অসহায় ব্যক্তিরা অবশ্যই ক্ষমার পাত্র বলে বিবেচিত হবে।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা এমন পরিবেশে বাস করে যেখানে ইসলামের বিধি-নিষেধ প্রকাশ্যে পালন করা সম্ভব নয় সেখান থেকে হিজরত করা এমন মুসলমানদের উপর ফরজ। কেননা, জিন্দেগীর উদ্দেশ্যেই হলো আল্লাহর বন্দেগী। যদি এ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তবে জিন্দেগীর সাধনাও ব্যর্থ হয়। অতএব, যেখানে আল্লাহর বন্দেগী করা সম্ভব সেখানে চলে যাওয়াই একান্ত করণীয়। অবশ্য

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৩১-৩২
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১২৫

যারা হিজরত করতে সম্পূর্ণ অক্ষম তাদের কথা স্বতন্ত্র। আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেন, যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে অর্থাৎ দারুল কুফর থেকে হিজরত করা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য হওয়া সত্ত্বেও তারা হিজরত করেনি, এটিই তাদের বড় অপরাধ। মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান যখন তাদের উপর কার্যকর হবে তখন কর্তব্যরত ফেরেশতাগণ তাদেরকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে যে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তোমাদের ধর্ম কি ছিল?

আলোচ্য আয়াতে যদিও 'আল মালায়েকা' শব্দটি 'মালাকুন' শব্দের বহুবচন কিন্তু এর অর্থ যমদূত বা মৃত্যুর ফেরেশতা তবে আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এক্ষেত্রে অর্থ হলো মৃত্যুর ফেরেশতা এবং তাঁর সহায়ক ফেরেশতাগণ। ইমাম আহমদ এবং নেসায়ী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর একটি বর্ণনা সংকলন করেছেন যার মধ্যে একথা রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, মোমেনের মৃত্যুর সময় রহমতের ফেরেশতাগণ সাদা রেশমী কাপড় নিয়ে আসবে এবং বলবে, হে পবিত্র রুহ্ বেরিয়ে আস। তুমি আল্লাহ্ পাকের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্ পাকও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। চল, আল্লাহর রহমত এবং শান্তির দিকে। আর সেই মালিকের দিকে যিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন।

পক্ষান্তরে কাফেরের মৃত্যুর সময় আযাবের ফেরেশতা বস্তা জাতীয় কাপড়ের টুকরা নিয়ে হাযির হয় এবং বলে হে অপবিত্র রুহ্, তুমি আল্লাহ্ পাকের প্রতি অসন্তুষ্ট, আর তিনিও তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট। বেরিয়ে আস, চল আল্লাহর আযাবের দিকে।

হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন ইমাম আহমদ (রঃ)। এ সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, মোমেন বন্দার যখন পৃথিবী থেকে বিদায়ের সময় আসে এবং আখেরাত নিকটবর্তী হয় তখন পূর্বের ন্যায় নূরানী সাদা চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতাগণ জান্নাতের কাফন এবং সুগন্ধি নিয়ে তার নিকট হাযির হয় এবং কিছু দূরে তারা উপবিষ্ট হয়। তখন মৃত্যুর ফেরেশতা তার মাথার কাছে এসে বসে পড়ে এবং বলে, হে পবিত্র রুহ্! বেরিয়ে আস এবং চল আল্লাহর মাগফেরাত এবং সন্তুষ্টির দিকে। তখন সঙ্গে সঙ্গে রুহ্ এভাবে বেরিয়ে আসে যেমন কস্তুরি থেকে পানির ফোটা। মৃত্যুর ফেরেশতা তখন সেই রুহ্কে নিজ হাতে নিয়ে নেয় কিন্তু যেসব রহমতের ফেরেশতা পূর্বেই উপবিষ্ট ছিল তারা এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে সেই আত্মাকে নিজেদের নিকট নিয়ে কাফনে জড়িয়ে খুশবু লাগিয়ে বিদায় গ্রহণ করে।

পক্ষান্তরে যখন কোন কাফেরের পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করার সময় হয় এবং আখেরাত নিকটবর্তী হয় তখন কালো চেহারা বিশিষ্ট কিছু ফেরেশতা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়ে তার নিকট উপস্থিত হয় এবং কিছু দূরে বসে থাকে। এরপর মৃত্যুর

ফেরেশতা উপস্থিত হয়ে তার মাথার নিকট বসে পড়ে এবং বলে, হে অপবিত্র রুহ্! বেরিয়ে আয় এবং চল আল্লাহর গজবের দিকে। তখন রুহ্ দেহের মধ্যে ভীত অবস্থায় পলায়নপর থাকে কিন্তু ফেরেশতারা তাকে ধরে ফেলে এবং তাকে সজোরে টেনে বের করে। মৃত্যুর ফেরেশতা তাকে নিয়ে নেয়। তখন উপবিষ্ট ফেরেশতাগণ তাঁর নিকট থেকে রুহ্কে নিয়ে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বস্তা জাতীয় কাপড়ে জড়িয়ে নেয়।

এবনে জরীর এবং এবনুল মুনজের হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলমানগণ তাদের যেসব সাথী মক্কা শরীফে রয়েছে তাদের চিঠি লিখলেন যে, এখন তোমাদের জন্যে সেখানে অবস্থানে কোন কল্যাণ নেই। অতএব, তোমরা চলে আস। মুসলমানগণ মক্কা শরীফ থেকে বেরিয়ে আসেন কিন্তু পেছন থেকে পৌত্তলিকরা এসে তাদেরকে ধরে ফেলে এবং মক্কা শরীফে ফেরত নিয়ে যায়। তাদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়ঃ

فَاِذَآ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ

মদীনা শরীফের মুসলমানগণ এ আয়াত লিখে প্রেরণ করলেন মক্কাবাসী মুসলমানদের নিকট। তখন মক্কাবাসী মুসলমানগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আমরা অবশ্যই এখান থেকে বেরিয়ে যাব। যদি পেছন থেকে পৌত্তলিকরা হাযির হয়ে যায় তবে যুদ্ধ হবে। যে বাঁচবার সে বেঁচে যাবে, আর যার মৃত্যু বরণ করার সময় হয় সে মৃত্যু বরণ করবে। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়ঃ

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, হিজরতের পরে হিজরত ব্যতীত ইসলাম গ্রহণযোগ্য হতো না। মক্কা বিজয়ের পর এ আদেশ বাতিল হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মক্কা বিজয়ের পর হিজরত অবশ্য কর্তব্য নয়। (আহমদ, আবু দাউদ)

এর কারণ এই যে, মক্কা বিজয়ের পর মক্কা থেকে বিদায় নিয়ে যারা অন্য কোথাও বসবাস করে তাকে মোহাজের বলা হয় না। আর তারা হিজরতের সওয়াবও পায় না।

قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ

অর্থাৎ- ফেরেশতারা এ ব্যক্তিদেরকে ধমক দিয়ে বলবে তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তোমরা কি ইসলামের অবস্থায় ছিলে? যা তোমরা দাবী করেছ নাকি কুফরের অবস্থায় ছিলে? কেননা, তোমরা কাফেরদের সাথেই বসবাস করেছ এবং তাদের সঙ্গে

সহযোগিতা করেছ। হিজরতের ব্যাপারে গাফলতকারী মৃত ব্যক্তিরা বলবেঃ

كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ

আমরা দুনিয়াতে বড়ই দুর্বল এবং অসহায় ছিলাম, কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করার শক্তি আমাদের ছিল না। অথবা এর অর্থ হলো আমরা দ্বীন ইসলামকে প্রকাশ করতে এবং দ্বীন ইসলামের পতাকাকে উড্ডীন রাখতে অক্ষম ছিলাম।

قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا

অর্থাৎ-ফেরেশতাগণ তখন তাদেরকে বলবে, আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না? যেখানে তোমরা হিজরত করতে পারতে এবং আল্লাহর বন্দেগী করতে সক্ষম হতে, মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করতে পারতে। এর অর্থ হলো, তোমরা ইচ্ছা করলে মক্কা ছেড়ে এমন স্থানে চলে যেতে পারতে যেখানে তোমাদের পক্ষে ইসলামের কথা প্রকাশ করা, কাফেরদের বিরোধিতা করা, দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসার করা সম্ভব হতো। যেমন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে যারা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা অথবা আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন।

فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ

অতএব, তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম কেননা, তারা হিজরত ফরজ হওয়া সত্ত্বেও তা করেনি। তাদের অবশ্য কর্তব্য কাজে অবহেলার শাস্তি হলো দোযখ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হিজরত করেনি তাদের কাফের হওয়া, আর চিরদিন দোযখের অধিবাসী হওয়ার কথা এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

وَسَآءَتْ مَصِيْرًا

"আর গমনের জন্যে দোযখ হলো অত্যন্ত মন্দস্থান"।

সা'লাবী হযরত হোসেন (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজের দ্বীনকে নিয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে পলায়ন করেছে, আর সে দেশ অর্ধহাত দূরে অবস্থিত হলেও তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়েছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি শুধু দ্বীন ইসলামের হেফাজতের জন্য হিজরত করেছে তার জন্যে বেহেশতে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা

রয়েছে এবং জান্নাতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথী হওয়ার সুযোগ লাভ করবে।

বোখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মুসলমানের জন্যে উত্তম সম্পদ হলো সে বকরীগুলো যেগুলোকে নিয়ে সে পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় চলে যায় যেন ফেৎনা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে এবং নিজের দ্বীন ও ঈমানকে হেফাজত করতে পারে।

ইমাম মুসলিম হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীস সংকলন করেছেন। এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মুসলমান হওয়ার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ইসলাম গ্রহণের কারণে দূরীভূত হয়। নিঃসন্দেহে হিজরতের পূর্বের সমস্ত গুনাহ হিজরত করার কারণে নিঃশেষ হয়ে যায়। আর হজ্জ করায় পূর্বের সমস্ত গুনাহ হজ্জের কারণে ক্ষমা করা হয়।[১]

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

তবে যে সব নারী পুরুষ, শিশু সত্যিই অসহায় অক্ষম, হিজরত করার শক্তি তাদের নেই, হিজরতের ব্যবস্থা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়না যেমন এত বৃদ্ধ এবং অসুস্থ যে, চলতে পারেনা এবং আরোহন করার মত কোন ব্যবস্থাও নেই অথবা পরিবারবর্গ নিয়ে সফর করা সম্ভবপরও নয়। আর তাদেরকে দারুল কুফরে রেখে একা হিজরত করলে তাদের ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা থাকে। হিজরত করতে এমনভিাবে অক্ষম হলে তারা হবে হিজরতের এ আদেশের ব্যতিক্রম। এজন্যে পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَّلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

অর্থাৎ তারা এত দুর্বল যে, কাফের এলাকা থেকে নাজাত লাভের কৌশল অবলম্বন করতেও অক্ষম, তারা নিজের পথ চেনে না এবং কোন পথ প্রদর্শকও পায় না তাদের জন্যে আশা করা যায় যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ

অর্থাৎ তাদের জন্যে এ আশা করা যায় যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে মাফ করবেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হিজরতের ব্যাপারটি এত গুরুত্বপূর্ণ

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১২৭

যে, অসহায় ব্যক্তিরও এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়, বরং সুযোগের সন্ধানে থাকা উচিত এবং যে কোন সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে নিশ্চিত ক্ষমার করা ঘোষণা করা হয়নি; বরং এরশাদ হয়েছে যে, আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে মাফ করবেন।[১]

وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا

"আর আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত মার্জনাকারী এবং অতিশয় ক্ষমাশীল"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, عَفُوًّا শব্দটির সম্পর্ক অতীতের সঙ্গে এবং غَفُوْرًا শব্দটির সম্পর্ক ভবিষ্যতের সঙ্গে, অর্থাৎ অতীতে তাদের যেসব গুনাহ্ হয়েছে আল্লাহ্ পাক তা মাফ করে দেবেন এবং ভবিষ্যতেও আল্লাহ্ পাক তাদেরকে মাগফেরাত দান করবেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি এবং আমার মাতা সেসব লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যাদেরকে আল্লাহ্ পাক 'মাজুর' বা অসহায় লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এশার নামাজের পর মক্কার অসহায় মুসলমানদের জন্যে দোয়া করতেন।

বোখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলিত হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এশার নামাজের শেষ রাকাআতে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' বলার পর এভাবে দোয়া করতেনঃ 'হে আল্লাহ্! আইয়াশ এবনে আবি রবীয়াহকে নাজাত দান কর, হে আল্লাহ! ওলীদ এবনুল ওলীদকে নাজাত দান কর, যে আল্লাহ! সালমা এবনে হেশামকে নাজাত দান কর, হে আল্লাহ! অসহায় মোমেনদেরকে নাজাত দান কর। হে আল্লাহ! মোজের গোত্রকে কঠিন শাস্তি দাও এবং ইউসুফ (আঃ)-এর যুগে যেমন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তেমনি দুর্ভিক্ষের শাস্তি তাদেরকেও দাও।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৩৪-৩৫

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ وَمَنْ يَّخْرُجْ
مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ
وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٠﴾

তরজমা

(১০০) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার পথে হিজরত করে সে লাভ করবে বহু বিস্তৃত স্থান এবং স্বচ্ছলতা এবং যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহ থেকে এজন্যে বের হয়ে আসে যে, সে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে হিজরত করবে, এরপর তাকে মৃত্যু আক্রমণ করে, এমন অবস্থায় তার সওয়াব আল্লাহ্ পাকের নিকট অবধারিত হয়ে থাকে। এবং আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

তফসীরুল কোরআন

হিজরতের মর্মকথা

যখন কোন দেশে তার মুসলমান অধিবাসীদের পক্ষে ইসলামের বিধি-নিষেধ পালন করা সম্ভব না হয় এবং ইসলামী আচারানুষ্ঠান করতেও তারা অক্ষম হয় তখন সে দেশ থেকে হিজরত করা ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ এমন দেশে চলে যাওয়া যেখানে বিনা বাধায় ইসলামী হুকুম আহকাম মেনে জীবন যাপন করা যায়।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে জেহাদের কথা ছিল। জেহাদের উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করার পন্থা অবলম্বন করা। আর এ আয়াত থেকে হিজরতের কথা শুরু হলো। হিজরতের মর্ম হলো কাফেরদের জুলুম থেকে আত্মরক্ষা করার বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা। প্রথম জেহাদ ছিল একটি সামগ্রিক আদেশ, আর হিজরত হলো ব্যক্তিগত। তবে উভয়ের উদ্দেশ্য এক, আর তাহলো দ্বীন ইসলাম কায়েম করা।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, হিজরতের জন্যে প্রিয় মাতৃ-ভূমি ছেড়ে যেতে হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অনেক কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। নিজের দেশে তো মানুষ মাত্রেরই কিছু একটা ঠিকানা থাকে, আয় রোজগারের পথ থাকে কিন্তু

মানুষ যখন নিজের দেশ ও আত্মীয়-স্বজন, কর্মস্থল ছেড়ে চলে যায় তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাকে চরম কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। আল্লাহ পাক এ আয়াতে হিজরতের জন্যে অনুপ্রাণিত করে এরশাদ করেছেন, হে মোমেনগণ! আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করার পর কোথায় যাব, কি খাব এসব অবান্তর প্রশ্ন যেন তোমাদেরকে ব্যথিত ও চিন্তিত না করে তোলে। মনে রেখো, আল্লাহর দুনিয়া ক্ষুদ্র নয়, বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী পড়ে আছে। যে বা যারা হিজরত করবে তথা নিজের বাড়ী-ঘর ছেড়ে যাবে তাদের জন্যে রয়েছে অনেক জায়গা। তারা লাভ করবে জীবিকার স্বচ্ছলতা। যেমন মদীনা মোনাওয়্যারায় যারা হিজরত করেছেন তারা আল্লাহর পাকের রহমতে লাভ করেছেন প্রশস্ত জমিন এবং জীবিকার স্বচ্ছলতা। এমনকি, যদি কেউ হিজরতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলো এবং মঞ্জিলে পৌছার পূর্বেই তার মৃত্যু ঘটে তবে তারও নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। কেননা, উদ্দেশ্যে হলো নিজের ভিটা-মাটি ছেড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা। আর এ উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তাই এমন ব্যক্তির সওয়াব বা শুভ পরিণতি সুনিশ্চিত।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, যখন হিজরত সম্পর্কীয় এ আয়াত নাযিল হয় তখন বনী লায়েশ গোত্রের জুন্দব এবনে জমরা নামক একজন বৃদ্ধ অসুস্থ ব্যক্তি এ আয়াত শ্রবণ করে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাদের মধ্যে নই যাদেরকে আল্লাহ পাক অসহায় বলে ঘোষণা করেছেন। আমি হিজরতের জন্যে সচেষ্ট হতে পারি, আমার কাছে এত সম্পদ আছে যা দ্বারা আমি মদীনা শরীফ পৌছতে পারি। এমনকি তার চেয়ে বেশীও যেতে পারি। আল্লাহর শপথ, আমি আজ রাত মক্কায় অতিবাহিত করবো না, আমাকে তোমরা মক্কা থেকে বাইরে নিয়ে চল। এরপর লোকেরা তাকে একটি খাটে বসিয়ে মক্কার বাইরে তান'য়ীম নামক স্থানে নিয়ে আসে। এখানে পৌছার পর তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে। তখন তিনি বলেনঃ হে আল্লাহ! এ চেষ্টা তোমার ও তোমার রসূলের জন্যে। আমি তোমার সঙ্গে সেই অঙ্গীকার করি যা তোমার রসূল করেছেন, এরপর তিনি এন্তেকাল করেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ খবর পৌছে। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, যদি সে মদীনা শরীফ পর্যন্ত পৌছাতে পারত তবে সে পূর্ণ সওয়াব লাভ করতো। আর মুশরেকরা তার অবস্থা দেখে বিদ্রুপ করতে লাগলো। তারা বললো তার একদিও গেল সেদিকেও গেল।

এবনে আবি হাতিম এবং আবি আলা হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, জুন্দব নামক এক ব্যক্তি হিজরতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলেন এবং বললেন, আমাকে কোন যানবাহনের উপরে বসিয়ে দাও এবং এ কুফরীস্থান থেকে বের করে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে দাও। লোকেরা তাকে নিয়ে বের হলো। কিন্তু পথে তার এন্তেকাল হলো। সে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলো না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে তার বাড়ী-ঘর থেকে বের হয় যে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সে হিজরত করবে এবং যেখানে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের হুকুম সেখানেই যাবে। কিন্তু পথে তার মৃত্যু হলো। ফলে সে নিদৃষ্ট মঞ্জিলে পৌঁছাতে পারলো না। এ ব্যক্তিকেও আল্লাহ পাক সওয়াব দান করবেন। আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।

এবনে সা'দ তবকাতে এজিদ এবনে আবদুল্লাহ'র উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, জুন্দব এবনে জমরা মক্কায় ছিলেন। তিনি তাঁর সন্তানদের বললেন, তোমরা আমাকে মক্কা থেকে বাইরে নিয়ে চল। তারা বললো, কোথায়? সে মদীনা শরীফের দিতে হাত ইশারা করলো এবং তাঁর সন্তানরা তাকে নিয়ে বের হলো। পথে তাঁর এন্তেকাল হয়। আল্লাহ পাক তাঁর সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল করেন।

এবনে আবি হাতেম হেশাম এবনে ওরওয়ার সূত্রে হযরত যোবায়ের এবনুল আওয়ামের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, খালেদ এবনে হেশাম নামক এক ব্যক্তি আবিসিনিয়ায় হিজরত করার জন্যে রওয়ানা হয়। পথে সর্প দংশনের কারণে তিনি এন্তেকাল করেন। তাঁর সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে আকতাম এবনে সাইফি নামক এক ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের খবর পেয়ে তাঁর দরবারে হাযির হওয়ার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ হওয়ার কারণে লোকেরা তাকে বাধা দেয়। তখন দু' ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলো, আমরা আকতাম এবনে সাইফির প্রেরিত প্রতিনিধি। আকতাম আপনার সম্পর্কে জানতে চায় যে, আপনার শিক্ষা কি? তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আমি আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং আল্লাহর বন্দা ও তাঁর রসূল। অতঃপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক সুবিচার এবং পরোপকারের আদেশ দেন"।

এরপর ঐ দু' ব্যক্তি আকতামের নিকট এসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবস্থা বর্ণনা করলো। তখন সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তিনি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের আদেশ দেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেন। অতএব, তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে তোমরা মাথা হও লেজ হয়োনা। অর্থাৎ সর্বাগ্রে তাঁর নিকট হাযির হও, পেছনে পড়োনা। একথা বলে উষ্ট্রের উপর আরোহন করে মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথে এন্তেকাল করেন। তার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণের মতে, যদি কোন ব্যক্তি দ্বীনি এলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে এমন স্থানের দিকে হিজরত করে যেখানে আল্লাহর বন্দেগী উত্তমভাবে করা যায় কিন্তু পথে যদি মৃত্যু চলে আসে তবে আল্লাহ পাক তাকেও সওয়াব দান করবেন।

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ
فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ إِنْ
خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا
مُّبِينًا ۝ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم
مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآئِكُمْ
وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ
وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা- ২৩৮-৩৯

তরজমা

(১০১) এবং যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর কর তখন নামাজ সংক্ষেপ করলে কোন গুনাহ নেই। যদি তোমরা ভয় কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করবে, নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্যে শত্রু।

(১০২) (হে রসূল!) যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন এবং তাদেরকে নামাজে দাঁড় করান তখন তাদের এক দল যেন আপনার সাথে নামাজে দাঁড়ায় এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সঙ্গে রাখে। এরপর যখন তারা সেজদা শেষ করে তখন যেন তারা আপনার পেছনে যায় এবং অন্য দল যারা নামাজ আদায় করেনি তারা যেন আপনার সাথে নামাজ পড়ে ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা স্বরূপ অস্ত্র যেন সঙ্গে রাখে এবং কাফেররা চায় যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি থেকে গাফেল হও। সে সুযোগে তারা তোমাদের প্রতি একসঙ্গে আক্রমণ করতে পারে এবং যদি তোমরা বৃষ্টির দরুণ অসুবিধায় পড় তবে অস্ত্র পরিত্যাগ করলে কোন গুনাহ হবে না এবং তোমরা স্বীয় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই সঙ্গে রাখ। নিশ্চয় আল্লাহ পাক কাফেরদের জন্যে অবমাননাকর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে জেহাদের এবং হিজরতের কথা বর্ণিত হয়েছে। জেহাদ, হিজরত বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করলে ফরজ নামাজকে সহজ করার তথা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাজকে দু' রাকাআত আদায়ের অনুমতি ঘোষণা করা হয়েছে এ আয়াতে। জেহাদ হোক অথবা হিজরত– সকল অবস্থায়ই দুশমনদের আক্রমণের আশঙ্কা থাকতো সর্বত্র আর সফরের কষ্টের ব্যাপারতো আছেই। এমনি অবস্থায় চায় রাকাআত বিশিষ্ট নামাজকে দু' রাকাআত আদায় করার অনুমতি মোমেন বন্দাদের প্রতি আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ দান।

মাসায়েলুল কোরআন

কিন্তু প্রশ্ন হলো যেখানে সফরের কোন কষ্ট নেই অথবা দুশমনের আক্রমণের আশঙ্কা নেই যেমন বর্তমানে সফর অতি আরামদায়ক ও সহজ হয়েছে এমন অবস্থায়ও কি কসর তথা চার রাকাআত নামাজ দু' রাকাআত আদায় করতে হবে? উত্তর হলো হ্যাঁ, তাই করতে হবে। মসনদে আহমদে রয়েছে, ইয়ালা এবনে উমাইয়া হযরত ওমর (রাঃ)-কে একথাটি জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ নামাজ কসরের হুকুমতো দুশমনের আক্রমনের আশঙ্কার সময় ছিল এখন তো শান্তির সময় এখনও কি নামাজে কসর করতে হবে?

হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ এমন প্রশ্ন আমার মনেও উত্থিত হয়েছিল। আমি প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলাম স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে। তখন তিনি এরশাদ করেছিলেন, এটি আল্লাহ পাকের সদকাহ যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন, তোমরা তা গ্রহণ কর। (মুসলিম)

আবু হানজালাও হযরত ওমর (রাঃ)-কে সফরের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন দু' রাকাআত। আবু হানজালা বলেছিলেন, কোরআনে করীমে তো ভয়ের সময় কসর করার হুকুম রয়েছে (যেমন আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

অর্থাৎ যদি তোমরা ভয় কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে) আর এখনতো শান্তি বিরাজমান। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, এটি হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নত। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, মক্কা এবং মদীনার মধ্যে শান্তি বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে (চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাজ) দু' রাকাআতই আদায় করেছি। (নেসায়ী)

অন্য হাদীসে রয়েছে, যখন আল্লাহ পাকের ভয় ব্যতীত কোন ভয় ছিল না তখনও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফের সফরে দু' রাকাআতই পড়েছেন।

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসেও রয়েছে, প্রত্যাবর্তন কালেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু' রাকাআতই আদায় করেছেন। তিনি এ সফরে মক্কা শরীফে ১০ দিন অবস্থান করেন।

মসনদে আহমদে হযরত হারেসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, (তিনি বলেন) আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জোহর এবং আসরের নামাজ দু' রাকাআতই আদায় করেছি। অথচ তখন আমাদের সংখ্যা ছিল অনেক এবং পরিবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ।

বোখারী শরীফেই রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে, হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সঙ্গে (সফরে) দু' রাকাআতই আদায় করেছি। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর খেলাফতের শেষ যুগে চার রাকাআত আদায় করতেন।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫ খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৮১
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৪১

اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ

আলোচ্য আয়াতে 'আস সালাত' শব্দ দ্বারা এখানে ফরজ নামাজ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

হানাফী মাজহাবে ৪৮ মাইল সফর হলে কসর করা ওয়াজিব। জোহর, আসর, এশা– এ তিনটি নামাজের চার রাকাআত ফরজ দু' রাকাআত থেকে যায়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, সফর স্থল ভাগে হোক বা সামুদ্রিক ভাগে বা আকাশ পথে সর্বাবস্থায়ই কসর ওয়াজিব হবে। যদিও আলোচ্য আয়াতে রয়েছে–

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ

(অর্থাৎ যখন তোমরা জমিনে ভ্রমণ কর) কিন্তু তফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ সর্বপ্রকার সফর, আর তা যেভাবেই হোক।[১]

এবনে জরীর হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ব্যবসায়ীদের একদল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে থাকি। ভ্রমণে নামাজ কিভাবে আদায় করবো? তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[২]

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, শুধু হজ্ব, ওমরা, জেহাদ বা হিজরত তথা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যে সফর হবে শুধু সে সফরেই কসর করা যাবে এমন নয়, বরং যে কোন উদ্দেশ্যে সফর হোক তাতে নামাজে কসর করা যাবে।

প্রশ্ন হলো, সফরের কোন্ পর্যায়ে নামাজের কসর শুরু হবে? এ পর্যায়ে চার ইমামই একমত যে, যে ব্যক্তি শহর বা এলাকায় বাস করে সে এলাকা বা শহর থেকে বের হবার পরই নামাজের কসর শুরু হবে।

অবশ্য ইমাম মালেক (রঃ)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, ভ্রমণকারী তার বাসস্থান থেকে তিন মাইল দূরে যাওয়ার পর নামাজে কসর করবে।

১। তফসীরে মাজেদী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১১
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৩৪
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৪৯

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, দিনে সফর শুরু করলে রাত না আসা পর্যন্ত কসর করবে না। এমনিভাবে রাত্রে সফর শুরু করলে দিন না আসা পর্যন্ত কসর করবে না।

এবনে আবি শায়বার বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আলী (রাঃ) বসরা থেকে বের হওয়ার সময় চার রাকাআতই আদায় করেছেন। শহরের জনবসতি অতিক্রম করার পূর্বে একটি ছাউনীর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, যদি আমরা এ ছাউনী পার হয়ে যেতাম তাহলে দু' রাকাআতই আদায় করতাম। অনুরূপ ভাবে যখন তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং শহরে প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন তখন যে পর্যন্ত জন বসতিতে প্রবেশ না করতেন ততক্ষণ দু' রাকাআতই আদায় করতেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আলী (রাঃ)-একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যে, কুফা শহর দেখা যায় এমন স্থানে হযরত আলী (রাঃ) দু' রাকাআত নামাজ আদায় করলেন। লোকেরা বললো কুফা এসে গেছে। তিনি বললেন, না। যতক্ষণ আমরা শহরে প্রবেশ না করি- দু' রাকাআত আদায় করতে হবে।

ভ্রমণকালে যদি চার দিন কোন শহর বা গ্রামে অবস্থান করতে হয় তবে ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, চার রাকাআত আদায় করতে হবে। আর ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে, যেখানে ২০ ওয়াক্তের উর্ধ্বে নামাজ আদায় করতে হবে সেখানে কসর হবে না, বরং পুরো নামাজ আদায় করতে হবে। আর ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন, ১৫ দিন পর্যন্ত অবস্থান করতে হলে কসর আদায় করতে হবে। এর দলিল হলো, বিদায় হজ্জের সময় প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ৪ঠা জিলহজ্জ রোজ রোববার সকালে মক্কা শরীফে আগমন করেন। ৮ জিলহজ্জ বৃহস্পতিবার দিন তিনি মিনায় গমন করেন। আর ৯ জিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর তিনি আরফায় গমন করেন। হজ্জের কাজ সুসম্পন্ন করে তিনি বুধবার রাত্রে মোহাচ্ছারে অতিবাহিত করেন এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই বিদায়ী তওয়াফ সুসম্পন্ন করেন। আর ১৪ তারিখ সকালে তিনি মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা হন। এভাবে ১২ দিনের সফর হওয়া সত্ত্বেও তিনি কসর করেন।

ইমাম তাহাবী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন তুমি ভ্রমণরত অবস্থায় কোন শহরে গমন কর এবং সেখানে ১৫ দিন অবস্থানের ইচ্ছা কর তখন পুরো নামাজ আদায় কর। আর যদি তোমার একথা জানা না থাকে যে, তুমি কতদিন সেখানে থাকবে তবে নামাজ কসর কর যতদিনই থাক না কেন।

এবনে আবি শায়বা মুজাহেদ (রঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) যদি ১৫ দিন অবস্থানের ইচ্ছা করতেন তবে তিনি পুরো নামাজই আদায় করতেন।

ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) কিতাবুল আসরে লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন, আমার নিকট মূসা এবনে মুসলিম মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, যদি তুমি মুসাফির হও এবং ১৫ দিন অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর তবে পূর্ণ নামাজ আদায় কর। আর যদি তোমার একথা জানা না থাকে কবে এখান থেকে সফর করতে হবে তাহলে তুমি কসর কর। যদি কোন ব্যক্তি কোন শহরে প্রবেশ করলো এবং সেখানে অবস্থানের কোন ইচ্ছা তার ছিল না, আজ কাল বা পরশু এখানে থেকে বেরিয়ে যাবে এমন ইচ্ছাই ছিল অথবা এমন চিন্তা ছিল যে, যখন কাজ শেষ হয় তখন সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করবে। এমন অবস্থায় বছরের পর বছরই সেখানে অবস্থান করলো তার সম্পর্কে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মত হলো এই, সে সর্বদা কসর হরবে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)- এরও একটি কথা এই যা বর্ণিত হলো। তাঁর আরেকটি কথা হলো ১৪দিন কসর করবে আর ১৫ তম দিন পুরো নামাজ আদায় করবে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর আরও একটি কথা হলো ১৭ দিন কসর করবে এবং ১৮তম দিনে পুরো নামাজ আদায় করবে। কেননা হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক সফরে ১৭ দিন ছিলেন এবং দু' রাকাআতই তিনি আদায় করেছেন। এজন্যে আমরাও ১৭ দিন পর্যন্ত দু' রাকাআত আদায় করি। (তিরমিজী)

ইমাম আহমদ (রঃ) এবং আবু দাউদ (রঃ) হযরত যাবের (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলন করেছেন যে, তাবুকে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ২০ দিন অবস্থান করেছেন এবং কসর করেছেন। আবদুর রাজ্জাক নিজের সূত্রে লিখেছেন যে, হযরত এবনে ওমর (রাঃ) আজরবাইজানে দু' মাস অবস্থান করেছেন এবং নামাজ কসর করেছেন।

বায়হাকী নিজের সূত্রে একথাও লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, আমরা আজারবাইজানে অন্যান্য মুজাহেদীনের সঙ্গে ছয় মাস ছিলাম। বরফ আমাদের পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল, এই সময় আমরা দু' রাকাআতই আদায় করেছি। তখন তাঁর সঙ্গে অন্যান্য সাহাবাগণও ছিলেন। তারাও দু' রাকাআতই আদায় করতেন।

আবদুর রাজ্জাক হাসানের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমরা হযরত আবদুর রহমান এবনে সামুরা (রাঃ)-এর সঙ্গে কয়েক বছর পারস্যে ছিলাম। তিনি দু' নামাজকে একত্রিত করতেন না। আর দু' রাকাআতের অধিক আদায় করতেন না।

আবদুর রাজ্জাক হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, আমি সিরিয়ায় আবদুল মালেক এবনে মারওয়ানের সঙ্গে দু' মাস ছিলাম এবং দু' রাকাআতই আদায় করেছি।

এখানে আরো একটি মাসআলা বর্ণনা করা প্রয়োজন তাহলো, যে নাবিক তার পরিবারবর্গ নিয়ে জাহাজে ভ্রমণ করতে থাকে অথবা যে শ্রমিক সর্বদা ভ্রমণরত থাকে তার নামাজের কি অবস্থা হবে?

তিনজন ইমামের মতে, সে সর্বদা কসর করবে। শুধু ইমাম আহমদ (রঃ) বলেছেন কসর করবে না।

অন্য একটি মাসআলাও এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যদি কোন মুসাফির অবস্থানকারী ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করে তবে তাকে চার রাকাআতই আদায় করতে হবে। তবে ইমাম মালেক (রঃ) বলেছেন, যদি সে এক রাকাআত পেয়ে যায় তবে চার রাকাআত পুরো করবে। পক্ষান্তরে, যদি ইমাম মুসাফির হয় এবং মোকতাদী হয় মুকীম তবে ইমাম দু' রাকাআত আদায় করবেন, আর স্থানীয় লোকেরা নামাজ পুরো করবে।

হযরত এমরান এবনে হোসায়েন (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি মক্কা বিজয়ের সময় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি মক্কায় ৮ রাত অবস্থান করেন। এ সময় আমরা দু' রাকাআতই পড়তাম। তিনি বলতেন, মক্কাবাসী তোমরা চার রাকাআত আদায় কর আমরা যে মুসাফির (তাই আমরা দু' রাকাআত পড়ি) যদি সফরের পূর্বে কোন নামাজ কাজা হয় তবে আদায় করতে হবে পূর্ণ নামাজ। আর যদি সফররত অবস্থায় নামাজ কাজা হয় তবে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ)-এর মতে বাড়ীতে এসে কাজা করলেও তাতে কসর করবে। ইমাম আহমদ (রঃ) ও ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে নামাজ পুরো পড়বে।[১]

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় কাফেররা তোমাদের কষ্ট দেবে তখন তোমরা নামাজ কসর কর। যদিও প্রকাশ্য দৃষ্টিতে মনে হয় নামাজ কসর করার শর্ত হলো দুশমনের ভয় কিন্তু সকল মাজহাবের ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, এটি কসর নামাজের শর্ত নয়, বরং যেহেতু অবস্থা তখন এই ছিল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সফরের সময় প্রায়ই দুশমনের আক্রমণের ভয় থাকতো, তাই একথার উল্লেখ রয়েছে। হাদীস শরীফে নামাজের কসর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে তন্মধ্যে কিছু ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

আয়াতের অর্থ

আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো যদি তোমরা ভয় কর যে, রুকু সেজদা পূর্ণ করার সময় কাফেররা তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করে ফেলবে অথবা এর অর্থ হলো যদি

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৪৬-৪৮

তোমরা ভয় কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করবে তাদের শত্রুতার কারণে। এরপর এরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا

অর্থাৎ কাফেররা তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু আর তোমাদের ও তাদের মধ্যে এ শত্রুতা অতি পুরনো আর যেহেতু বর্তমানে তোমরা তাদের মোকাবেলায় দাঁড়িয়েছ তাই তাদের শত্রুতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তাদের শত্রুতার কারণেই তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্দত হয়েছে এবং যদি শক্তি থাকে তবে তোমাদের নিশ্চিহ্ন করারও পরিকল্পনা তাদের রয়েছে। যদি তোমাদের নামাজ দীর্ঘ হয় তবে তারা তোমাদেরকে হত্যা করার সুযোগ পেয়ে যাবে। তাই নামাজে কসর করার অনুমতি দেয়া হলো।[১]

ইমাম আহমদ (রঃ) এবং বায়হাকী দালায়েলে এবং হাকেম মোসতাদরাকে হযরত আবু ইয়াশ জার্কীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমরা আসফান নামক স্থানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। একটু পরেই দেখি মুশরেক আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। তাদের সরদার ছিল খালেদ এবনে ওয়ালিদ (তখনও তিনি ইসলাম কবুল করেননি)। মুশরেকরা আমাদের এবং কেবলার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে জোহরের নামাজ আদায় করেন। তখন মুশরেকরা বলতে লাগলো এটি অত্যন্ত সুবর্ণ সুযোগ ছিল যে, আমরা তাদের প্রতি হামলা করতে পারতাম। এরপর তারা নিজেরাই বললো এ সুযোগতো চলে গেলো, যাহোক এরপর তাদের প্রতি হামলা করা যাবে। তখন জীব্রাঈল (আঃ) এ আয়াত নিয়ে আসলেন ঃ

وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ

যাহোক, নামাজের সময় যখন হলো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন যে, তোমরা যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে রাখ। তাঁর হুকুমে সকলেই যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে নিয়ে নিল। আমরা তাঁর পশ্চাতে দুটি কাতার তৈরী করি। তিনি রুকু করলে আমরা রুকু করি। এরপর তিনি যখন মাথা মুবারক উত্তোলন করলেন আমরাও মাথা উত্তোলন করলাম। এরপর যখন তিনি সেজদায় গমন করলেন তখন তাঁর নিকটস্থ (অর্থাৎ প্রথম) কাতার সেজদা করলো। আর অন্য লোকেরা দণ্ডায়মান অবস্থায় নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করলো। যখন প্রথম কাতারের লোকেরা সেজদা শেষ করে

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-২২-২৩
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৪৮

দণ্ডায়মান হলো তখন দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা উপবিষ্ট হলো এবং প্রথম কাতারের লোকদের স্থানে সেজদা করলো। এরপর প্রথম দল দ্বিতীয় দলের স্থানে এবং দ্বিতীয় দল প্রথম দলের স্থানে এসে পড়লো। সূরা পাঠের পর সকলে একত্রিত হয় রুকু করলো। এরপর একত্রে সকলে মাথা উত্তোলন করলো। এরপর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেজদা করলেন এবং সালাম ফেরালেন।

এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সালাতুল খওফ দু'বার আদায় করেছেন। একবার আসফানে, আরেকবার বনী সলীম গোত্রের এলাকায়।

ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত যাবের (রাঃ)-এর বর্ণনা থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সালাতুল খওফের এ বিবরণই পেশ করেছেন।

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ

অর্থাৎ (হে রসূল!) যখন আপনি তাদের মধ্যে বর্তমান থাকেন এবং দুশমনের ভয় থাকে, একথাটি দ্বারা বোঝা যায় যে, যখন দুশমনের ভয় খাকে এবং হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থাকেন তখন সালাতুল খওফ আদায় করতে হবে। আর এ মতই পোষণ করেন ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)। তাঁর মতে, সালাতুল খওফ শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে খাস ছিল। কিন্তু অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরে সাহাবায়ে কেরাম সালাতুল খওফ আদায় করেছেন। কেউ তাতে আপত্তি করেনি। অতএব, সালাতুল খওফের উপর উম্মতের এজমা হয়ে গেছে। আবু দাউদে সংকলিত বর্ণনায় রয়েছে যে, মুজাহেদগণ হযরত আবদুর রহমান এবনে সামুরার সঙ্গে কাবুলে জেহাদ করেন। তিনি সালাতুল খওফ আদায় করেন। আবু দাউদেরই আরও একটি বর্ণনা রয়েছে যে, সিফ্ফীনের যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রাঃ) সালাতুল খওফ আদায় করেছেন।

বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হযরত সাদ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) তাবরিস্তানের যুদ্ধের সময় সালাতুল খওফ আদায় করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে হযরত হাসান এবনে আলী (রাঃ), হযরত হোজায়ফা এবনে ইয়ামান (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনে আস (রাঃ) ছিলেন।

فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি যখন মুসলমানদের মধ্যে থাকেন তখন তাদেরকে এভাবে নামাজ আদায় করান যে, নামাজীদেরকে দু' ভাগে বিভক্ত করুন। একভাগ

আপনার সাথে দণ্ডায়মান হবে, আপনি তাদেরকে নিয়ে নামাজ শুরু করে দিন এবং এই দল তাদের হাতিয়ার সঙ্গে রাখবে।

(ইমাম মালেক (রঃ) এবং ইমাম শাফেয়ীর (রঃ)-এর মতে, হাতিয়ার সঙ্গে রাখা ওয়াজিব) যখন তারা সেজদা করবে এবং প্রথম রাকাআত শেষ করবে তখন তারা সকলের পেছনে তথা দুশমনের মোকাবেলায় চলে যাবে এবং যে দল নামাজ আদায় করেনি তারা তাদের স্থানে হাযির হবে এবং তারা আপনার সঙ্গে নামাজ আদায় করবে এবং তারা আত্মরক্ষার্থে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার সঙ্গে রাখবে।

ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম হযরত যাবের (রাঃ)-এর বর্ণনায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন জাতুররেকা নামক স্থানে পৌছি তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদল লোককে দু' রাকাআত নামাজ আদায় করালেন। এরপর তারা পেছনে চলে আসে এবং তিনি দ্বিতীয় দলকে আবার দু'রাকাআত পড়ান। এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চার রাকাআত এবং আমাদের দু' দু' রাকাআত হলো, এই হাদীসের অর্থ দু' ভাবে হতে পারে–

(১) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চার রাকাআত একই সালামে আদায় করেছেন। আর উভয় দলের মধ্যে প্রত্যেকে দু' দু' রাকাআত আদায় করেছেন।

(২) আর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদলের সঙ্গে দু' রাকাআত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে ফেলেছেন। এরপর দ্বিতীয় দলের সঙ্গে দু' রাকাআত আদায় করে তাদের সঙ্গে সালাম ফিরিয়েছেন।

হযরত যাবের (রাঃ)-এর বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً

"আর কাফেররা এ আকাঙ্ক্ষা করে যে, তোমরা যদি তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং মালপত্র সম্পর্কে গাফেল হও তবে তারা হঠাৎ তোমাদের প্রতি আক্রমণ করে বসবে"।

এ আয়াতে নামাজের সময় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকার যে আদেশ প্রদান করা হয়েছে তার কারণ বর্ণিত হয়েছে। কালবী সালেহের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে

আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বনী মারেফ এবং বনী আমসারের বিরুদ্ধে জেহাদে গমন করেন। পথে এক স্থানে তারা বিশ্রাম করেন সেখানে দুশমনের কোন লোক দেখা যায়নি। সেজন্যে লোকেরা হাতিয়ার খুলে রেখেছিলেন। স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও হাতিয়ার খুলে রেখেছিলেন এবং প্রয়োজনের তাগিদে তিনি সাহাবায়ে কেরাম থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন। একটি বৃক্ষের নীচে তিনি বসেছিলেন। গোয়াইরাশ এবনে হারেস মহারিবী নামক এক ব্যক্তি তাঁকে দেখে ফেলেছিল। সে বললো আল্লাহ আমাকে হত্যা করুক, যদি এ ব্যক্তিকে আমি হত্যা না করি। এরপর সে তরবারি উঁচু করে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে অবতরণ করলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলো, এখন আমার হাত থেকে আপনাকে কে রক্ষা করবে? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ।

অতঃপর দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে ইচ্ছা গোয়াইরাশ এবনে হারেস থেকে রক্ষা কর। গোয়াইরাশ তাঁর প্রতি আঘাত করার জন্যে তরবারি উঁচু করে উদ্দত হলো ঠিক এমন সময় তার কাঁধের মধ্যে হঠাৎ ব্যথা উঠল। আর ব্যথার কারণে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, তরবারিটি তার হাত থেকে ছিটকে দূরে পড়লো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে তরবারি হাতে নিলেন এবং বললেন, গোয়াইরাশ, এবার তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? সে বললো কেউ নয়, তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তুমি কি এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বন্দা এবং রসূল, তাহলে তোমার তরবারি আমি তোমাকে দিয়ে দেব। সে বললো, না আমি এ সাক্ষ্য দেব না। তবে হ্যা একথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার সঙ্গে কোন দিন যুদ্ধ করবো না। আর আপনার বিরুদ্ধে কোন দিন কোন শত্রুকে সাহায্য করবো না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে তার তরবারি দিয়ে দিলেন। তখন সে বললো, আল্লাহর শপথ, আপনি আমার চেয়ে উত্তম। এরপর গোয়াইরাশ চলে গেলো। তার ভ্রাতঃস্পুত্রের নিকট পৌঁছলে তারা জিজ্ঞাসা করলো তোমার কি হয়েছে? কোন্ বস্তু তোমাকে বিরত রেখেছে? সে বললো, আমি আঘাত করার জন্যে তরবারি উত্তোলন করেছি। এরপর আমি বুঝতেই পারিনি কে আমার দু' কাধের মধ্যখানে এমন ব্যথা সৃষ্টি করেছে এবং আমি মুখ থুবড়ে পড়েছি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছেঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى

এবং বৃষ্টির কারণে অথবা তোমরা যদি রুগ্ন হও বা তোমাদের হাতিয়ারের বোঝা বহন করতে কষ্ট হয় তাহলে হাতিয়ার খুলে রাখতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। তবে তোমাদের নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করে নিও। তথা কোন

সংরক্ষিত স্থানে থাক যাতে করে দুশমন আকস্মিক আক্রমণ করতে না পারে সে ব্যবস্থা অবশ্যই করে নিও। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যে কোন মূল্যে প্রাণ রক্ষায় সর্বাত্মক চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য। অহেতুক বিপদ ডেকে আনার অনুমতি নেই।

إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক কাফেরদের জন্যে অত্যন্ত অপমানজনক শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন। দুনিয়াতে হত্যা বা বন্দীদশা, আখেরাতে দোযখের শাস্তি।

পূর্ববর্তী আয়াতে মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দেয়া হয়েছিল আর এ আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং মুসলমানদের বিজয় লাভের ওয়াদা রয়েছে যাতে করে মুসলমানদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে, তাদেরকে আত্মরক্ষার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার কারণ দুর্বলতা নয়, বরং আল্লাহ্ পাকের বিধানই এই যে, কোন পন্থা অবলম্বন করে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা করা হোক।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফের সম্পর্কে কেননা, তিনি ছিলেন আহত এবং দেহ ছিল ক্ষত-বিক্ষত এবং এ কারণে তাঁকে হাতিয়ার খুলে রাখার অনুমতি দেয়া হয়।

আয়াতের মর্মকথা

আলোচ্য আয়াতে সালাতুল খওফের বিবরণ রয়েছে। কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় কিভাবে নামাজ আদায় করতে হবে তার বিবরণ রয়েছে এ আয়াতে। মুসলিম বাহিনীকে দু' ভাগে বিভক্ত করতে হবে। একভাগ ইমামের সঙ্গে অর্ধেক নামাজ আদায় করে শত্রুর মোকাবেলায় চলে যাবে। আর দ্বিতীয় দল এসে ইমামের পেছনে দাড়াবে। ইমাম সালাম ফিরিয়ে নিলে প্রত্যেক দলই তার অবশিষ্ট নামাজ একা একা আদায় করবে। বৃষ্টি অথবা রোগের কারণে যদি হাতিয়ার বহন করা কষ্টদায়ক হয় তবে হাতিয়ার খুলে রাখতে কোন গুনাহ নেই। যদি দুশমনের হামলার আশঙ্কা অত্যন্ত বেশী থাকে তবে একা একাই পদাতিক অবস্থায় নামাজ আদায় করবে। যদি কোন যানবাহন থেকে অতবরণ করা কঠিন হয় তবে আরোহী অবস্থায় ইঙ্গিতে নামাজ আদায় করবে। যদি অবস্থা এতই বিপজ্জনক হয় তবে নামাজ কাজা করবে।

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٣﴾ وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٠٤﴾

তরজমা

(১০৩) এরপর যখন তোমরা নামাজ আদায় কর তখন আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ কর দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায়। পরে যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন নামাজ কায়েম কর, নিশ্চয় নামাজ মোমেনদের জন্যে নিদৃষ্ট সময়ে ফরজ করা হয়েছে।

(১০৪) এবং সেই কাফের দলের অনুসন্ধানে তোমরা সাহস হারা হয়োনা, যদি তোমাদের কষ্ট হয়ে থাকে তবে তাদেরও তো কষ্ট হয়েছে, যেমন তোমাদের কষ্ট হয়েছে। এবং তোমরা (সে কষ্টের বিনিময়ে সওয়াবের) আশা রাখ যে আশা তারা রাখে না এবং আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

তফসীরুল কোরআন

এরপর যখন তোমরা নামাজ সুসম্পন্ন কর তখন আল্লাহ পাকের স্মরণে মশগুল হয়ে যাও, দণ্ডায়মান অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায় এবং শায়িত অবস্থায়। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় তোমরা তসবীহ-তাহলীলে মশগুল থাক। আল্লাহ পাককে স্মরণ করতে থাক। হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবস্থা বর্ণনা করেছেনঃ

كَانَ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِىْ كُلِّ اَحْيَانِه

তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকরে মশগুল থাকতেন। (আবু দাউদ)

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, সর্বদা আল্লাহর জিকরই বন্দার করণীয় কাজ। আর এ জিকর দ্বারা জিকর কলবী উদ্দেশ্যে। জিকর রসনা দ্বারাও হয় এবং অন্তর দ্বারাও হয়। সর্বদা রসনা দ্বারা জিকর সম্ভব না হলেও অন্তর দ্বারা সর্বদা জিকর সম্ভব।

আয়াতের অন্য অর্থ

তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণ এ আয়াতের অন্য অর্থও করেছেন, যখন তোমরা সালাতুল খওফ সুসম্পন্ন করে অবসর পেলে তখন আল্লাহর জিকরে মশগুল হও। নামাজ আদায় কর, সুস্থ অবস্থায় দণ্ডায়মান হয়ে এবং অসুস্থ অবস্থায় বা আহত হবার কারণে অথবা অন্য কোন দৈহিক অসুবিধার কারণে উপবিষ্ট হয়ে অথবা শায়িত হয়ে।[১]

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, নামাজ কোন অবস্থাতেই মাফ হয় না। যে কোন অবস্থায় অবশ্যই নামাজ আদায় করবে হবে। সুস্থ অবস্থায় দণ্ডয়মান হয়ে আর রুগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট হয়ে। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে শায়িত অবস্থায়ও অবশ্যই নামাজ আদায় করতে হবে। অজুর পানি না থাকলে তৈয়ম্মুম করেও নামাজ আদায় করতে হবে। এমনকি দুশমনের মোকাবেলায় যুদ্ধরত অবস্থায়ও নামাজ আদায় করতেই হবে, যার বিবরণ পূর্ববর্তী আয়াতে স্থান পেয়েছে।

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াতের দুটি অর্থ (১) যখন তোমরা সালাতুল খওফ সুসম্পন্ন করলে তখন আল্লাহর জিকরে মশগুল হয়ে যাও। সকল অবস্থায় আল্লাহর জিকর জারী রাখ। যেহেতু তোমরা দুশমনের মোকাবেলায় রয়েছ তাই আল্লাহর জিকরের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হও এবং তাঁর দরবারে মিনতি জানিয়ে তাঁর সাহায্য কামনা কর। (২) আলোচ্য আয়াতে 'জিকর' শব্দটির অর্থ হলো নামাজ। তাহলে আয়াতের অর্থ হবে তোমরা দণ্ডায়মান অবস্থায় নামাজ পড়। যখন তোমরা যুদ্ধরত থাক আর যখন তোমরা তীর নিক্ষেপ কর উপবিষ্ট অবস্থায় তখন ঐ অবস্থাতেও নামাজ আদায় কর। আর যদি তোমরা আহত হও আর আহত হয়ে জমিনে লুটিয়ে পড় তখন শায়িত অবস্থায়ও নামাজ আদায় কর।[২]

فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৫৭
২। তফসীরে কবীর খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-২৮

অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও, দুশমনের ভয় দূর হয় তখন তোমরা নিয়ম মাফিক নামাজ আদায় কর। নামাজের যাবতীয় আরকান-আহকাম সঠিকভাবে পালন কর।

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

(নিশ্চয় মোমেনদের উপর নিদৃষ্ট সময়ে নামাজ ফরজ করা হয়েছে।) যে কোন মূল্যে নামাজ তার নিদৃষ্ট সময়েই আদায় করতে হবে। যদি কেউ অসুস্থ হয়ে থাকে তবে উপবিষ্ট অথবা শায়িত অবস্থায় হলেও নামাজ আদায় করতে হবে। এমনকি যুদ্ধরত অবস্থায়ও নামাজ মাফ হয় না। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নামাজের মধ্যে বিভিন্ন আচরণ তখনকার পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যখন নিরাপদ বা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে তখন নামাজ সঠিক ভাবে আদায় করতে হবে। যখন খুশী যেমন খুশী আদায় করা চলবে না। বস্তুতঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক নামাজ আদায়ের বিস্তারিত নির্দেশ প্রদান করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতে ভ্রমণ–রত অবস্থায় কসর নামাজের এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় নামাজ তথা সালাতুল খওফের বিবরণ রয়েছে। এরপর এরশাদ হয়েছে–

فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ

অর্থাৎ যখন যুদ্ধকালীন অবস্থা না থাকে বা প্রবাস থেকে আবাসে ফিরে আস, মনে কোন প্রকার অস্থিরতা-ব্যাকুলতা এবং ভয়-ভীতি না থাকে তবে যথাযথ নিয়মে সঠিকভাবে নামাজ আদায় কর। মনে রেখো, নামাজ নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ হয়েছে। ঐ সময়ের মধ্যেই নামাজ আদায় করতে হবে।[১]

নামাজের সময়

নামাজের সময় সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ)। এ বর্ণনায় রয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জীব্রাঈল (আঃ) কা'বা শরীফের নিকট দু' বার আমার ইমামতি করেছেন। (আল হাদীস)

এই সুদীর্ঘ হাদীসে নামাজের সময় বর্ণিত হয়েছে। প্রথম দিন নামাজের সময় যখন শুরু হয় তার পরিচয় পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় দিন নামাজের সময় কখন শেষ হয় তার সন্ধান পাওয়া যায়। হযরত বোরায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট নামাজের সময় সম্পর্কে

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-২৮

জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি এরশাদ করলেন, তুমি দু'দিন আমার সঙ্গে নামাজ পড়। প্রথমদিন সূর্য একটু ঢলে পড়লে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাঃ)-কে আজান দেয়ার আদেশ দিলেন।

হযরত বেলাল (রাঃ) আজান দিলেন। এরপর তাঁকে একামত দেয়ার আদেশ দিলেন। আদেশ মোতাবেক তিনি একামত দিলেন। এরপর সূর্য যখন খুব উঁচুতে ছিল এবং অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল তখন তিনি বেলালকে আদেশ দিলে, বেলাল (রাঃ) আসরের একামত বললেন। এরপর সূর্য যখন অস্ত গেল তখন আদেশ মোতাবেক হযরত বেলাল (রাঃ) মাগরিবের একামত বললেন। এরপর আদেশ মোতাবেক এশার একামত দিলেন তখন যখন পশ্চিমাকাশের লাল বর্ণ আত্মগোপন করেছে। আর আদেশ মোতাবেক ফজরের একামত তখন বললেন যখন পূর্বাকাশে আলো দেখা দেয়।

এরপর দ্বিতীয় দিন জোহরের তকবীর তখন বললেন যখন সূর্যের তাপ একটু কমে গেল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এমন সময় জোহর আদায় করলেন যখন সূর্যের তাপ ইতঃস্তত কম ছিল। এরপর আসর এমন সময় আদায় করলেন যখন সূর্য উঁচুতেই ছিল কিন্তু পূর্বের দিনের চেয়ে একটু বিলম্ব হলো। আর মাগরিবের নামাজ তখন আদায় করলেন যখন পশ্চিমাকাশে লাল বর্ণ বিদায় নেয়ার অল্প সময় বাকী ছিল। আর এশার নামাজ তখন আদায় করলেন যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ শেষ হলো। আর ফজরের নামাজ তখন আদায় করলেন যখন আলো ঝলমল করছিল। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, সে ব্যক্তি কোথায় যে নামাজের সময় জানতে চেয়েছিল? সে ব্যক্তি আরয করলো, আমি হাযির আছি। ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! তিনি এরশাদ করলেন, তুমি আমার যে নামাজগুলো দেখেছ তার মধ্যেই রয়েছে তোমাদের নামাজের সময়।[১] (মুসলিম শরীফ)

ফজর এবং মাগরিবের নামাজের সময় সম্পর্কে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ)। এই হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে এক রাকাআত পেয়েছে সে ফজরের নামাজ পেয়েছে। আর যে সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকাআত পেয়েছে সে আসরের নামাজ পেয়েছে।

বোখারী এবং মুসলিম হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। এশার শেষ সময় সোবহে সাদেক পর্যন্ত একথা কোন হাদীসে আসেনি। এশার শেষ সময়ের নির্ধারণ সম্পর্কে হাদীস শরীফের কিছু শাব্দিক মতভেদ রয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৫৮-৫৯

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এশার নামাজকে বিলম্বিত করেছেন। আর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এশার নামাজ অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এশার নামাজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এত বিলম্ব করেছেন যে, রাতের দু' তৃতীয়াংশ বিদায় নিয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এশার নামাজ এমন সময় পড়েছেন যখন রাতের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। এই সমস্ত হাদীস বিশুদ্ধ গ্রন্থ সমূহে সংকলিত হয়েছে। ইমাম তাহাবী (রঃ) লিখেছেন, এই সমস্ত হাদীসকে একত্রিত করলে যা প্রমাণিত হয় তা হলো, সারা রাতই এশার নামাজের সময়। কিন্তু পার্থক্য রয়েছে মর্তবায়। এক তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত এশার নামাজ উত্তম। এরপর অর্ধেক রাত পর্যন্ত বৈধ কিন্তু ফজিলত কম। আর অর্ধেক রাতের পর সবচেয়ে কম মর্তবা। ইমাম তাহাবী (রঃ) নাফে এবনে যোবায়েরের বর্ণনা সংকলন করেছেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরীকে লিখেছেন, এশার নামাজ রাতের যে কোন অংশেই আদায় করতে পার। কিন্তু এ নামাজ সম্পর্তে গাফলত করোনা। ইমাম মুসলিম হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নিদ্রায় কোন দোষ নেই (এর অর্থ হচ্ছে কারো নিদ্রার কারণে যদি নামাজ কাজা হয়ে যায় তবে তাতে কোন দোষ নেই। কিন্ত শর্ত হলো জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গে নামাজ আদায় করে নিতে হবে। কেউ যদি জাগ্রত হবার পর নামাজে উদাসীন থাকে অথবা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে যায় এবং নামাজ না পড়ে তবে তার জন্যে অবশ্যই সে গুনাহগার হবে) বরং দোষ হলো কোন নামাজ এত বিলম্বে আদায় করা যে, পরবর্তী নামাজের সময় চলে আসে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এই হাদীসের শেষ বাক্যটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এশার নামাজের সময় ফজরের নামাজের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। এতদ্ব্যতীত, এ ব্যাপারে তত্ত্বজ্ঞানী আলেম সমাজ একমত যে, যদি রাতের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে আর সে সময় কোন কাফের মুসলমান হয় অথবা কোন স্ত্রীলোক হায়েজ থেকে পাক হয় অথবা কোন নাবালক ছেলে রাতের শেষ প্রহরে বালেগ হয় এমন অবস্থায় সকলের উপরই এশার নামাজ ফরজ হবে।

وَلَا تَهِنُوْا فِىْ ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, ওহোদের যুদ্ধের পর আবু সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্যে যখন কিছু লোককে নির্দেশ প্রদান করা হয় তখন কেউ কেউ তাঁদের আহত হওয়ার এবং ক্ষত বিক্ষত হওয়ার কষ্টের কথা বলেছিলেন। তারই জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবনে তাদের অনুসন্ধানে হে মোমেনগণ! তোমরা ভীত হয়োনা। যদি তোমরা আহত হয়ে থাক তবে তারাও তোমাদের ন্যায় আহত হয়েছে। সংঘাতে তোমাদের ন্যায় তারাও অংশীদার। কিন্তু বড় কথা হলো পরিণামে কি উভয়ে সমান? কেননা, তোমাদের শুভ পরিণতি আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে সুনিশ্চিত। তোমাদের সওয়াব অবধারিত। জেহাদের এ কঠিন সংগ্রামের জন্যে তোমরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে সওয়াবের আশা কর এবং আল্লাহ পাকও তোমাদেরকে উত্তম বিনিময় দানের কথা ঘোষণা করেছেন। অথচ কাফেরদের পরিণাম শোচনীয়, ভয়াবহ। তাদের ভবিষ্যত সম্পূর্ণ অন্ধকার। আল্লাহ্ পাক তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল এবং তিনি বিজ্ঞানময়। তিনি যে আদেশ প্রদান করেন অথবা কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন তবে তার মধ্যে নিহিত কল্যাণ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, এ বিবরণ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, এ আয়াত গজওয়ায়ে হামরা-উল-আসাদ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।[১] ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, জেহাদ সম্পর্কীয় কিছু জরুরী বিধি-নিষেধ বর্ণনার পর পুনরায় জেহাদে উৎসাহিত করতে এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে মোমেনগণ! তোমরা জেহাদে দুর্বলতা প্রকাশ করোনা, সাহস হারা হয়োনা। কেননা, ক্ষতবিক্ষত হওয়ার ব্যাপারে কাফের এবং তোমরা একই অবস্থায় রয়েছ কিন্তু পরিণামের ব্যাপারে তোমাদের ও তাদের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কেননা, আখেরাতে জেহাদের জন্যে তোমরা বিরাট সওয়াব পাবে আর এ জেহাদ পরিত্যাগে তোমাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে, আর আল্লাহ পাকের দরবারে তোমরা এ জেহাদের জন্যে বিশেষ সওয়াবের আশা রাখ কিন্তু তারা কোন সওয়াবের আশা রাখে না। তোমরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী কর। তাই তাঁর নিকট সওয়াবের আশা করা নিতান্ত যুক্তিযুক্ত এবং যথার্থ। কিন্তু মুশরেকরা উপাসনা করে মূর্তির আর তা হলো প্রাণহীন বস্তু। অতএব, তাদের কাছে কোন কিছুই আশা করার নেই।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৩২

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এমন কোন কাজে কষ্ট দেননা এবং তিনি তোমাদেরকে কোন আদেশ প্রদান করেন না, এমনিভাবে তিনি তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নিষেধও করেন না যদি তাতে তোমাদের দুনিয়া বা আখেরাতের কোন প্রকার কল্যাণ নিহিত না থাকে। অতএব, আল্লাহ পাকের হুকুম পালনে তৎপর হওয়া এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, যেহেতু আল্লাহ পাক সব বিষয়ে মহাজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানময় তাই তিনি সে আদেশই প্রদান করেন যাতে তোমাদের সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অতএব, তোমাদের মধ্যে জেহাদের জন্যে আগ্রহ থাকা উচিত এবং পৃথিবীতে আল্লাহর কলেমার প্রসার এবং প্রতিষ্ঠার জন্যে অস্থিরতা এবং ব্যাকুলতা থাকা উচিত।[২]

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো যেহেতু আল্লাহ পাক সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী তাই দুশমনদের দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। আর যেহেতু তিনি বিজ্ঞানময় তাই তোমাদের সাধ্যাতীত কষ্টকর কাজের নির্দেশ তিনি প্রদান করেন না।

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۖ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ
لَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ
الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾ هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ
عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩১
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫ খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৮৬
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৩৩

তরজমা

(১০৫) (হে রসূল!) নিশ্চয় আমি আপনার নিকট সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যেন আপনি আল্লাহ পাক আপনাকে যেমন দেখিয়েছেন সে অনুসারে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করেন এবং আপনি ঐ বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ সমর্থনকারী হবেন না।

(১০৬) এবং আপনি আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।

(১০৭) যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে (হে রসূল!) আপনি তাদের পক্ষ সমর্থন করে বিতর্ক করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক বিশ্বাসঘাতক ও মহাপাপীকে পছন্দ করেন না।

(১০৮) (এসব লোকের অবস্থা এই যে) তারা মানুষ থেকে আত্মগোপন করে থাকে (কিন্তু) আল্লাহ পাক থেকে কিছুই গোপন করতে পারেনা অথচ তারা যখন রাত্রির অন্ধকারে তাঁর অপছন্দনীয় কথায় মগ্ন হয় তখন তিনি তাদের সাথে থাকেন এবং আল্লাহ পাক তাদের কার্যাবলীকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

(১০৯) হুশিয়ার, তোমরাই সেসব লোক যারা তাদের পক্ষে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন সম্পর্কে বিতর্ক করছো। কিন্তু কেয়ামতের দিন তাদের পক্ষে আল্লাহ্ পাকের দরবারে কে বিতর্কে লিপ্ত হবে? অথবা কে তাদের পক্ষে উকিল হয়ে কাজ করবে?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এরপর জেহাদের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এরপর কোন মুসলমানকে ভুলবশতঃ কাফের ভেবে হত্যা করার ঘটনা এবং এ পর্যায়ের বিধান পেশ করা হয়েছে। এরপর যেহেতু মুসলমানদের বিভিন্ন স্থানে সফরের প্রয়োজন হতো এবং সফরে নামাজের যে বিধান রয়েছে তা বর্ণিত হয়েছে এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় নামাজের বিধান এবং পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতে পুনরায় মুনাফেকদের কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং মুনাফেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাদের মিথ্যাবাদীতার মাধ্যমে প্রতারণা করার যে অপচেষ্টা করতো এবং তাঁর তরফ থেকে বাতিলের পক্ষে আদেশ গ্রহণের অপপ্রয়াস চালাতো আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে তাঁকে অবগত করেছেন এবং তাদের কথা গ্রহণ না করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এতদ্ব্যতীত কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ পাক জেহাদের আদেশ দিয়েছেন সত্য, কিন্তু তাদের প্রতি এমন কোন অপবাদ আরোপের অনুমতি দেয়া হয়নি যা তারা করেনি। এ বিষয়ের প্রতিও আলোচ্য আয়াতে আলোকপাত করা হয়েছে।

শানে নুযুল

অধিকাংশ তফসীরকারগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আলোচ্য আয়াত সমূহ তোওমা এবনে আবরক নামক এক মুনাফেক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে অবশ্য এ ঘটনার বিভিন্ন বিবরণ বর্ণিত আছে।

১. তোওমা নামক এ ব্যক্তি একজনের যুদ্ধাস্ত্র চুরি করেছিল। যখন এর খোঁজ করা হয় তখন তা তোওমা একজন ইহুদীর বাড়ীতে ফেলে আসে। এরপর এ বিষয়ে তোওমার সম্প্রদায় এবং ইহুদীদের মধ্যে বিরোধ জোরদার হয়, তোওমার ঘণিষ্টরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করে এবং ইহুদীদেরকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্যে অনুরোধ করতে থাকে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির নিকট তার যুদ্ধাস্ত্র আমানত রাখে। তখন কোন সাক্ষী ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তার আমানত কৃত বস্তু সে ফেরত চায় তখন তা ফেরত দিতে ঐ ব্যক্তি অস্বীকার করে।[১]

২. এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি, তিরমিজী, হাকেম হযরত কাতাদা এবনে নোমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মদীনায় বনী আবরক নামক একটি পরিবার ছিল। এরা ছিল তিন ভাই, বশর, বশীর মোবাশশের। বশির মুনাফেক ছিল। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনায় সে কবিতা রচনা করতো এবং অন্য কোন আরব কবির নামে তা প্রচার করতো এবং বলতো, এ কবিতাটি অমুক কবি রচনা করেছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এবং পরে এরা অত্যন্ত দারিদ্র-পীড়িত ছিল। তখনকার দিনে মদীনা শরীফের অধিবাসীদের সাধারণ খাদ্য ছিল খেজুর এবং জব। (কাতাদা এবনে নোমান বলেনঃ) আমার চাচা রোফা এবনে যাইদ এক বস্তা আটা ক্রয় করে ঘরের একটি নিদৃষ্ট স্থানে রেখেছিলেন সেখানে তাঁর হাতিয়ারসহ যুদ্ধের অন্যান্য সরঞ্জামও ছিল কিন্তু রাতে সিঁধ কেটে চোর আটা এবং হাতিয়ার চুরি করে নিয়ে যায়। সকালে চাচা রোফা আমার নিকট আগমন করেন এবং বললেন, রাতে আমার প্রতি এই জুলুম হয়েছে যে, আমার আটা এবং হাতিয়ার পত্র চুরি হয়ে গেছে। আমি যখন চতুর্দিকে খোঁজ-খবর নিলাম তখন জানতে পারলাম যে, বনি আররকের বাড়ীতে আজ রাতে চুলা জ্বলেছে। এ থেকে এ ধারণা করা যায় যে তারাই এ কাজটি করেছে, জিজ্ঞাসাবাদের পর বনী আবরক বললো, আমাদের ধারণায় এ কাজটি লবিদ এবনে সোহায়েল করেছে। লবিদ ছিলেন একজন নেককার মুসলমান। যখন তাঁর প্রতি অপবাদ দেয়া হলো

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩১

তখন তিনি তরবারি উঁচু করে বললেন, আল্লাহর শপথ, চুরির মাল হাযির কর, অন্যথায় এ তরবারি তোমার দেহে প্রবেশ করাবো। বনী আবরক বললো না, আমরা আপনার প্রতি চুরির অপবাদ দিচ্ছি না। এরপর খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে, বনী আবরকই চুরি করেছে। তখন বিষয়টি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করার সিদ্ধান্ত হলো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে কাতাদা (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের এলাকার কিছু লোক আমার চাচার প্রতি জুলুম করেছে। তাঁর হাতিয়ার এবং খাদ্য দ্রব্য চুরি করে নিয়ে গেছে, খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন নেই কিন্তু হাতিয়ারতো ফেরত পাওয়া উচিত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমি বিষয়টি দেখবো, এদিকে বনী আবরক যখন এ খবর পেল তখন তারা আমিন এবনে ওরওয়া নামক এক ব্যক্তির নিকট গমন করলো এবং এ বিষয়ে তার সাথে কথা বললো। সেখানে এলাকার অনেকে একত্রিত হয়েছিল। তারা বললোঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! কাতাদা এবনে নোমান এবং তাঁর চাচা আমাদের গোত্রের কিছু নেককার মুসলমানের উপর কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য বা দলিল-প্রমাণ ব্যতীতই চুরির অপবাদ দিয়েছে। হযরত কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলাম তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমরা এমন লোকের প্রতি চুরির অপবাদ দিয়েছ যাদের নেকী সম্বন্ধে আমার নিকট আলোচনা করা হয়েছে। ঠিক এর কিছুক্ষণ পরই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হাতিয়ারগুলো হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করা হলো। তিনি তা হাতিয়ারের মালিক রোফাকে ফেরত দিলেন এবং বশির পলায়ন করে মুশরেকদের নিকট চলে গেল এবং সালাফা বিনতে সাদের নিকট আশ্রয় নিল। তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করলেনঃ

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى

এবনে সাদ তবকাতে এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন এবং একথাও লিখেছেন যে, বশির মুরতাদ হয়ে (ধর্মত্যাগী হওয়া) মক্কায় চলে গিয়েছিল। এ ঘটনা ঘটে ৪র্থ হিজরীর রবিউস-সানী মাসে।

বগবী (রঃ) লিখেছেন যে, কালবী (রঃ) আবু সালেহের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর এবনে জরীর এ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে তোওমা এবনে আবরক নামক এক আনসারী ব্যক্তির নামে। সে বনী জাফর এবনে হারেসের গোত্রীয় লোক ছিল। সে

তার প্রতিবেশী কাতাদা এবনে নোমানের হাতিয়ার চুরি করেছিল। হাতিয়ারগুলো একটি থলেতে ছিল আর থলেটি আটায় পূর্ণ ছিল। থলেটিতে ছিদ্র ছিল এবং ঐ ছিদ্র দিয়ে আটা পড়ে যাচ্ছিল। এভাবে চোরের বাড়ী পর্যন্ত আটার চিহ্ন পড়েছিল। তোওমা হাতিয়ারগুলো জায়েদুস সামীন নামক এক ইহুদীর নিকট রেখে এসেছিল। যখন হাতিয়ারের খোঁজে তোওমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, সে তখন শপথ করে বললো, আমি হাতিয়ার নেইনি। আর এ সম্পর্কে কিছুই জানিও না। যাদের এ হাতিয়ার ছিল তারা বললো, আমরা আটার চিহ্ন তার বাড়ী পর্যন্ত দেখে এসেছি কিন্তু তোওমা শপথ করে যখন অস্বীকার করলো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিল এবং আটার চিহ্ন ধরে ইহুদীর বাড়ী পৌঁছালো। ইহুদী বললো আমাকে তোওমা এবনে আবরক এ হাতিয়ারগুলো দিয়েছে। তখন তোওমার সম্প্রদায় বনী জাফর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করলো, আপনি দয়া করে আমাদের লোকটির অভিভাবক হোন অন্যথায় সে অপমানিত হবে। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহুদীকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করলেন।[১]

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মুনাফেকরা কোন অপরাধ করে তা গোপন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতো। যেমন আলোচ্য আয়াতের ঘটনায়ও তাই করা হয়েছে। প্রকৃত চোর নিজের অপরাধ গোপন রাখতে ইহুদীকে চোর বানাবার অপচেষ্টা করে। আর তার আত্মীয়-স্বজনরাও চোরকে চোর নয় বলে সাক্ষ্য দেয়। এ প্রেক্ষিতে নিরপরাধ ইহুদীই চোর সাব্যস্ত হওয়ার উপক্রম হয়। এমনি অবস্থায় আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا

"(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার নিকট পবিত্র কোরআন নাযিল করেছি যেন আপনি মুসলমান অমুসলমান তথা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে পবিত্র কোরআনের হেদায়েত মোতাবেক ন্যায় বিচার করতে পারেন এবং কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করেন। এজন্যেই (হে রসূল!) আমি আপনার নিকট সত্য কিতাব নাযিল করেছি"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যে, এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আল্লাহ পাক আপনার প্রতি যে কিতাব

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৬৩-৬৫

নাযিল করেছেন তা ধ্রুব সত্য, তার খবর সমূহ সত্য, তার বিধি-নিষেধ সত্য। আর এ বিধি-নিষেধ এজন্যে প্রদত্ত হয়েছে যেন (হে রসূল!) আপনি মানুষের মধ্যে সঠিকভাবে মীমাংসা করেন যেভাবে আল্লাহ পাক আপনাকে নির্দেশ প্রদান করেন। শেখ আবুল মনসুর (রঃ) বলেছেনঃ

بِمَآ اَرٰكَ اللّٰهُ

বাক্যটির অর্থ হলো আল্লাহ পাক আপনার অন্তরে যে নির্দেশ বা কথা আনয়ন করেন সে মোতাবেক মীমাংসা করুন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এজতেহাদ

তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণ বলেছেন যে, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে এজতেহাদ করে আদেশ দেয়ার অনুমতি ছিল। একথার প্রমাণস্বরূপ আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) সেই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরের দরজায় কিছু লোকের কলহ-দ্বন্দ্বের শব্দ শ্রবণ করে বের হয়ে আসলেন এবং এরশাদ করলেনঃ আমি একজন মানুষ, আমি যা শ্রবণ করি সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। হতে পারে কোন বাকপটু লোক (আমার নিকট কথা বলে) এবং তার কথা আমি সঠিক মনে করে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করি। এরপর যার পক্ষে আমি সিদ্ধান্ত প্রদান করি অথচ বাস্তবে সে হক্বদার না হয় তবে সে যেন জেনে রাখে যে (যা সে পেয়েছে) তা দোযখের একটি অংশ। এখন তার ইচ্ছা গ্রহণ করা অথবা পরিত্যাগ করা।

মসনদে আহমদে দু' আনসারী ব্যক্তির ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে, যারা তাদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে মীমাংসা করে দেয়ার আরযী পেশ করে। কিন্তু এ ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত পুরনো। কারো পক্ষে কোন সাক্ষী ছিল না। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন এবং এরশাদ করেনঃ কেউ যেন আমার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিজের ভাইয়ের হক্ব গ্রহণ না করে। যদি কেউ এমন কাজ করে তবে কেয়ামতের দিন তার নিজের ঘাড়ে দোযখের অগ্নি দেখতে পাবে। তখন তারা উভয় ভ্রাতা ক্রন্দন করতে থাকে এবং প্রত্যেকে বলতে থাকে যে, আমি আমার হক্ব আমার ভাইকে দিয়ে দিলাম। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ এখন তোমরা এ পন্থা অবলম্বন কর যে, যথাসাধ্য সঠিকভাবে নিজেদের মধ্যে উত্তরাধিকার ভাগ করে নাও। এরপর কোরআনের মাধ্যমে প্রত্যেকে স্বীয় অংশ গ্রহণ কর এবং একে অন্যকে তার ভুলের জন্যে ক্ষমা কর। আবু দাউদ শরীফেও এই হাদীস রয়েছে, তবে

তাতে এতটুকু কথা সংযোজিত রয়েছে যে, আমি তোমাদের মধ্যে আমার ধারণা মোতাবেক সিদ্ধান্ত করছি। এ সম্পর্কে কোন ওহী নাযিল হয়নি।[১]

وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۞ وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোওমার সম্প্রদায়ের কথা বিশ্বাস করে ইহুদীকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন যে, (হে রসূল!) যে প্রকৃত খেয়ানতকারী আপনি তার সাহায্যকারী হবেন না, অর্থাৎ তোওমা এবং তার সম্প্রদায় ইহুদীর বিরুদ্ধে যে অপবাদ দেয় এবং উক্ত ইহুদীকে দোষী সাব্যস্ত করতে আপনার সাহায্য কামনা করে, আপনি তাদেরকে সাহায্য করবেন না।

দ্বিতীয়তঃ ইহুদী কাফের হতে পারে ইসলামের দুশমন হতে পারে কিন্তু যে অপরাধ সে করেনি তার দায় ইহুদীর উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না। (হে রসূল!) তাকে শাস্তি দেয়ার যে ইচ্ছা আপনি করেছেন তার জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। মোকাতেল বলেছেন, তোওমার পক্ষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে মন্তব্য করেছিলেন তার জন্যে এস্তেগফারের নির্দেশ হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রহঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাতাদা এবনে নোমানকে বলেছিলেন, "তোমরা এমন লোকের উপর চুরির অপবাদ দিয়েছ যার মুসলমান হওয়ার এবং নেক হওয়ার কথা আমার সম্মুখে আলোচিত হয়েছে"। এ বাক্যটির জন্যে এস্তেগফারের নির্দেশ হয়েছে।

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ

(হে রসূল!) যারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করে আপনি তাদের পক্ষ থেকে কোন জবাবদেহী করবেন না। এতদ্বারা তোওমা এবনে আবরক এবং তার সম্প্রদায়কে নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা, তারাই ছিল অপরাধী এবং তারা ইহুদীর উপর অপরাধের অপবাদ দিয়ে প্রতারণা করতে চেয়েছিল। তাই তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক পরবর্তী আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক এমন লোককে পছন্দ করেন না যে অত্যন্ত বড় খেয়ানতকারী, পাপী।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৬৪-৬৫

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে আলোচ্য আয়াতে যদিও সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতদ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে অন্য লোকদেরকে। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খেয়ানতকারীর পক্ষ সমর্থন করবেন একথা কল্পনাতীত।

দ্বিতীয়ত, আলোচ্য আয়াতে এস্তেগফারের তাৎপর্য হলো শরীয়তের হুকুম মেনে চলা। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আম্বিয়ায়ে কেরামের এস্তেগফারের তিনটি পন্থা রয়েছে–

১. নবুওয়্যত লাভের পূর্বের কোন গুনাহ হয়ে থাকলে তার জন্যে এস্তেগফার।

২. নিজের উম্মত এবং আত্মীয়-স্বজনের গুনাহর জন্যে এস্তেগফার।

৩. এমন বৈধ কাজের জন্যে এস্তেগফার যা পরবর্তীতে অবৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে এবং যা পরিত্যাগ করা হয়েছে।

يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ

অর্থাৎ তোওমা এবনে আবরক মানুষের নিকট প্রকৃত ঘটনা গোপন রেখেছিল অথচ আল্লাহ পাকের নিকট কোন কিছুই গোপন রাখা সম্ভব নয়। তারা যখন রাত্রিকালে পরস্পর একত্রিত হয়ে আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় বিষয়ে পরামর্শ করতো তখনওতো তিনি তাদের সঙ্গেই থাকেন। অতএব, আল্লাহ পাকের নিকট কোন কিছুই গোপন থাকে না। আর আল্লাহ পাক তাদের যাবতীয় কার্যাবলী পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের অথবা ক্ষমতার আওতার বাইরে নয়। সবই তাঁর কর্তৃত্বাধীন, নিয়ন্ত্রণাধীন।

هَاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ

অর্থাৎ তোওমা এবনে আবরকের সম্প্রদায় অন্যায়কারীর পক্ষে এ ক্ষণস্থায়ী জগতে তো অনেক জবাবদেহী করলো, কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলো কিন্তু কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে কে তাদের পক্ষে আল্লাহ পাকের দরবারে বিতর্ক করতে সক্ষম হবে? যখন তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতে ইচ্ছুক হবেন। অথবা কে সেদিন তার পক্ষে উকিল হবে? কে তার সাহায্যকারী হবে?

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾

তরজমা

(১১০) এবং যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি জুলুম করে, পরে আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে ক্ষমা চায় সে আল্লাহ্ তায়ালাকে অতীব ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়াময় পাবে।

(১১১) এবং যে ব্যক্তি গুনাহর কাজ করে বস্তুতঃ সে নিজের উপরই তার জের টেনে নেয় (অর্থাৎ তাকেই ভোগ করতে হয় গুনাহর শাস্তি)। আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

(১১২) যে ব্যক্তি ভুল করে অথবা গুনাহ্ করে, পরে কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর তার অপবাদ আরোপ করে সে অবশ্যই প্রকাশ্য অপবাদের বোঝা বহন করে।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর মহান দানের কথা ঘোষণা করেছেন। যদি কেউ কোন অন্যায় করে, পাপাচারে লিপ্ত হয়, আর সে অন্যায় এমন যে তা দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেয় অথবা এমন অন্যায় যা দ্বারা অন্যের কষ্ট হয় না কিন্তু নিজের প্রতি সে জুলুম করে তথা নিজের ক্ষতি করে এবং আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে কৃত অন্যায়ের জন্যে তওবা করে, ক্ষমাপ্রার্থী হয় এবং মানুষের হক্ব হলে তা প্রাপককে ফিরিয়ে দেয়, এমন অবস্থায় আল্লাহ্ পাক তাকে মাফ করেন। কেননা আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। এ আয়াত দ্বারা এবনে আবরক এবং তার সম্প্রদায় যে গুনাহ করেছিল তার জন্যে তওবা ও এস্তেগফার করার আহবান রয়েছে।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, এবনে রাহবীয়া একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয়–

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا

(যে কোন মন্দ কাজ করে তাকে তার শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে, আল্লাহ ব্যতীত সে কোন বন্ধু এবং সাহায্যকারী পাবে না।) তখন আমরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। অবস্থা এমন করুণ ছিল যে, আমাদের পানাহারের স্বাদ পর্যন্ত বিদায় নিয়েছিল। অবশেষে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا

অর্থাৎ- যদি কেউ কোন গুনাহর কাজ করে বা নিজের প্রতি জুলুম করে, এরপর আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করে বা ক্ষমাপ্রার্থী হয় তবে আল্লাহ পাককে সে অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াময় পাবে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি নিজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা শ্রবণ করেছি যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন গুনাহ করে, এরপর সে ভাল করে অজু করে নামাজের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হয় এবং গুনাহ মাফ করার জন্য আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আরযী পেশ করে তবে আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দেন। কেননা, আল্লাহ পাক নিজেই এরশাদ করেছেনঃ এরপর তিনি এ (আলোচ্য) আয়াত তেলাওয়াত করেন।[১]

উম্মতের প্রতি আল্লাহর দান

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, বনী ইসরাঈলের লোকেরা যখন গুনাহ করতো তখন সে গুনাহগার ব্যক্তির বাড়ীর দরজায় গুনাহর কাফ্‌ফারা সম্পর্কে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে লিপিবদ্ধ অবস্থায় দেখা যেতো যা সে ব্যক্তিকে আদায় করতে হতো। আর যখন পোষাকে প্রস্রাব লাগতো তখন পোষাকের সে অংশটুকু কেটে ফেলা হতো। আল্লাহ পাক প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় এ উম্মতের প্রতি দয়া করেছেন যে, পানিতে ধৌত করার মাধ্যমে পোষাক পবিত্র হয়। আর আল্লাহ পাকের দরবারে খাঁটি তওবা করলে আল্লাহ পাক মাফ করেন। একজন স্ত্রীলোক হযরত আবদুল্লাহ এবনে মোগাফফাল (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, জনৈক মহিলা মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে তার একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। সে ঐ সন্তানটিকে মেরে ফেলে। তখন তিনি বলেন এ মহিলার শাস্তি হলো দোযখ। সে ক্রন্দনরত অবস্থায়

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৬৯

বিদায় গ্রহণ করে। এরপর তিনি তাকে ডাকলেন এবং আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শোনালেন। তখন সে তার অশ্রু মুছে ফেলে এবং প্রত্যাবর্তন করে।[১]

অতঃপর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত হয়, তার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হয়। আর আল্লাহ্ পাক সর্ব বিষয়ে ওয়াকেফহাল। কে কি করে না করে আল্লাহ্ পাক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, আর তিনি বিজ্ঞানময়, হেকমতপূর্ণ তাঁর বিধি-নিষেধ, কাউকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে তিনি হেকমত অবলম্বন করেন। আর যে ব্যক্তি কোন ছোট-খাট গুনাহ্ করে অথবা কবিরা গুনাহ্ করে, আর সে গুনাহর অপবাদ কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয় তবে সে অবশ্যই অপরাধের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেয়।

এ আয়াত দ্বারা একথা ঘোষণা করা হয়েছে, ইচ্ছাকৃত পাপাচারের শাস্তি অবধারিত। আর যে প্রকৃত অপরাধী শাস্তি তারই প্রাপ্য। একজনের অপরাধের কারণে অন্যকে শাস্তি দেয়া হবে না। এ অবস্থা সেখানে হতে পারে যেখানে প্রকৃত অপরাধী সম্পর্কে খবর না থাকে। কিন্তু এখানে ব্যাপারই সম্পূর্ণ অন্য রকম। আল্লাহ্ পাক অন্তর্যামী। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। অতএব, যে বেকসুর তার উপর অপরাধ চাপানোর চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এমন অপপ্রয়াস পাপের ফিরিস্তি সুদীর্ঘ করা ছাড়া আর শাস্তিকে কঠিনতর করা ছাড়া আর কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। কেননা, পাপ ছোট হোক কি বড় -যদি তা অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় তবে তা অত্যন্ত বড় অপরাধ। প্রথমতঃ শাস্তির যোগ্য অপরাধ, দ্বিতীয়ত, অন্যের প্রতি অপবাদ দেয়ার অপরাধ। এটি আদৌ শাস্তি, সাফল্য ও নাজাতের পথ নয়, বরং নাজাতের পথ হলো আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে আন্তরিকভাবে তওবা এস্তেগফার করা।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ
اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ
وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ
وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫ খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৮৯

তরজমা

(১১৩) এবং যদি (হে রসূল!) আপনার প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার বিশেষ দান ও দয়া না থাকতো, তবে তাদের মধ্যে একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে দৃঢ় সংকল্প ছিল এবং তারা শুধু নিজেদেরই গোমরাহ করছে। আর তারা আপনার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না। এবং আল্লাহ্ তায়ালা আপনার উপর কিতাব ও হেকমত নাযিল করেছেন। আর আপনি যা জানতেন না আপনাকে তা শিক্ষা দিয়েছেন এবং আপনার প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার বিরাট দান রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) যদি আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত এবং দান আপনার প্রতি না হতো তবে এবনে আবরক এবং তার সম্প্রদায় তথা বনী জাফর নামক গোত্র তাদের মিথ্যাবাদীতার মাধ্যমে আপনার দ্বারা ভুল সিদ্ধান্ত করার সংকল্প করেছিল।

পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এবনে আবরক একজনের হাতিয়ার চুরি করেছিল এবং সে হাতিয়ার এক ইহুদীর বাড়ীতে রেখে এসেছিল। চোরের আত্মীয়-স্বজন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বলে, এবনে আবরক চোর নয়, বরং সেই ইহুদীই চোর একথা তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করে। অবশেষে সত্য প্রকাশিত হয়। তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাকের বিশেষ দানে ধন্য না হলে এবং তাঁর বিশেষ হেফাজতে সংরক্ষিত না হলে এবনে আবরকের গোত্রের লোকেরা আপনার দ্বারা বাতিল আদেশ জারি করাতে সক্ষম হতো। কিন্তু যেহেতু আপনার প্রতি আল্লাহ পাকের অনন্য-সাধারণ করুণা, অনুগ্রহ এবং দয়া রয়েছে এবং আল্লাহ পাক আপনাকে নিঃষ্পাপ করে রেখেছেন এবং সেই নিঃষ্পাপতা তিনিই রক্ষা করে চলেছেন, তাই দাগাবাজ, জালিয়াতের দ্বারা প্রতারিত হননি। এ আয়াতে দু'টি কথা বিশেষভাবে এরশাদ হয়েছে। আল্লাহ পাক স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এসমত তথা নিঃষ্পাপতার হেফাজত করছেন। ফলে কেউ তাঁকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়নি। দ্বিতীয়তঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ। মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা অস্বাভাবিক নয়। তাই আল্লাহ্ পাক আপনার হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। আলোচ্য ঘটনায় চোরের আত্মীয়-স্বজনরা চোরকে সাধু বলে অন্যের প্রতি অপবাদ দিতে চেয়েছিল এবং নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি শাস্তির আদেশ জারি করাবার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল। আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাদের প্রতারণা থেকে রক্ষা করেছেন। এরপর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) মুনাফেকরা যত চেষ্টাই করুক না কেন আপনার দ্বারা বাতিল আদেশ জারী করাতে তারা আদৌ সক্ষম হবে না। এ পর্যায়ে তাদের সকল প্রয়াস-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাদের প্রতারণা দ্বারা তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করে। কোন দিন তারা আপনার ক্ষতি সাধনে সক্ষম হবে না কেননা, স্বয়ং আল্লাহ পাক আপনার সাহায্যকারী এবং হেফাজতকারী, আর আল্লাহ্ পাক আপনার প্রতি পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন এবং আপনাকে হেকমত দান করেছেন এবং ইতিপূর্বে যা আপনি জানতেন না সেসব বিষয়ে আল্লাহ্ পাক আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো অদৃশ্য জগতের এলম। ইমাম কাতাদা বলেছেনঃ দুনিয়া এবং আখেরাত সম্পর্কে, হালাল ও হারামের বিধান সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক তাঁকে এলম দান করেছেন অথবা এর অর্থ হলো পূর্ববর্তী জাতি সমূহের অবস্থা সম্পর্কে আপনি জানতেন না, আল্লাহ্ পাকই আপনাকে এ সম্পর্কে অবগত করেছেন অথবা এর অর্থ হলো মুনাফেকদের প্রতারণা, ধোকাবাজি সম্পর্কে আপনি অবগত ছিলেন না কিন্তু আল্লাহ্ পাক আপনাকে সে সম্পর্কে অবগত করেছেন।

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'ফজল' শব্দটির তাৎপর্য হলো, নবুওয়্যত এবং 'রহমত' শব্দটির তাৎপর্য হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিঃষ্পাপতার হেফাজত।[১]

অতঃপর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

অর্থাৎ আপনার প্রতি আল্লাহ পাকের বিরাট দান রয়েছে। কেননা, নবুওয়্যতের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোন দান নেই। মানব জাতির জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা হলো নবুওয়্যত। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু নবী নন; বরং তিনি নবীগণের দলপতি বা ইমাম। তিনি সাইয়্যেদুল মুরসালীন। অন্য নবীগণের নবুওয়্যত বিশেষ স্থান ও কালের জন্যে ছিল, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত সর্বকালের জন্যে। কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হবে সকলের জন্যে তিনি নবী। তিনি আল্লাহ্ পাকের সর্বোত্তম সৃষ্টি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, সবচেয়ে প্রিয় রসূল। এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, এলম বা জ্ঞান হলো সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ কেননা, আল্লাহ্ পাক মানুষকে সামান্য জ্ঞান দান করেছেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৯

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا

অর্থাৎ– তোমাদেরকে অত্যন্ত সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে সে সামান্য জ্ঞানকেই আল্লাহ্ পাক 'আজীম' বলেছেন তথা এ জ্ঞান হলো বিরাট, মহান। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

اُوْتِيْتُ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ

অর্থাৎ আমাকে প্রদান করা হয়েছে পূর্বের এবং পরের সমস্ত জ্ঞান। অতএব, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্ পাকের মহান দান।

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ
إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن
يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

তরজমা

(১১৪) তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। কিন্তু যে পরামর্শে দান করার সিদ্ধান্ত হয় অথবা সৎ কাজের বা মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে হয় এবং যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করে অদূর ভবিষ্যতে আমি তাকে মহা পুরস্কার দান করবো।

(১১৫) এবং যে ব্যক্তি এমন যে, তার নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও আল্লাহ্ তায়ালার রসূলের বিরোধিতা করবে এবং মোমেনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ গ্রহণ করবে, আমি তাকে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে দেই। এবং আমি তাকে দোযখে দগ্ধ করবো, আর তা কত মন্দ আবাসস্থল!

তফসীরুল কোরআন

মুনাফেকরা মানুষের মধ্যে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবার সম্মুখে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কানে কানে কথা বলতো। এভাবে তারা

একথা প্রকাশ করতো যে, তাঁর সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা যখন নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতো তখন ইসলামের নিন্দাবাদ করতো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে শলা-পরামর্শ করতো। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাদের এ গোপন অভিসন্ধি প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে, তাদের অধিকাংশ পরামর্শেই কোন কল্যাণ নেই। আর যা সত্য এবং উত্তম তা গোপন রাখার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? তাদের এ আচরণে কোন প্রকার ষড়যন্ত্র বা প্রতারণা থাকতো বলেই তো তারা এসব কথা গোপন রাখে।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে "নাজ্ওয়া" শব্দটির অর্থ হলো গোপনে কোন কাজের তদ্বির করা। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, নাজ্ওয়া সে তদ্বিরকে বলা হয় যা কোন সম্প্রদায় একা করে। সে তদ্বির প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে।

পূর্ববর্তী বাক্যে মুনাফেকদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কানে কানে কথা বলা সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এ বাক্যে এরশাদ হয়েছে, যদি কোন বিষয় গোপন করতে হয় তবে দান খয়রাত গোপনে করা উচিত।

কেননা, দান খয়রাত যদি প্রকাশ্যে করা হয় তবে গ্রহীতা দান গ্রহণে লজ্জা বোধ করতে পারে। অতএব দানের ব্যাপার গোপন করা উচিত। এমনিভাবে কারো ভুল-ক্রটি সংশোধন করতে হলে এবং সঠিক বিষয় সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে হলে এ বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। কেননা, যদি কারো ক্রটি প্রকাশ্যে ধরিয়ে দেয়া হয় তবে লোকচক্ষে তাকে লজ্জিত এবং হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়। যদি গোপনে কিছু করতে হয় তবে এমন ক্ষেত্রে করা উচিত। এতদ্ব্যতীত, যদি দ্বন্দ্বে লিপ্ত দু' ব্যক্তি বা দু' দলের বিরোধ মীমাংসায় এমন পন্থা অবলম্বন করা হয় তথা দৃশ্যত মিথ্যা কথার মাধ্যমেও বিবদমান দু' পক্ষের উত্তেজনা প্রশমন করা যায়, পারস্পরিক বিরোধ মিটমাট করা যায় তবে তা-ও প্রশংসনীয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوْفٍ أَوْاِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

অর্থা– মানুষের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার উদ্দেশ্যে এমন পন্থা অবলম্বনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে আকাবা এবনে আবু মুইত বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয় যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে নিজের তরফ থেকে কোন কথা বলে। অথবা কোন ভাল কথা নিজের তরফ থেকে বানিয়ে অন্যকে পৌছায়।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি কি তোমাদের এমন কথা বলবো যার মর্তবা রোজা, দান খয়রাত এবং নামাজের চেয়েও অধিকতর? আমরা আরয করলাম, অবশ্যই বলুন। তিনি এরশাদ করলেনঃ মানুষের পরস্পরের সম্পর্ককে সঠিক রাখা। পরস্পরের সম্পর্ক বিনষ্ট করা নেকীকে শেষ করে দেয়। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি উপরোক্ত তিনটি কাজের যে কোন একটির পরামর্শ দেবে বা এ কাজ সমূহ নিজেই করবে তথা সদকা দান করবে অথবা কারো উপকার করবে, অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে আর তা করবে শুধু এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, লোক দেখাতে নয় এবং খ্যাতি অর্জনের জন্যেও নয়; বরং শুধু এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তবে আমি অদূর ভবিষ্যতে তাকে দান করবো বিরাট সওয়াব, মহান সওয়াব যার মোকাবেলায় দুনিয়ার সকল ধন-সম্পদ নিতান্ত তুচ্ছ। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাককে এবং আখেরাতকে মানে তার কর্তব্য হলো ভাল কথা বলা অথবা নীরব থাকা।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের রহমত হোক সে ব্যক্তির প্রতি যে ব্যক্তি কথা বললে উপকারের কথা বলে অথবা নীরব থাকে।

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতার শাস্তি

পূর্ববর্তী আয়াতে নেককার লোকদের কথা এরশাদ হয়েছে, আর এ আয়াতে বদকারদের সম্পর্কে ঘোষণা রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ যে ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে তার নিকট সত্য প্রকাশিত হবার পরও আল্লাহর রসূলের বিরোধিতা করবে এবং মোমেনদের পথ বর্জন করে অন্য পথ গ্রহণ করবে সে যা করতে চায় আমি তাকে তাই করতে দেব। আমি তাকে দোযখে প্রবেশ করাবো অর্থাৎ সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা এ সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর যে, এটি হলো আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ফরমান, তারপরও যদি সে এর বিরোধিতা করে তবে তার শাস্তি অবধারিত।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ শর্তারোপ করার কারণ এই, যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ ফরমান সম্পর্কে কেউ অবগত না হয় এমন অবস্থায় যদি সে ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ফরমানের বিরোধিতা করে অথবা অত্যন্ত চেষ্টা সত্ত্বেও হাদীসের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় তবে এমন ব্যক্তি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত আদেশের আওতায় আসবে না।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতার যে কথা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য মুরতাদ হওয়া (ধর্ম ত্যাগী হওয়া) অর্থাৎ তওহিদ এবং রেসালতের বাণী শ্রবণ ও গ্রহণের পর তা থেকে ফিরে যাওয়া। যেমন তোওমা এবনে আবরক সম্পর্কে বর্ণিত আছে।

আর যারা মোমেনদের পথ ব্যতীত অন্য পথে চলবে অর্থাৎ ঈমানদারগণ যে বিষয় সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যা আকিদা রাখে, আর তাদের জীবন ধারা যেমন হয় যদি কেউ তার বিরোধী হয় তবে সে যা করতে চায় আমি তাকে তাই করতে দেই অর্থাৎ সে নিজের জন্যে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার যে পথ পছন্দ করেছে আমি তাকে সে পথেই থাকতে দেই।

কোন কোন তফসীরকার করেছেন, এর অর্থ হলো দুনিয়াতে যে যে বিষয়ের উপর বিশ্বাস রাখে আখেরাতে আমি তাকে সে বিষয়ের উপরই সোপর্দ করবো। যেমন বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, কেয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেঃ (দুনিয়াতে) যে যার পূঁজা করতো সে যেন তার পশ্চাতে চলে যায়। এ ঘোষণার পর যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর পূজা করতো তাদের দোযখে নিক্ষিপ্ত হওয়া ব্যতীত কোন গতি থাকবে না। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا

"আর আমি তাকে দোযখে প্রবেশ করাবো। আর দোযখ হলো অত্যন্ত মন্দ স্থান"।

হযরত মালেক (রঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর এবনে আবদুল আজিজ (রঃ) বলেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীন যে পন্থা নিদৃষ্ট করে গেছেন, যার উপর আমল করলে আল্লাহর কিতাব পবিত্র কোরআনের মহান বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্যও পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং আল্লাহর দ্বীন শক্তিশালী হয় সে পন্থা সমূহ পরিবর্তন করার অনুমতি নেই। যারা সে পথে চলবে তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত হবে।

আর সে পথে চলার পর যারা আল্লাহ্ পাকের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হবে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা হবে। পক্ষান্তরে যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীনের নিদৃষ্ট পন্থা বর্জন করবে তারা মোমেনদের পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথে চলবে। আর তারা যে পথ অবলম্বন করবে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সে পথে চলতে দেবেন (এ পর্যায়ে কোন প্রকার বাধা দেয়া হবে না)। পরিণামে তারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে, আর দোযখ অত্যন্ত মন্দ স্থান।[১]

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত তোওমা এবনে আবরক সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

তোওমার চুরি যখন ধরা পড়লো তখন সে তার অপমান এবং হস্ত কর্তনের ভয়ে মক্কা গমন করলো এবং মুরতাদ হলো। তখন এ আয়াত নাযিল হলো। আলোচ্য আয়াতে আযাবের যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তার জন্যে দুটি শর্তারোপ হয়েছে।

১. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা।

২. মোমেনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অবলম্বন।

শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতাই আল্লাহর আযাবের কারণ হয়। দ্বিতীয় শর্তটি পূরণ হোক বা না হোক। এমনিভাবে মোমেনদের পথ বর্জন করে অন্য পথ গ্রহণেও আযাব হবে।

এতে একথা প্রমাণিত হয়, উপরোক্ত দু'টি শর্তের যে কোন একটির উপস্থিতি আযাবের কারণ হবে। যেভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করা হারাম ঠিক তেমনি এজমায়ে উম্মতের বিরোধিতা করাও হারাম।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) এবং তিরমিজী শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক এ উম্মতকে কখনও গোমরাহী এবং পথভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না। জামাতের উপর আল্লাহ পাকের হাত রয়েছে। যে মুসলিম উম্মাহর এ সম্মিলিত অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হবে সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, তোওমা এবনে আবরক যার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে সে মদীনা শরীফ থেকে পলায়ন করে মক্কার বনী সোলায়েম গোত্রের হাজ্জাজ এবনে গালাজের নিকট আশ্রয় নেয়। কিছুদিন পর ঐ ব্যক্তির বাড়ীতেই সে সিঁধ কেটে চুরি করে। চুরি করার সময় একটি পাথর তার উপর পড়ে। পরিণামে সে পাথরের নীচে চাপা পড়ে। তার অবস্থা এত বেগতিক ছিল যে, সে বাইরেও আসতে

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭৩-৭৪

পারছিল না। সকালে সে ধরা পড়ে যায়। লোকেরা তাকে হত্যা করতে চায় কিন্তু কেউ কেউ বাড়ীর মালিককে পরামর্শ দেয় যেহেতু সে তোমার নিকট আশ্রয় নিয়েছিল তাই তাকে ছেড়ে দেয়া উচিত হবে। ফলে তাকে ছেড়ে দেয়া হলো এবং মক্কা থেকে বহিষ্কার করা হলো। সে তখন বনী কাজা নামক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সিরিয়া চলে যায়। পথে এক জায়গায় লোকেরা বিশ্রাম করলো। এই সময় তোওমা সঙ্গীদের মালপত্র চুরি করে পলায়ন করলো। লোকেরা খোঁজ করে তার প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করতে লাগলো। আর এত প্রস্তর বর্ষণ করলো যে, নিক্ষিপ্ত প্রস্তরগুলোই তার কবরে পরিণত হলো।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ মানুষের অনেক কথায়ই কল্যাণ থাকে না। শুধু যাদের কথায় দান খয়রাতের অনুপ্রেরণা থাকে অথবা মানুষের উপকার করার কথা থাকে অথবা মানুষের মধ্যে মিল-মহব্বত, শান্তি স্থাপন এবং পরস্পরের কলদ্ব-দ্বন্দ্ব বর্জনের কথা হয় তাতে কল্যাণ থাকে।

বিখ্যাত সুফি বুজর্গ হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) অসুস্থ হলে যারা তাঁকে দেখতে যান তাদের মধ্যে সাঈদ এবনে হাসানও ছিলেন। হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) সাঈদকে বলেন, তুমি উম্মে সালেহের যে হাদীস বর্ণনা করেছিলে তা পুনরায় শোনাও। তখন তিনি বললেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষের সব কথাই তার জন্যে বিপদ। শুধু আল্লাহর জিকর এবং সৎ কাজে নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার কথা ব্যতীত।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন, (আলোচ্য) আয়াতে একথাই রয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ)-কে বলেছেন, আমি তোমাকে একটি ব্যবসায়ের কথা বলি, মানুষ যখন কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তখন তুমি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। মানুষ যখন একে অপর থেকে দূরে থাকতে চাইবে, তুমি তাদেরকে একত্রিত করে দিও।[২]

সর্ব প্রকার কল্যাণের কথা

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সর্ব প্রকার কল্যাণের কথা আলোচিত হয়েছে এ আয়াতে। কল্যাণকর কাজ তিন প্রকারঃ

১. মানুষের শারীরিক কল্যাণ সাধন করা তা অর্থ সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে হয়।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৭৪-৭৫
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫ খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯০-৯১
তফসীরে কবীর খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪১-৪২

২. আধ্যাত্মিক প্রশান্তি, আর তা মানুষকে ভাল কথা বলার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

৩. মানুষকে তার ক্ষতিকর অবস্থা থেকে রক্ষা করা আর তা হলো কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত লোকদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা এবং মীমাংসা করে দেয়া। আর এ তিনটি কল্যাণকর কাজেরই নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। অতঃপর এরশাদ হয়েছেঃ এসব কাজ অত্যন্ত কল্যাণকর। এতদ্বারা মানবতার মান উন্নীত হয়, সভ্যতার বিকাশ ঘটে এবং এর গুরুত্ব আল্লাহ পাকের দরবারে অনেক বেশী। কিন্তু শর্ত হলো, এসব কল্যাণকর কাজ করতে হবে শুধু এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। যদি দুনিয়াতে নাম যশ খ্যাতি অর্জনের জন্যে না হয়, বরং শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয় তবে আল্লাহ পাক এর মহান পুরস্কার দান করবেন। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

কোরআনে করীমে এ সম্পর্কে অন্য আয়াতেও এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَآ اُمِرُوْآ اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

"(অর্থাৎ) আর তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে শুধু এক আল্লাহর বন্দেগী করার জন্যে আন্তরিকভাবে"। আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى

"আর মানুষ যা চেষ্টা করে তারই ফল সে লাভ করে"।

এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّمَا الاعمال بالنيات

অর্থাৎ- আমলের মূল্যায়ন হবে নিয়তের মাধ্যমে। যদি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নেক আমল করা হয় তবে তার শুভ পরিণতি সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে যদি নেক আমল করা হয় কোন জাগতিক উদ্দেশ্যে তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য না থাকে তবে তাতে সওয়াবের আশা সুদূর পরাহত।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ إِن يَدْعُونَ مِن
دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ
وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَ
لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ
فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ
الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا
مَحِيصًا ﴿١٢١﴾

তরজমা

(১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর সাথে শেবক করাকে ক্ষমা করবেন না। এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সাথে শেরক করে সে পথভ্রষ্টতায় বহু দূরে সরে পড়েছে।

(১১৭) এ কাফেররা আল্লাহ তায়ালাকে পরিত্যাগ করে কয়েকটি নারী মূর্তিকেই ডাকে। মূলতঃ তারা শুধু বিদ্রোহী শয়তানকেই ডাকে।

(১১৮) যাকে আল্লাহ তায়ালা লা'নত করেছেন যে শয়তান বলেছিল, নিশ্চয় আপনার বন্দাদের মধ্য হতে আমি এক নিদৃষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করে নেব।

(১১৯) এবং আমি তাদেরকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করবো এবং আমি অবশ্যই তাদের অন্তরে মিথ্যা বাসনা সৃষ্টি করবো এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে আদেশ দেব যেন তারা চতুঃষ্পদ জন্তুর কর্ণ ছেদন করে এবং আমি তাদেরকে নিশ্চয় আদেশ দেব যেন তারা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে সে অত্যন্ত প্রকাশ্য ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(১২০) আল্লাহ পাক মানুষকে প্রতিশ্রুতি দেন ও আশ্বাস প্রদান করেন এবং শয়তান প্রতিশ্রুতি দেয় শুধু ধোকা দেয়ার জন্যে।

(১২১) তাদেরই বাসস্থান হবে দোযখ এবং তারা দোযখ থেকে পরিত্রাণের কোন পথ পাবে না।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

আল্লামা বগবী (রঃ) যাহ্যাকের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে একজন বৃদ্ধ গ্রাম্য ব্যক্তি সম্পর্কে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরয করেছিলঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমি পাপাচারে নিমজ্জিত। তবে একথা সত্য যে, যখন থেকে আমি আল্লাহ পাকের পরিচয় পেয়েছি এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি তখন থেকে কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করিনি এবং তাঁকে ছেড়ে অন্য কিছুকে সবকিছুর অধিকর্তা হিসেবে মেনে নেইনি। আর আল্লাহর বিরুদ্ধে নির্ভীক হয়ে কোন পাপকার্যে লিপ্ত হইনি। আর কোন দিন আমার মনে একথা আসেনি যে, আমি আল্লাহ পাকের দরবার থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হবো। এখন আমি আমার গুনাহ সমূহের জন্যে অনুতপ্ত ও লজ্জিত। আমি তওবা করি। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি। আখেরাতের আমার কি অবস্থা হবে? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

আয়াতের মর্মকথা

আল্লাহর সাথে শেরক করা নিঃসন্দেহে মহাপাপ, সকল পাপাচারের মধ্যে শেরক হলো সর্বশ্রেষ্ঠ পাপ এবং নিঃসন্দেহে অমার্জনীয় অপরাধ। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে সকল গুনাহই মাফ করতে পারেন কিন্তু শেরকের গুনাহ তিনি কোন অবস্থাতেই ক্ষমা করবেন না। একথা চির সত্য যে, চুরি এবং চুরির অপবাদ দেয়া অত্যন্ত বড় গুনাহ। তবুও আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তাঁর অনন্ত অসীম দয়ায় মাফ করতে পারতেন। কিন্তু বদনসীব চোর সে পথ উম্মুক্ত রাখেনি, বরং সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করে কাফেরদের দলভুক্ত হয়। পরিণামে মাগফেরাত লাভের পথ বন্ধ হয়ে যায়। আর এখানে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করাই যে শেরক তা নয়, বরং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের আদেশের বিরুদ্ধে অন্য কারো আদেশকে পছন্দ করাও শেরকের অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়।

وَمَنْ يُّشْرِكْ

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪৩-৪৫

অর্থাৎ-যে কেউ শেরক করেছে, আল্লাহ্ পাকের মহান দরবার থেকে সে বিমুখ হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের বিরুদ্ধে অন্য কিছুর উপাসনা করে শয়তানের অনুগত হয়েছে। এজন্যে আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وَاَنِ اعْبُدُوْنِىْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ۞ وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ط اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ

"আর তোমরা শুধু আমার এবাদত কর। এটিই সরল সঠিক পথ। শয়তানতো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছে তবুও কি তোমরা বোঝনি"?

এজন্যেই আল্লাহ্ পাক পরবর্তী বাক্যে এরশাদ করেছেনঃ

فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا

অর্থাৎ যে শেরক করলো সে সত্য পথ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। সে এত পথভ্রষ্ট হয়েছে যেখান থেকে নাজাত এবং মাগফেরাত পর্যন্ত পৌঁছানো আর সম্ভব নয়। ইমাম রাজী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, কারো অর্থ-সম্পদ চুরি করা নিতান্ত গর্হিত অপরাধ বা কারো প্রতি অপবাদ দেয়াও মহাপাপ। হাতিয়ার চুরি করে এবং আরেক ইহুদীর উপর চুরির অপবাদ দিয়ে তোওমা এবনে আবরক মহাপাপ করেছে এবং তার শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে হবে। এরপরও সে ক্ষমা লাভ করতো কিন্তু সে যখন মুরতাদ হয়েছে এবং ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেছে, আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করেছে তখন আল্লাহ্‌র রহমত থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে। যদি সে মুরতাদ না হতো, আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক না করতো তবে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত হতো না। কিন্তু যেহেতু শেরক সর্বশ্রেষ্ঠ অপরাধ এবং জঘন্যতম অপরাধ যা সে করেছে, তাই সে পথভ্রষ্টতায় অনেক দূরে সরে গেছে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, শেরক ব্যতীত অন্য গুনাহ আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে মাফ করতেও পারেন কিন্তু শেরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।[১]

তাই সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ

"আল্লাহ্ পাক তাঁর সাথে শেরক করাকে কোন অবস্থাতেই মাফ করবেন না"।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪৩-৪৫

অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাককে ত্যাগ করে মুশরেকরা নায়িলা, হানতে প্রভৃতি নারী নামীয় দেবতাকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে প্রকৃত অবস্থা এই, তারা শুধু বিদ্রোহী শয়তানকেই ডাকে কেননা, তাদেরকে এমনি অন্যায় কাজে শয়তানই লিপ্ত করেছে, এমন সর্বনাশা নির্বুদ্ধিতার জন্যে শয়তানই তাদের কুমন্ত্রণা দিয়েছে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ তফসীরকারগণের মতে, ইনাছ্ শব্দটির অর্থ হলো মূর্তি। আরবরা নিজেদের মূর্তিগুলোকে নারী মনে করতো, এজন্যে তাদের নামকরণ করতে তারা স্ত্রীলিঙ্গের শব্দই ব্যবহার করতো। অথবা এর কারণ এই যে, তাদের উপাস্যদের প্রকৃত কোন অস্তিত্বতো ছিল না। শুধু নামই যা, তাই তারা এমন নামই নির্বাচন করতো। অথবা এর কারণ এই যে, তারা নিজেদের উপাস্য তৈরী করতো পাথর, পিতল প্রভৃতি বস্তু দ্বারা। আর এগুলো সম্পর্কে এমন শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে।

হাসান এবং কাতাদা বলেছেন, 'ইনাস' শব্দটির অর্থ হলো প্রাণহীন অর্থাৎ যার মধ্যে রূহ নেই। যেভাবে পুরুষের মোকাবেলায় নারী দুর্বল, তেমনি প্রাণবন্তের তুলনায় প্রাণহীন তুচ্ছ। এজন্যে 'ইনাস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর পাঠ রীতি মোতাবেক "ইনাস" শব্দটি হলো উস্নুন যা আওসানুন এর বহুবচন। এর অর্থ হলো মূর্তি।

যাহ্যাক (রঃ)-এর মতে, 'ইনাস' শব্দটি মালায়েকা বা ফেরেশতাদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কেননা, মুশরেকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর সন্ততি মনে করতো। যেমন পবিত্র কোরআনেও এর উল্লেখ রয়েছে ঃ

وَجَعَلُوا الْمَلٰئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا

ফেরেশতাগণ হলো করুণাময় আল্লাহর বন্দা। এ পৌত্তলিকরা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে মূর্তি তৈরী করেছে।

وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا

আর এরা শুধু শয়তানের পূজা করে। বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মূর্তির সঙ্গে একটি শয়তান থাকতো। পূজারীরা সে শয়তানকে দেখতো এবং তাদের সাথে কথা বলতো।

ইবলিসের শপথ

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, আলোচ্য আয়াতে "শয়তান" শব্দ দ্বারা ইবলিসকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, পৌত্তলিকদেরকে ইবলিসই মূর্তি পূজার আদেশ

দিয়েছে। আর মূর্তি পূজা যারা করে তারা প্রকৃতপক্ষে ইবলিসেরই পূজা করে, এ শয়তান হলো অবাধ্য।

আর শুধু অবাধ্যই নয়, বরং অভিশপ্ত, আল্লাহ পাক তাকে তাঁর রহমত থেকে দূর করে দিয়েছেন। তাই সে অভিশপ্ত, দরবারে এলাহী থেকে বিতাড়িত এবং সমগ্র মানব জাতির চিরশত্রু। যখন ইবলিসকে আল্লাহ পাক তাঁর দরবারে থেকে বিতাড়িত করলেন তখনই সে বলেছিল, "হে আল্লাহ! আমিতো অভিশপ্ত হলাম, কিন্তু যার কারণে আমার এ দুর্দশা হলো আমি তোমার সে বন্দাদেরকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করবো, তাদেরকে সহজে জান্নাতে যেতে দেব না, আমি তাদের অনেককে পথভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত, দিশেহারা করে দোযখে নিয়ে যাব"। ইবলিস একথাও বলেছিল, "হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জত ও জালালের শপথ! যতক্ষণ বনী আদমের দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতেই থাকবো"। পরবর্তী আয়াতেও একথারই উল্লেখ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ

অর্থাৎ আমি তোমার বন্দাদের একটি নিদৃষ্ট অংশ পথভ্রষ্ট করার জন্যে অবশ্যই নিয়ে নেব। এ পর্যায়ে হাসানের একটি বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, প্রতি এক হাজার মানুষের মধ্যে একজন জান্নাত যাবে আর ৯৯৯ জনই দোযখে যাবে। আলোচ্য আয়াতের 'মাফরুজান' শব্দটির অর্থ 'ভিন্ন' অর্থাৎ আমি তোমার বন্দাদের মধ্যে ভাগ্যবান বন্দাদের থেকে ভিন্ন হতভাগা একটি দল তৈরী করবো। আর আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট এবং আদর্শচ্যুত করবো। সরল সঠিক পূণ্য পন্থা থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখবো। তাদের অন্তরে ওয়াস-অ-অসা ঢালবো এবং তাদের নফ্সের কামনা-বাসনাকে অতি সুন্দর করে তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করবো।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম' এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোকের নিকট শয়তান এসে বলে তাকে কে সৃষ্টি করেছে? বন্দা জবাব দেয়, সকলকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

এরপর সে জিজ্ঞাসা করে, তাকে কে সৃষ্টি করেছেন? এ পর্যায়ে যখন কথা পৌছে যায় তখন প্রত্যেকেরই আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। কেননা, এসব শয়তানী ধোকা। এমনি ধোকাবাজী থেকে আত্মরক্ষা করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

অর্থাৎ আমি অবশ্যই তাদের অন্তরে বাতিল ও ভিত্তিহীন আশার সঞ্চার করবো। যথা কেয়ামত হবেনা, আযাব হবেনা, এখনও সুদীর্ঘ জীবন অবশিষ্ট রয়েছে, পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও আখেরাতের সাফল্য তোমরাই লাভ করবে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানব-দেহে যেখানে রক্ত প্রবাহিত হয় সেখানে শয়তানও পৌঁছে। (বোখারী ও মুসলিম)

শয়তান আরো বলে, আমি তাদেরকে শিক্ষা দেব যেন তারা চতুঃষ্পদ জন্তুর কান কেটে দেয়। এ কারণেই আরবের পৌত্তলিকরা গাভী, ছাগল, উটের বাচ্চা প্রভৃতির কান ছিদ্র করে ছেড়ে দিত। দেহ চর্মে সুঁচ দ্বারা দাগ বসিয়ে দিত। দেবতার নামে মাথায় টিকি রাখতো। আর এই ছেড়ে দেয়া উটনী যেখানে ইচ্ছা চরে বেড়াতো। তাকে ধরার অনুমতি কারোই ছিল না। যদি তার মৃত্যু হতো তবে তার গোশ্‌ত মহিলাদের জন্যে হারাম এবং পুরুষদের জন্যে হালাল হতো। সে উটনীর নামকরণ করা হতো বহিরা। শয়তান তার নিজের একথায় এদিকে ইঙ্গিত করে যে, আমার আদেশ মোতাবেক আল্লাহ পাকের হালাল করা বস্তু তারা হারাম করে নেবে, আর যে জন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ এবং নিখুঁত জন্ম গ্রহণ করেছে তাকে ত্রুটি পূর্ণ করে দেবে। অতএব প্রকৃত মোমেনের কর্তব্য হলো এসব শয়তানী আচরণ থেকে দূরে থাকা, শয়তানের এসব ফাঁদ থেকে আত্মরক্ষা করা।

শয়তান আরো বলে, আমি মানুষকে আদেশ দেব যেন তারা আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করে। এ পরিবর্তন আকৃতির ব্যাপারেও হতে পারে এবং অবস্থার ক্ষেত্রেও হতে পারে। যেমন কোন চতুঃষ্পদ জন্তুর চোখ বিনষ্ট করে দেয়া, সুই দ্বারা চামড়ার উপর কোন নকশা নমুনা তৈরী করা। এমনিভাবে লাশকে মোসলাহ করা তথা নাক, কান, হাত, পা কর্তন করা। চন্দ্র-সূর্য, পাথর, বৃক্ষ, নদ-নদী প্রভৃতির পূজা করা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শিশু মাত্রই স্বভাব ধর্ম ইসলামের উপরই জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু তার পিতা মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়। যেভাবে চতুঃষ্পদ জন্তুর বাচ্চা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঠিক অবস্থায় পয়দা হয়, তার লেজ কর্তন করা থাকে না, তার কানে ছিদ্র থাকে না কিন্তু পরবর্তীতে তা করা হয়। অথচ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ

(আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন হবে না।)

বস্তুতঃ শেরক হলো সর্বশ্রেষ্ঠ অপরাধ এবং সর্বাধিক নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য পথভ্রষ্টতা। এর দলিল হিসেবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তোমরা যেসব বস্তুকে আল্লাহ পাকের শরীক মনে কর সেগুলো হলো প্রাণহীন, কারো উপকারও করতে পারে না অপকারও করতে পারে না, বরং তোমরা সে মূর্তিগুলোর নামকরণ করেছ মহিলা নামীয় যার কোন অস্তিত্বই নেই। আর শেরক করার মধ্যে শয়তানের আনুগত্য রয়েছে যে নিজেই অভিশপ্ত, তার আনুগত্যের মাধ্যমে লা'নত বা অভিশাপ ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত শয়তান হলো মানব জাতির নিকৃষ্ট শত্রু। তার সাথে সম্পর্ক মানুষের জন্যে ডেকে আনে ধ্বংস। তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا

শয়তানের শয়তানী চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও যে কেউ আল্লাহ ব্যতীত শয়তানকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে সে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে। সে ক্ষতি এবং সর্বনাশ হবে অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হবে না। কেননা, কোন ব্যবসায়ী যদি তার সমুদয় পূঁজি হারিয়ে ফেলে, সে যেভাবে চরম ধ্বংস ও সর্বনাশের সম্মুখীন হয় ঠিক তেমনি যে আল্লাহর সাথে শেরক করে, যে শয়তানকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে সে তার পূঁজি হারিয়ে ফেলে, ডেকে আনে ধ্বংস, জান্নাতের স্থলে সে দোযখকে ক্রয় করে।

শয়তান যাদেরকে প্রতারণা করে তাদের সাথে অনেক ভিত্তিহীন অঙ্গীকার করে, অর্থাৎ তাদের অন্তরে সর্বদা মন্দ কথার ওয়াস-অ-অসা দিতে থাকে, অথবা এর অর্থ হলো শয়তান তার বন্ধুদের সাথে এমন সব অঙ্গীকার করে যা সে কোন দিন পূর্ণ করে না। আর একথাও সম্ভব যে, শয়তান মানুষের রূপ ধারণ করে মানুষকে প্রতারিত করে এবং ভিত্তিহীন আশা-আকাঙ্খা দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত করে যেমন, পবিত্র কোরআনে উদ্ধৃত হয়েছে, বদরের যুদ্ধের দিন শয়তান কাফেরদের প্রতারণা করে বলেছিল, আজকের দিনে কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আমি এর দায়িত্ব নিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে শয়তান তার অঙ্গীকার কিভাবে ভঙ্গ করেছে তার বিবরণও রয়েছে পবিত্র কোরআনে। এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ

অর্থাৎ যখন উভয় সৈন্য বাহিনী (মুসলিম ও কাফের) পরস্পরের মুখোমুখি হলো তখন সে পলায়ন করলো এবং বললো, "আজ তোমাদেরকে কেউ সাহায্য করতে পারবে না। আমি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এমন বস্তু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পার না"।

মূলতঃ শয়তানের অঙ্গীকার নিতান্ত প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়, যা অপকারী তাকে শয়তান মানুষের নিকট উপকারী রূপে পেশ করে। আর যা উপকারী তাকে অপকারী রূপে উপস্থিত করে। যেমন আল্লাহর রাহে দান করা মানুষের জন্যে অত্যন্ত উপকারী কিন্তু শয়তান এসে মানুষকে ভয় দেখায় যে, যদি তুমি আল্লাহর রাহে দান কর অথবা আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য কর তবে তোমাকে দারিদ্রের কষাঘাত সইতে হবে।

এরাই সে সব লোক যাদের ঠিকানা হলো দোযখ। যারা দোযখের শাস্তি থেকে পলায়নের স্থান পাবে না। তথা দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে তারা কোন দিন নাজাত পাবে না, তাদের চির শাস্তি অবধারিত।

ইমাম রাজী (রঃ) শয়তানের ধোকার একটি বিবরণ দিয়েছেন যে, মানুষের অন্তরে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, তোমরা বয়স অনেক আছে, তুমি দুনিয়ার আশা-আকাঙ্খা পূরণ করে নাও। দুনিয়ার আনন্দ-উল্লাসে মুগ্ধ মত্ত থাক, আখেরাত আসতে অনেক বিলম্ব। কিন্তু মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায় মৃত্যুর মাধ্যমে, আশা আকাঙ্খা অপূর্ণ থেকে যায় এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কোন প্রস্তুতি ব্যতীতই দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিতে হয়। এভাবে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে চরম ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়।[১]

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَ
مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ
مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا
نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ
دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٢٦﴾

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৭৯-৮০
তফসীরে কবীর খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫০

তরজমা

(১২২) এবং যারা আল্লাহ পাকের উপর ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে আমি তাদেরকে অচিরেই এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়। সে বেহেশতে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য, এবং আল্লাহ তায়ালা থেকে অধিকতর সত্য কথা কে বলবে?

(১২৩) তোমাদের অযথা আশা আকাঙ্খায় কোন কাজ হবে না এবং আহলে কিতাবদের আশ্বাসও কোন প্রকার ফলদায়ক হবে না। যে অন্যায় কাজ করবে তার কর্মফল তাকেই দেয়া হবে। এবং সে আল্লাহ ভিন্ন কাউকে বন্ধু বা সহায়ক হিসেবে পাবে না।

(১২৪) পুরুষ হোক বা নারী যে নেক কাজ করে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হয় তবে সেসব লোক বেহেস্তে প্রবেশ করবে এবং তারা বিন্দুমাত্রও অত্যাচারিত হবে না।

(১২৫) ধর্মের ব্যাপারে সে ব্যক্তির চেয়ে ভাল কে? যে আল্লাহ তায়ালার জন্যে স্বীয় মুখমণ্ডল অবনত করে এবং সে নেককারও হয় এবং সে ইব্রাহীম (আ.)-এর সুদৃঢ় মিল্লাতের অনুসরণ করে। আর আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীম (আ.)-কে স্বী বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

(১২৬) এবং আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ পাকেরই জন্যে এবং আল্লাহ পাক সমস্ত বিষয়কে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অবস্থা এবং তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর এ আয়াতে রয়েছে মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ।

আল্লাহ পাকের যেসব বন্দাগণ ঈমান লাভে ধন্য হবে, যারা মন্দ কাজ তথা পাপাচার পরিহার করে চলবে এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনার পর ঈমান অনুযায়ী আমলে সালেহ তথা সৎ কাজে জীবন অতিবাহিত করবে, তারা চিরদিন সুখ-শান্তি ভোগ করবে, অনন্ত অসীম নেয়ামতে পরিপূর্ণ বেহেশতে বাস করবে। বেহেশতের ইমারত গুলোর তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হবে, আর এ বেহেস্তে তারা চিরদিন থাকবে। আর এটি আল্লাহ পাকের অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ পাকের চেয়ে অধিকতর সত্য প্রতিশ্রুতি কে দিতে পারে? এ বাক্যটির তাৎপর্য সম্পর্কে তফসীরকারগণ বলেছেন, যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতে শয়তানের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا

(অর্থাৎ) শয়তানের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়) তাই এ আয়াতে মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ ঈমানদার

নেককারদের জন্যে জান্নাতের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তাকে সাধারণ প্রতিশ্রুতি মনে করোনা, বরং জেনে রাখ এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ পাকের আর আল্লাহ পাকের চেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে হতে পারে? অর্থাৎ হতে পারে না।

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ

শানে নুযুল

এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, ইহুদী এবং ঈসায়ীরা একথা বলে বেড়াতো যে, আমরা ব্যতীত জান্নাতে কেউ যাবে না। আর মক্কার কোরায়শরা আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা অস্বীকার করছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এরশাদ হয়েছেঃ ইহুদী খৃষ্টানরা এ আকাঙ্খা করতো যে, তারা ব্যতীত কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন, তোমাদের এসব আশা-আকাঙ্খা ভিত্তিহীন এবং দূরাশা মাত্র। পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর ভিত্তি হলো আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এবং নেক আমল। এমনিভাবে মক্কার কোরায়শদের সম্পর্কেও সর্তকবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, তোমাদের এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে মূর্তিগুলো তোমাদের জন্যে সুপারিশকারী হবে, বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী তোমাদের কল্পনার উর্ধ্বে।

যেমন কর্ম তেমন ফল

বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতে মক্কাবাসীকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদের ভিত্তিহীন আশা-আকাঙ্খার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। আখেরাতে চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্য নির্ভর করে ঈমান এবং নেক আমলের উপর। যদি ঈমান ও নেক আমলের অভাব থাকে তবে পরিণাম হবে ভয়াবহ। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ

অর্থাৎ পরকালীন জিন্দেগীর সাফল্য তোমাদের আশা-আকাঙ্খা ও খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভর করবে না; বরং এর সম্পর্ক তোমাদের কর্মের সঙ্গে, যেমন কর্ম হবে তেমনই হবে ফল। যে মন্দ কাজ করবে যেমন আল্লাহর নাফরমান হবে, অবাধ্য হবে, পাপাচারে লিপ্ত হবে তাকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে। আর সেই কঠিন সময়ে সে কোন বন্ধু বা সাহায্যকারীও পাবে না। কিন্তু তারা যেহেতু আল্লাহর নাফরমান তাই তাঁর সাহায্য পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আর তিনি ব্যতীত আর কেউ সাহায্য করতেও পারবে না।

তফসীরকারগণ বলেছেন, যদিও এ আয়াত মক্কাবাসী কাফের এবং আহলে কিতাবদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে কিন্তু আলোচ্য আয়াতে যে ঘোষণা রয়েছে তা সর্বকালের মানুষের জন্যে। মোমেন; কাফের সকলের জন্যে রয়েছে এ ঘোষণায় সতর্কবাণী। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এ মতই পোষণ করেছেন।

আখেরাতে কোন কর্মের শাস্তির পূর্বশর্ত হলো মাগফেরাত না হওয়া অর্থাৎ আল্লাহ পাক যদি কোন ব্যক্তিকে ক্ষমা না করেন তবে শাস্তি অবধারিত মনে করতে হবে। এমনিভাবে পবিত্র কোরআনের যে সব আয়াতে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়নেও এই একই শর্ত। যদি আল্লাহ পাক ক্ষমা না করেন তবে শাস্তি হবে। আর সে শাস্তি দুনিয়াতেও হতে পারে, আখেরাতেও হতে পারে।

হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, সাহাবায়ে কেরামের একদল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা একথার উপর আমার নিকট বয়আত কর যে, কোন কিছুকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচারে লিপ্ত হবে না এবং নিজের সন্তান-সন্ততিদের হত্যা করবে না। কোন ব্যক্তির প্রতি অপবাদ দেবে না এবং কোন ভাল কাজে অবাধ্য হবে না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকার রক্ষা করবে আল্লাহ পাক তার সওয়াবের দায়িত্ব নিয়েছেন। যদি সে কোন পাপ করে এবং দুনিয়াতে তার কোন শাস্তি হয় তাহলে তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ অবাধ্য হয়, অতঃপর আল্লাহ পাক তার এ নাফরমানী গোপন রাখেন তবে তার বিষয়টি আল্লাহ পাকের দরবারে সোপর্দ হবে। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন অথবা শাস্তিও দিতে পারেন। আমরা এ শর্ত সমূহের উপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বয়আত করলাম। (বোখারী, মুসলিম)

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যদিও কারো কারো মতে এ আয়াতের আদেশ

وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا

শুধু কাফেরদের জন্যে, মোমেনদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই কেননা, মোমেনদের সাহায্যকারী স্বয়ং আল্লাহ পাক। তিনি মোমেন বান্দাদেরকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে মোমেনদের পক্ষে আল্লাহর নবী সুপারিশ করবেন।

কিন্তু এ অভিমত সঠিক নয় কেননা, হযরত আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে,

আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির ছিলাম। যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আবু বকর, আমি তোমাকে একখানি আয়াত শোনাবো যা আমার প্রতি নাযিল হয়েছে, আমি আরয করলাম এরশাদ করুন, তখন তিনি এ আয়াত পাঠ করলেনঃ

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ

এ আয়াত শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার কোমরে ব্যথা হতে লাগলো। আমি আমার কোমরকে সোজা করলাম অথচ এমন ঘটনা ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আবু বকর! তোমার কি হয়েছে? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক। আমাদের মধ্যে যে কেউ কোন মন্দ কাজ করলে তার শাস্তি হয়ে যাবে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তুমি এবং তোমার সাথী মোমেন দুনিয়াতেই মন্দ কাজের শাস্তি পেয়ে যাবে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে হাযির হবে। কিন্তু অন্যদের গুনাহ একত্রিত করে রাখা হবে এবং কেয়ামতের দিন সমস্ত গুনাহর শাস্তি দেয়া হবে (বগবী, তিরমিজী, আব্‌দ এবনে হোমায়েদ, এবনুল মুনজের)।[১]

আহমদ, এবনে হাব্বান এবং হাকেম এ বর্ণনায় হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কথা এভাবে সংকলন করেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) আরয করলেন, এ আয়াতের মর্মানুযায়ী কে নাজাত পাবে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরয করলেন, তোমাদের কোন চিন্তা নেই। তোমরা কি অসুস্থ হওনা? তোমরা কি বিপদগ্রস্ত হও না? আমি আরয করলাম, এমনতো হয় তখন তিনি এরশাদ করলেন, এগুলো এই শাস্তি যার কথা আলোচ্য আয়াতে রয়েছে।

একটি নেকীর জন্যে দশটি নেকীর সওয়াব

ইমাম বোখারী (রঃ) এ মর্মে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কালবী আবু সালেহের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন সাহাবায়ে কেরামের নিকট তা অত্যন্ত কঠিন মনে হলো। তখন তারা আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমাদের মাঝে কে আছে যে কোন মন্দ কাজ করেনি? এমন অবস্থায় শাস্তি কিভাবে হবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ দুনিয়াতে যে দুঃখ কষ্ট

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৮১-৮২

আসে তা মন্দ কাজের শাস্তিস্বরূপ আসে। অতএব, যে ব্যক্তি একটি নেকী করবে সে তার বিনিময়ে ১০টি নেকীর সওয়াব পাবে। এখন কোন মন্দ কাজের শাস্তি যদি দেয়া হয় তবে ১০ নেকী থেকে ১টি নেকীর সওয়াব কম করা হবে, আর ৯টি নেকী থেকে যাবে। এখানে এ-ও উল্লেখ্য, প্রত্যেকটি নেকীর সওয়াব ১০টি নেকীর সমান লিপিবদ্ধ হবে। আর ১টি মন্দ কাজের শাস্তি ১টিই লেখা হবে এবং গুনাহর শাস্তিতে ১টি নেকীই কম করা হবে। আর এভাবে ১০টি গুনাহর শাস্তিতে ১০টি নেকী বিনষ্ট হবে যা প্রকৃত ১০ নেকী নয়, বরং একটি নেকী।

তবে আখেরাতের বদলা হবে এভাবেঃ সেখানে নেকী এবং মন্দ কাজের পরিমাপ করা হবে। প্রত্যেক মন্দ কাজের বিনিময়ে একটি নেকী বিনষ্ট হবে। এরপর যদি নেকী বাকী থাকে তবে সে জান্নাতে যাবে। আর যদি নেক আমল বেশী থাকে তবে নেকীও বেশী হবে।

আলোচ্য আয়াতের আরো একটি শানে নুযুল বর্ণনা করেছেন এবনে জরীর, কাতাদা, মসরুক, যাহ্যাক এবং সুদ্দী। একবার মুসলিম এবং খৃষ্টানদের মধ্যে একটি বিতর্ক হয়। আর অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ইহুদী, ঈসায়ী এবং মুসলমান এক জায়গায় বসেছিলেন এবং প্রত্যেকেই নিজেদেরকে উত্তম বলে দাবী করেছিলেন। আহলে কিতাবরা বলছিল, আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে আগমন করেছিলেন। আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পূর্বে নাযিল হয়েছিল। অতএব, আমরা আল্লাহ পাকের অধিকতর নৈকট্য লাভ করেছি।

মুসলমানগণ বলেন, আমাদের নবী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। আর আমাদের কিতাব সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে। আমরা তোমাদের কিতাবের প্রতি ঈমান আনি, অথচ আমাদের কিতাবের প্রতি তোমাদের ঈমান নেই। অতএব, আমরা উত্তম তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াতের এ শানে নুযুল গ্রহণ করলে

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ

এর খেতাব মোমেনদের উদ্দেশ্যে হবে। আর وَمَنْ يَّعْمَلْ এর হুকুম সকলের জন্যে প্রযোজ্য হবে।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ

শানে নুযুল

এবনে জরীর মসরুকের বর্ণনা থেকে এবং বগবী আ'মাসের বর্ণনা থেকে এবনে জোহার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন পূর্ববর্তী আয়াত নাযিল হলো, আহলে কিতাব তথা ইহুদী এবং নাসারারা বলতে লাগলো আমরা এবং তোমরা এক সমান।

তখন আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন। আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে কোন লোক নেক আমল করে, সে পুরুষ হোক বা নারী যদি সে মোমেন হয় তবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, সৎ কাজ বা পূণ্য সাধনা আল্লাহ্ পাকের দরবারে কবুল হওয়ার জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত। ঈমান ব্যতীত সৎ কাজের কোন গুরুত্ব নেই। বেহেশতের মনোরম উদ্যানে চিরকাল তারাই বাস করবে যারা ঈমানদান অবস্থায় নেক আমল করবে। কেননা, নেক আমলের শুভ পরিণতি বা সওয়াব ঈমানের উপরই নির্ভরশীল। মন্দ কাজের শাস্তির জন্যে কাফের হওয়া শর্ত নয় কেননা, পাপ কার্য ছোট হোক বা বড় আল্লাহ্ পাক তা পছন্দ করেন না। পাপ কার্য মোমেনই করুক বা কাফের- উভয়ই এ সম্পর্কে উচ্চারিত সতর্কবাণীর আওতাধীন।

ঈমানই সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত

কিন্তু সৎ কাজ তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা ঈমানদার অবস্থায় করা হবে। কাফেরদের কোন কাজই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে হয় না। আর যে কাজ আল্লাহ পাকের জন্যে না হয় তা শেরক এবং গুনাহ, আদৌ সৎ কাজ নয়।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানই সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত, যে এ নেয়ামত লাভ করেছে সে সর্ব শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ

যারা ঈমানদার অবস্থায় নেক আমল করবে তারাই বেহেশতে প্রবেশ করবে।

وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

তাদের সওয়াব এতটুকুও কম করা হবে না, তাদের প্রতি সামান্য জুলুমও করা হবে না। যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমানদার এবং অনুগত হবে তার সওয়াব মোটেই কম করা হবেনা। আর যদি সে গুনাহগার হয় তবে তাকে তার গুনাহর চেয়ে অধিক শাস্তি দেয়া হবে না।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যে, এ আয়াতে সকল মোমেনের জন্যই রয়েছে খোশখবরী, মোমেন নেককার হোক বা গুনাহগার-উভয়ের জন্যে রয়েছে এ সুসংবাদ। যে নেককার হবে তার জন্যে এ খোশখবরী যে, তার নেক আমলের সওয়াব কম করা হবে না, আর যে মোমেন অথচ গুনাহগার তার জন্যে এতে রয়েছে এই খোশখবরী যে, গুনাহর চেয়ে অধিক শাস্তি তাকে দেয়া হবে না।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ

আর যে আল্লাহ পাকের হুকুমের সম্মুখে অম্লান বদনে মাথা পেতে দিয়েছে তথা আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছে, আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ আন্তরিকভাবে মেনে চলেছে এবং যাবতীয় সৎ কাজ এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করেছে এবং আল্লাহ পাকের বন্ধু ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ'র অনুসরণ করেছে সৎ কাজে কে তার সমকক্ষ হতে পারে? তথা কেউ হতে পারেনা।

مُحْسِنٌ

আলোচ্য আয়াতে "মোহসেনুন" শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ বলেছেন যে, সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ভাল কাজ করে এবং মন্দ কাজ পরিহার করে। একবার হযরত জীব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এহসানের তাৎপর্য কি? তখন তিনি এরশাদ করেছিলেনঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ

অর্থাৎ এহসানের তাৎপর্য হলো তুমি এভাবে আল্লাহর এবাদত করেবে যে, তুমি তাঁকে দেখছ, যদি তুমি তাঁকে দেখার অবস্থায় না থাক তবে একথা মনে রেখো যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।

وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا

আর যে মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ করে সঠিকভাবে যেভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মূর্তি পূজা পরিহার করেছিলেন, যদিও তাঁর পিতা এবং সম্প্রদায় মূর্তি পূজক ছিল, তিনি তাদের সকলকে ছেড়ে এক আল্লাহর পথের অনুসারী হয়েছিলেন। তৌহিদের বাণী প্রচার করেছিলেন, শুধু এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তাই যারা মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ করে তারাই সত্য অবলম্বন করে, আর পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্য তাদের জন্যে নিদৃষ্ট।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, শান্তি, চির নাজাত এবং পরম সাফল্য তথা জান্নাত লাভের পূর্বশর্ত হলো মানুষ যেন প্রকৃত মোমেন হয়। আর প্রকৃত মোমেন হওয়ার পথ-নির্দেশনা রয়েছে এ আয়াতে। আর তা হলো এক আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্য প্রকাশ করা এবং মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারী হওয়া, আর একথাটিকে আরো গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবহ করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا

অর্থাৎ আল্লাহ পাক ইব্রাহীম (আঃ)-কে আপন বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

তফসীরকারগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহর বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার কয়েকটি কারণ লিখেছেনঃ

(১) তিনি শুধু আল্লাহর মুখোপেক্ষী ছিলেন, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সৃষ্টির নিকট তিনি তাঁর প্রয়োজনের কথা বলতেন না। এমনকি যখন তাঁকে নমরূদ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল তখন জীব্রাঈল (আঃ) এসে বলেছিলেন, আপনার কি কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে? তখন তিনি বলেছিলেন, হে জীব্রাঈল! আমার সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই, যাঁর জন্যে আমি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হচ্ছি তিনি কি আমার অবস্থা দেখেন না? তখন জীব্রাঈল (আঃ) বললেন, তাঁর নিকটই দোয়া করুন। তখন ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।

(২) আল্লামা বগভী হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অত্যন্ত বড় অতিথি পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। মানুষকে খাবার খাওয়ানো তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। সর্বদা তাঁর বাড়ীর সম্মুখে অনেক লোকের সমাগম হতো। তাদের খাবারের ব্যবস্থা তিনি করতেন। তাঁর খাদ্য দ্রব্য মিশর থেকে সংগ্রহ করা হতো। একবার দেশে খুব দুর্ভিক্ষ হলো, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) খাদ্য দ্রব্যের জন্যে মিশরে লোক প্রেরণ করলেন, যিনি খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহের দায়িত্ব পালন করতেন তিনি বললেন, যদি এ খাদ্য দ্রব্য শুধু ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্যে হতো তবে তাঁর জন্যে দিতে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু যেহেতু তিনি অনেক লোকের খাবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাই এবার এ দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়। এমনি অবস্থায় যে উষ্ট্রের বহর নিয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর লোকেরা মিশর গিয়েছিলেন তা খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ ব্যতীতই দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। পথে তারা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে-কিছু বালু তুলে নেন। যাতে করে লোকেরা মনে করে যে, আমরা খালি হাতে আসিনি, খাদ্য দ্রব্য নিয়েই এসেছি। তারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত ও চিন্তিত হলেন। এরপর তিনি ঐ অবস্থায় নিদ্রিত হলেন, কিছুক্ষণ পর তাঁর স্ত্রী সারাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি কিছুই আননি? তারা বললো, কেন আনবো না? এরপর সারাহ বালু ভর্তি বস্তাগুলোর নিকট গমন করলেন এবং বস্তা খুলে দেখলেন তাতে অতি উন্নত মানের আটা রয়েছে। এরপর তাঁর হুকুমে রুটি তৈরী করা হলো এবং অপেক্ষমান মেহমানদেরকে খাবার পরিবেশন করা হলো। এরই মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জাগ্রত হলেন এবং খাবারের সুগন্ধ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সারাহ, এ খাদ্য দ্রব্য কোথা থেকে এসেছে? তিনি বললেন, আপনার মিশরীয় বন্ধুর নিকট থেকে, তখন তিনি বললেনঃ না; বরং এ খাদ্য এসেছে আমার খলীল (বন্ধু) আল্লাহ পাকের তরফ থেকে। আর সেদিনই আল্লাহ পাক ইব্রাহীম (আঃ)-কে খলীল বা বন্ধু বলে ঘোষণা করলেন।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

অর্থাৎ নিখিল বিশ্বে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন, নিয়ন্ত্রণাধীন। সবকিছুই আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ পাক কিন্তু কারোই মুখাপেক্ষী নন। যদি আল্লাহ পাক কাউকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করেন তবে কোন অবস্থাতেই তা নিজের জন্যে নয়, বরং যাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে তার মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এবং তাকে করুণা-ধন্য করার উদ্দেশ্যেই তা করা হয়। অতএব, কাউকে আল্লাহ পাক বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলে তাতে কোন প্রকার ভুল বোঝাবুঝির ন্যায্য কারণ নেই। কেননা, সব কিছুই আল্লাহ পাকের আয়ত্বাধীন রয়েছে।

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ ۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿١٢٧﴾ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٢٨﴾

তরজমা

(১২৭) এবং (হে রসূল!) মানুষ আপনার নিকট নারী জাতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা দান করছেন আর পবিত্র কোরআনে তোমাদেরকে যা বলা হচ্ছে তা সেসব এতীম নারীদের সম্পর্কে যাদের প্রাপ্য হক্ব তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাও না আর দুর্বল শিশুদের সম্পর্কে ও এতিমদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর। এবং তোমরা ভাল কাজ যা-ই কর, আল্লাহ পাক তা খুব ভাল ভাবেই জানেন।

(১২৮) যদি কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীর অন্যায় আচরণ অথবা উপেক্ষার ভয়ে ভীত হয় তবে তারা উভয়ে কোন সু-মীমাংসায় উপনীত হলে তাতে কোন গুনাহ নেই এবং সু-মীমাংসা তথা আপোষ-নিষ্পত্তিই উত্তম। মানুষ লোভের কারণেই স্বভাবতঃ কৃপণ হয় এবং যদি তোমরা ভাল কাজ কর, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

হাকেম মোসতাদরাকে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বর্বরতার যুগে কোন শিশু বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তাকে উত্তরাধিকার দেয়া হতো না এবং স্ত্রীলোকদেরকেও উত্তরাধিকার দেয়া হতো না। ইসলামের আবির্ভাবের পর স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন।

এরশাদ হয়েছেঃ (হে রসূল!) লোকেরা আপনাকে স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। 'এসতেফতা' শব্দটির অর্থ হলো কোন বিষয় সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা। আর 'ফতোয়া' শব্দটির অর্থ হলো কোন কঠিন সমস্যার জবাব।

এবনুল মুনজের সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, শিশু বালেগ না হওয়া পর্যন্ত বর্বরতার যুগে তাকে উত্তরাধিকার দেয়া হতো না। আর স্ত্রীলোকদেরকেও উত্তরাধিকার দেয়া হতো না।

সূরা নেসায় যখন উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত বিধি-নিষেধ নাযিল হয় তখন মানুষের জন্যে এটি একটি সমস্যার আকারে দেখা দেয়। লোকেরা বলতে থাকে যে, শিশু এবং স্ত্রীলোকরাও উত্তরাধিকারী হবে। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট লোকেরা প্রশ্ন করতে থাকে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

এবনে জরীর আবদ এবনে হোমায়েদের সূত্রে মুজাহেদের এ অভিমতই বর্ণনা করেছেন। ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেনঃ এ আয়াতে সে ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে কোন এতিমের অভিভাবক এবং উত্তরাধিকারী কিন্তু মেয়েটি তার সম্পদে ওয়ারিশ হিসেবে শরীক হয়েছে, এজন্যে সে ঐ এতিম মেয়েটিকে অন্যত্র বিবাহ দানে বিরত থাকে।

আল্লামা বগভী (রঃ) আরও একটু বাড়িয়ে লিখেছেন যে, এতিম মেয়েটি অসুন্দর হওয়ার কারণে সে নিজেও ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হয় না এবং অন্য কোথাও বিয়ে দিতেও সে চায় না। কেননা, এমনি অবস্থায় ঐ মেয়ের স্বামী হিসেবে বাইরের একটি লোক তার সম্পদে শরীক হয়ে যাবে। এজন্যে আমৃত্যু মেয়েটিকে সে তার ঘরে বন্দী রাখে। আর এ ব্যক্তি সে মেয়েটির উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

অন্য একটি বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে। এ আয়াতে সেই এতিম মেয়েকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে এমন কোন ব্যক্তির আশ্রয়ে আছে যে ঐ এতিমের অভিভাবক, এমন অবস্থায় যদি মেয়েটি ধন-সম্পদের মালিক হয় এবং সুন্দরীও হয় তবে সে নিজেই তাকে বিয়ে করার জন্যে প্রার্থী হয়। পক্ষান্তরে, যদি মেয়েটি সম্পদের অধিকারী না হয়, সুন্দরীও না হয় অথবা দরিদ্র হয় তবে সে তার সাথে বিবাহ করতে আগ্রহী হয় না, এমন মেয়ে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ

আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত দ্বারা এ জুলুমের অবসান ঘটিয়েছেন।

এ পর্যায়ে আহকামুল কোরআনে কাজী ইসমাঈল একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা আবদুল মালেক এবনে আহমদ এবনে হজমের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ওসরাহ বিনতে হজম হযরত সা'দ এবনে রবীর (রাঃ) স্ত্রী ছিলেন। সা'দ ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর স্ত্রী ওসরাহ এবং একটি মেয়ে রেখে যান। ঐ মেয়েটি পিতার উত্তরাধিকার লাভের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ

অর্থাৎ লোকেরা আপনার নিকট নারী জাতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আল্লাহ পাক অতঃপর এরশাদ করেছেনঃ

قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ - الاية

অর্থাৎ (হে রসূল!) আল্লাহ পাক তোমাদেরকে নারীদের সম্পর্কে বিশেষতঃ এতিম নারীদের হক্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় বিধি-নিষেধ প্রদান করেছেন।

মূলতঃ প্রাক-ইসলামী যুগে বর্বরতার অন্ধকার জমানায় আরবরা এতিম মেয়েদের প্রতি বিভিন্ন ভাবে চরম জুলুম অত্যাচার করতো। তাদের বিষয়-সম্পত্তি

আত্মসাত করার জন্যে তাদেরকে আজীবন বন্দী রাখতো। বিবাহিতা স্ত্রীর হক্ব ও অধিকার তাদেরকে দেয়া হতো না এবং এতিম মেয়েদের বিষয়-সম্পত্তির লোভে অন্যত্র তাদেরকে বিবাহ দিত না। তাদেরকে উত্তরাধিকার দেয়া হতো না এ কারণে যে, যারা যুদ্ধ করে অন্যকে পরাজিত করতে পারে তারাই হবে সত্যিকার উত্তরাধিকারী আর মেয়েরা যেহেতু দুর্বল এজন্যে তারা ঐ দায়িত্বও পালন করতে পারবে না এবং উত্তরাধিকারীও হবে না। পবিত্র কোরআন এ অত্যাচারিত, বঞ্চিত নারী সমাজের হক্ব আদায়ের তাগিদ করেছে এবং এতিম নারীদের তাদের হক্ব থেকে বঞ্চিত না করার বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে। এমনিভাবে এতিম শিশুদের সম্পর্কেও আলোচ্য আয়াতে বিশেষ তাগিদ করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ

দুর্বল শিশুদের হক্ব তদানীন্তনকালে আত্মসাত করা হতো। ইসলাম এসেছে বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনের জন্যে, দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণের জন্যে। এতিম-মিসকিন-অনাথ বিপদগ্রস্ত মানুষের আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে। তাই পবিত্র কোরআনে পরবর্তী বাক্যেই এ ঘোষণা করেছেঃ

وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ

"আর তোমরা এতিমদের সম্পর্কে সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর"।

তফসীরকারগণ এ আয়াতে 'কেসতুন' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন উত্তরাধিকার সম্পর্কে সুবিচার কায়েম করা। যেহেতু এ পর্যায়ে বর্বরতার যুগে অবিচার করা হতো তাই সুবিচার কায়ের করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হাদীস শরীফে আছে, এ বিষয়ে নির্দেশ জারী হবার পর আরবের সরদাররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললোঃ আপনি নাকি কন্যা এবং ভগ্নিদেরকেও উত্তরাধিকার দান করেছেন অথচ আমাদের বিচারে উত্তরাধিকার লাভের হক্বদার শুধু তারাই, যারা দুশমনের সঙ্গে লড়াই করে গনিমতের মাল আনতে পারে। তার-ই জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাকই মেয়েদের উত্তরাধিকার প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

আর একথা সর্বজন বিদিত এবং স্বীকৃত যে, আল্লাহ পাকের হুকুমের সম্মুখে আর কারো কোন যুক্তি-তর্ক চলতে পারে না। আল্লাহর হুকুম অবশ্য পালনীয়। এতিম নারীদের বেলায় এ হুকুম লাভের পর সাহাবায়ে কেরাম সকল অন্যায় পন্থা সঙ্গে সঙ্গে বর্জন করেন এবং আল্লাহর বিধানের বাস্তবায়ন হয় সর্ব ক্ষেত্রে।

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ

আর তোমরা এতিম নারী ও শিশুদের ব্যাপারে যা কিছু কল্যাণকর কাজ কর আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে সওয়াব দান করবেন।

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا

শানে নুযুল

বোখারী, আবু দাউদ এবং হাকেম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে এবং তিরমিজী হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন উম্মুল মোমেনীন হযরত সাওদা (রাঃ) অত্যন্ত বেশী বয়ঃবৃদ্ধা হয়ে যান, তখন তিনি আশঙ্কা করেন যে, হয়তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে তালাক দিয়ে দেবেন। তখন তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ আরযী পেশ করলেন যে, আমার জন্যে আপনার যে সময় নিদৃষ্ট রয়েছে তা আমি আয়েশাকে দিয়ে দেই। তবুও আপনি দয়া করে আমাকে নিজের খেদমতে রাখুন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) ঘটনাটিকে আরো একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত সাওদা বিনতে জমাআ (রাঃ) যখন অনেক বয়স্কা হয়ে যান এবং তিনি জানতে পারেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে তালাকের কথা চিন্তা করছেন তখন তিনি আরয করলেনঃ আমি আমার হক্ব আয়েশা (রাঃ)-কে দিয়ে দিলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর এ আরযী কবুল করলেন। (আবু দাউদ) তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি এসব ব্যাপারে কোর মীমাংসা হয় তবে তা বৈধ। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এন্তেকালের সময় তাঁর নয় জন স্ত্রী ছিলেন। তিনি আট জনকে তাঁর সময় নিদৃষ্ট করে দিয়েছিলেন। হযরত সওদা (রাঃ) বলেছিলেন, আমি আমার হক্ব আয়েশা (রাঃ)-কে দিয়ে দিলাম, আমার শুধু এতটুকু আকাঙ্খা যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার স্ত্রী হিসেবে থাকি।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত সওদা (রাঃ) তাকে তালাক দেয়া হবে-এ সম্পর্কে খবর পেয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে হাযির হন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনাকে সেই আল্লাহর শপথ! যিনি আপনার প্রতি গবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন এবং যিনি আপনাকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বাধিক পছন্দনীয় বানিয়েছেন, আমাকে দয়া করে আপনার স্ত্রী হিসেবে রাখুন, আমার অনেক বয়স

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৯৪

হয়েছে, এ পৃথিবীতে আমার আর কোন আকাঙ্খা নেই। শুধু একটি মাত্র আকাঙ্খা যে, কেয়ামতের দিন আপনার স্ত্রী হিসেবে আমার পুনরুত্থান হোক। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর আরযী কবুল করলেন।

আয়াতের মর্মকথা

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি কোন বিষয়ে মনোমালিন্য হয় অথবা স্ত্রী যদি তার প্রতি স্বামীর অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করে, তখন স্ত্রী যদি স্বামীকে তার দেন মোহর বা ন্যায্য ব্যয় ভারের অংশ বিশেষ লাঘব করে দেয় তবে তাতে কোন গুনাহ নেই। স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ একান্ত প্রয়োজনীয়। এমনি অবস্থায় স্বামীর মন আকৃষ্ট করতে বুদ্ধিমতী স্ত্রী নিজের হক্ব পরিহার করে যদি কোন প্রকার মীমাংসা করে তবে তা উত্তম।

বস্তুতঃ অর্থ লিপ্সা মানুষের মজ্জাগত এবং স্বভাবগত। তাই স্বামীর মন আকৃষ্ট করতে যদি স্ত্রী কোন আর্থিক সুবিধা লাভের প্রস্তাব দেয় তবে স্বামীর মন আকৃষ্ট হতেও পারে। যদি তোমরা স্বামী স্ত্রীর একে অন্যের হক্ব আদায় কর, স্ত্রীর প্রতি ভাল ব্যবহার কর, স্ত্রীর প্রতি জুলুম অত্যাচার পরিহার কর এবং পরস্পরের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে থাক তবে মনে রেখো, আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। তোমরা যা কিছু কর, একের প্রতি অন্যের আচরণ ভাল হোক বা মন্দ তা আল্লাহ পাকের নখদর্পণে থাকে।

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُوا
بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

তরজমা

(১২৯) এবং তোমরা সকল পত্নীদের মধ্যে কখনও সমতা রক্ষা করতে পারবে না যদিও তোমরা মনে প্রাণে তা-ই চাও, তবুও একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে

পড়ো না, আর অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় ছেড়ে দিও না। যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর এবং সাবধান হও তবে আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(১৩০) এবং যদি (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ পাক আপন উদারতার গুণেই তাদের প্রত্যেককে অভাব মুক্ত করবেন এবং আল্লাহ পাক অত্যন্ত উদার, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরুল কোরআন

যদি কারো একাধিক স্ত্রী থাকে তবে সবার প্রতি প্রেম ভালবাসা এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে সমান আচরণ করার শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। কথায়-কাজে, ওঠা-বসায়, প্রেম-ভালবাসায়, আচার-আচরণে একটু পার্থক্য থেকেই যায়। তবুও এমন অবিচার যেন না হয় যে, একজনকে নিয়ে সম্পূর্ণ মুগ্ধ মত্ত থাক আর অন্য জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করারও সময় না পাও। স্ত্রী হিসেবে তার যে অধিকার তা থেকে বঞ্চিত কর অথচ তাকে তালাক দানের মাধ্যমে অন্যত্র বিবাহের সুযোগ দিতেও প্রস্তুত হও না। এভাবে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখো না। এ পর্যায়ে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি এরশাদ করেছেনঃ যার দু' স্ত্রী অথচ সে তাদের সাথে সমান ব্যবহার করে না কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তির শরীরের অর্ধাংশ অবশ থাকবে। (তিরমিজী)

আবু দাউদ শরীফে এই হাদীসখানি অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে তা হলোঃ যার দু' স্ত্রী, সে যদি একজনের প্রতি অধিকতর আসক্তি প্রকাশ করে তবে কেয়ামতের দিন তার দেহ একদিকে ঝুঁকে থাকবে। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ একজনের প্রতি অধিকতর আসক্তির তাৎপর্য হলো আচার-আচরণে তারতম্য ও পার্থক্য। কিন্তু ভালবাসার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নাও হতে পারে। কেননা, ভালবাসা নিতান্তই আন্তরিক ব্যাপার। তাতে কারো প্রতি কম-বেশী হওয়ায় অন্যায়ের কিছু নেই। তবে অন্যান্য বিষয়ে দু' স্ত্রীর মধ্যে তারতম্য বা পার্থক্য করা বৈধ নয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সহধর্মীনীগণের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমান আচরণ করতেন। এরপর দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমার সাধ্যে যতটুকু আছে তা আমি করছি (অর্থাৎ সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার) কিন্তু যে বিষয়টি আমার সাধ্যে নেই যা শুধু তোমার আয়ত্ত্বাধীন তাতে আমাকে তুমি পাকড়াও করোনা। অর্থাৎ মহব্বতের ব্যাপারে আমাকে পাকড়াও করোনা কেননা, মন তোমার এখতিয়ারে, আমার এখতিয়ারে নয়। এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)।[১]

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৬৮

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে উপরোক্ত হাদীস এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দোয়া উল্লেখ করার পর হযরত ওমর (রাঃ)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) একবার উম্মুল মোমেনীনদের নিকট কিছু তোহফা (আর্থিক) প্রেরণ করলেন। যখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট আমিরুল মোমেনীনের তোহফা পৌঁছলো তখন তিনি বাহককে জিজ্ঞাসা করলেনঃ সকল উম্মুল মোমেনীনদের নিকটই কি এমনি তোহফা প্রেরিত হয়েছে? বাহক বললো, না শুধু কোরায়শ বংশীয় উম্মুল মোমেনীনদের জন্যে এমনি তোহফা প্রেরিত হয়েছে। যাঁরা কোরায়শ বংশীয় নন তাদেরকে অন্য তোহফা দেয়া হয়েছে। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, তুমি ওমরকে বলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে সমান ব্যবহার করতেন। তাঁর নিজের ব্যাপারেও এবং অর্থ সম্পদের ব্যাপারেও। বাহক হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করলো এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মন্তব্য সম্পর্কে খবর দিল। তখন হযরত ওমর (রাঃ) সবার জন্যে সমান তোহফা প্রেরণ করলেন।[১]

অর্থাৎ একজনের প্রতি সম্পূর্ণ ঝুঁকে যেয়ো না এবং অন্যের প্রতি অত্যাচার করোনা। তথা তোমার যথাসর্বস্ব একজনের কাছে সমর্পণ করে অন্যকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখো না। যদি তুমি নিজে তাকে সুখ শান্তি না দাও এবং তালাক প্রদানের মাধ্যমে অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার সুযোগ না দাও তবে তা ঝুলন্ত অবস্থা হবে, এমনটি করোনা।

وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

যদি তোমরা পরস্পর সংশোধনের পথ অবলম্বন কর, পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা কর এবং ভবিষ্যতে-মনোমালিন্য অবস্থা থেকে আত্মরক্ষা কর-তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব, দয়াবান।

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ

আর যদি পরস্পর ছাড়াছাড়ি পছন্দ করে এবং তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায়, তবে তাতেও দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই কেননা, আল্লাহ পাক প্রত্যেকের প্রয়োজনের আয়োজন করবেন। তাঁর দানে তিনি তাদেরকে ধন্য করবেন। একের নিকট অন্যকে মুখাপেক্ষী রাখবেন না। স্ত্রী পাবে অন্য স্বামী, আর স্বামী পাবে অন্য স্ত্রী।

وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩০০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫ খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯৮

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের রহমত অত্যন্ত প্রশস্ত, তাতে সকলেরই স্থান হয়। কেউ তাঁর রহমত থেকে মাহ্‌রুম হয় না। তবে তিনি বিজ্ঞানময়, তাঁর সমস্ত কর্ম হেকমতপূর্ণ। কার প্রতি কখন দয়া করবেন তা তিনিই ভাল জানেন।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ۝١٣١
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ
تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ
غَنِيًّا حَمِيْدًا ۝١٣١ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى
بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝١٣٢ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ۝١٣٣ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا
فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝١٣٤

তরজমা

(১৩১) এবং নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে তার সত্ত্ব একমাত্র আল্লাহ পাকেরই এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকেও আদেশ করেছিলাম যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল এবং তোমাদেরকেও, যেন তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর এবং যদি তোমরা তাঁর নাফরমানী কর তবে নিশ্চয় জেনে রেখো যে, যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে সবই আল্লাহ পাকের এবং আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি স্বয়ং প্রশংসিত।

(১৩২) এবং আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তার মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই এবং আল্লাহ পাক কার্য নির্বাহক হিসেবে যথেষ্ট।

(১৩৩) হে মানব মণ্ডলী! যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তোমাদেরকে (পৃথিবী থেকে) বিদায় করে দিকে পারেন এবং অন্য জাতিকে আনয়ন করতে পারেন। এবং আল্লাহ তায়ালা তৎপ্রতি সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(১৩৪) যে ব্যক্তি ইহকালে প্রতিদান চায় (তার জানা উচিত যে) আল্লাহ তায়ালার নিকটই রয়েছে ইহকাল ও পরকালের প্রতিদান এবং আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই শ্রবণ করেন এবং প্রত্যক্ষ করেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ কুদরতে তাদের কোন একজনকে অপরের মুখাপেক্ষী রাখবেন না। কেননা তাঁর রহমত বিস্তৃত, অনন্ত অসীম। তাই আলোচ্য আয়াতে বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, আসমান জমিনের মালিক একমাত্র আল্লাহ পাক, তিনি সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং পালনকর্তা। তিনিই সকলের রিয্কদাতা, তিনিই সব কিছুর অধিকর্তা। অতএব, তোমরা শুধু এক আল্লাহর বন্দেগী কর, শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা কর। এ আদেশ ইতিপূর্বে আহলে কিতাব তথা ইহুদী নাসারাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল। এখন (হে উম্মতে মোহাম্মদীয়া) তোমাদেরকে এ আদেশ দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক। কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হও তবে জেনে রাখ যে, তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যেমন হযরত মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সকলে আল্লাহর নাফরমানী কর তবুও তাতে তাঁর কিছু আসবে যাবে না। কেননা, আল্লাহ পাক কারো মোহতাজ নন। আসমান জমিনের মালিকানা একমাত্র তাঁরই। আর তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি স্বয়ং প্রশংসিত।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে এবং তার পরবর্তী আয়াতেও একটি কথাকে তিনবার বলা হয়েছে। কথাটি হলো-

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

অর্থাৎ আসমান জমিনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকের। এরপর আরো দু'বার এই একই কথা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই, আল্লাহ পাক যখন পূর্ববর্তী আয়াতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্পর্কে এ ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ পাক তাদের প্রত্যেককে তাঁর দানে ধন্য করবেন এবং তাঁর দান অনন্ত অসীম। তাই এরশাদ হয়েছেঃ আসমান জমিনের মালিক একমাত্র আল্লাহ পাক।

وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক আনুগত্যকারীর আনুগত্যের প্রয়োজন থেকে পবিত্র। ফলে কারো আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের উচ্চ মর্যাদা এতটুকুও বৃদ্ধি পায় না।

আর কোন পাপীর পাপ ও নাফরমানীর কারণে আল্লাহ্ পাকের শান এবং মর্যাদা এতটুকুও কম হয় না। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ আসমান জমিনের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ পাক। কারো নিকট তিনি আদৌ মুখাপেক্ষী নন। এ সত্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই আলোচ্য বাক্যটিকে বারে বারে উচ্চারণ করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا.....وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا

অর্থাৎ-আল্লাহ্ পাক সর্বশক্তিমান, তিনি সৃষ্টি এবং লয়ের সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। যদি তোমরা তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হও তবে তিনি এক মুহূর্তে তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য সম্প্রদায়কে হাযির করতে পারেন যারা সর্বদা তাঁর বন্দেগীতে মশগুল থাকবে, কখনো তাঁর নাফরমানী করবে না যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ

"হে মোমেনগণ! তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে আল্লাহ পাক তাদের স্থলে এমন নতুন সম্প্রদায় আনয়ন করবেন যাদেরকে আল্লাহ পাক পছন্দ করবেন এবং তারাও আল্লাহ পাককে ভালবাসবে। তারা মোমেনদের সাথে দয়াবান হবে এবং কাফেরদের সাথে হবে অত্যন্ত কঠিন। তারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করবে এবং কোন তিরষ্কারকারীর তিরষ্কারকে ভয় করবে না"।

এতেও একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাক পৃথিবীর যে কোন সম্প্রদায়কে যে কোন সময় পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন এবং অন্যদেরকে তাদের স্থানে আনতে পারেন। এ সত্যটি উপলব্ধি করার লক্ষ্যেই আলোচ্য আয়াতে وَلِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ। বাক্যটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে।

যাহোক, এ আয়াত দ্বারা একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক সর্বশক্তিমান। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। এতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তাদের জন্যে যারা আল্লাহর নাফরমানী করে।

সাঈদ এবনে মনসুর, এবনে জরীর এবং এবনে আবি হাতেম হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর দস্তে মোবারক হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ)-এর পৃষ্ঠে স্থাপন করে বললেনঃ নিশ্চয় সেসব লোক এর তথা সালমান ফার্সীর সম্প্রদায়ভুক্ত হবে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন সূরা জুমআ নাযিল হলো। যখন এ আয়াত

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ

নাযিল হলো তখন আরয করা হলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! যাদের সম্পর্কে এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তারা কারা? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন স্বীয় দস্তে মোবারক হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ)-এর প্রতি স্থাপন করে এরশাদ করলেনঃ যদি ঈমান সুরাইয়া নামক নক্ষত্রেও থাকে (অর্থাৎ দুনিয়ার কোথাও না থাকে) তবুও এর সম্প্রদায়ের কিছু লোক ঈমান হাসিল করবে।

ইমাম তিরমিজীও এ মর্মের হাদীস সংকলন করেছেন যা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ

(যদি তোমরা (আল্লাহর দ্বীন থেকে) বিমুখ হও, তবে আল্লাহ পাক তোমাদের স্থলে অন্য সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন, যারা তোমাদের মত অবাধ্য হবে না) পাঠ করলেন তখন সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! কারা হবে এ সম্প্রদায়ের লোক"? তখন তিনি হযরত সালমান ফার্সীর (রাঃ) উরুর উপর দস্তে মুবারক স্থাপন করে বললেন, "এ ব্যক্তি এবং এর সম্প্রদায়ের কিছু লোক এমন যে যদি দ্বীন ইসলাম সুরাইয়া নামক নক্ষত্রের উপরও থাকে তবে পারস্যের কিছু লোক তা পেয়ে যাবে"।

শায়খ মোহাম্মদ এবনে ইউসুফ সালেহী বর্ণনা করেছেন যে, শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রঃ) বলেছেন, এই হাদীস দ্বারা ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং তাঁর সাথীদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। শায়খ এবনে ইউসুফ (রঃ) বলেছেনঃ আল্লামা সুয়ুতীর (রঃ) একথায় কোন সন্দেহ নেই কেননা, পারস্যে ইমাম আবু হানিফার (রঃ) চেয়ে বড় আলেম কেউ হয়নি, আর তিনি হযরত সালমান ফার্সীর (রঃ) বংশধর।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শুধু এ শুধু ক্ষণস্থায়ী জগতের ধন-সম্পদ এবং এখানকার উন্নতি- অগ্রগতি সমৃদ্ধি কামনা করে, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎ কাজ করে অথবা ক্ষমতা লাভের লোভে বা ধন-সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে জেহাদ করে তারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত কেননা, আল্লাহ পাকের নিকট দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্য রয়েছে। অতএব, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্যের জন্যে দোয়া করা উচিত। যারা শুধু দুনিয়ার এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের উন্নতি কামনা করে এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্যের কথা ভুলে যায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্যেই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক দোয়া শিক্ষা দিয়েছেনঃ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

(হে আল্লাহ! আমাদেরকে কল্যাণ দান কর দুনিয়াতে এবং আখেরাতে।)

বস্তুতঃ যে শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নেক আমল করে যথা জেহাদ করে, সে আখেরাতে লাভ করবে অশেষ সওয়াব এবং দুনিয়াতে সে পাবে মালে গনিমত বা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ
وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا
اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ
وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ
نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ
يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا

তরজমা

(১৩৫) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তায়ালার জন্যে সাক্ষ্যদানকারী ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাতা হও, যদিও তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা মাতা বা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেই হয়। সে ধনী হোক বা দরিদ্র, কেননা আল্লাহ পাকই তাদের জন্যে উত্তম (সাহায্যকারী)। অতএব, সুবিচার কায়েম করতে গিয়ে তোমরা স্বীয় কামনার তাবেদার হয়োনা। আর যদি তোমরা নীরব থাক অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে খবর রাখেন।

(১৩৬) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং সেই কিতাবের প্রতি যা আল্লাহ পাক তাঁর রসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং সেই কিতাবের উপরও যা তিনি ইতিপূর্বে নাযিল করেছেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে ও তাঁর কিতাব সমূহকে অবিশ্বাস করে এবং কেয়ামতের দিনের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করে না সে পথভ্রষ্টতায় অনেক দূরে সরে পড়েছে।

তফসীরুল কোরআন

এবনে আবি হাতেম সুদ্দী (রঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে দু' ব্যক্তি তাদের বিতর্ক নিয়ে হাযির হয়। দু' ব্যক্তির মধ্যে একজন ছিল সম্পদশালী, আরেকজন ছিল দরিদ্র। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র অন্তর দারিদ্র-পীড়িত মানুষের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। কেননা তাঁর ধারণা ছিল যে, এ অসহায় লোকটি সম্পদশালী ব্যক্তির প্রতি জুলুম করতে পারে না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এরশাদ হয়েছেঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা সুবিচার কায়েম করার ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রম কর, অক্লান্ত সাধনা কর এবং সর্বদা সুবিচার কায়েম করতে যত্নবান হও। তাই বিচারকের কর্তব্য হলো, বাদি-বিবাদী উভয়ের সাথে সমান আচরণ করা, একজনকে আরেক জনের উপর প্রাধান্য না দেয়া।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি বিচারক হওয়ার বিপদে পড়েছে তার কর্তব্য হলো বাদি-বিবাদী উভয় পক্ষকে সর্ব বিষয়ে সমান দৃষ্টিতে দেখা, একের উপর অন্যকে কোন প্রকার প্রধান্য না দেয়া। কথা-বার্তায়, ভঙ্গিতে এমনকি স্বরের উচ্চতায়ও কোন প্রকার পার্থক্য না করা।[১]

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৭১

সুবিচার কায়েম করার নির্দেশ

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে ঈমানদারদের আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যে কোন মূল্যে সুবিচার কায়েম কর। সুবিচারের নীতিকে আঁকড়ে ধর, কারো ভয়ে বা কারো মায়ায় বা কোন প্রকার লোভের বশবর্তী হয়ে তোমরা যেন সুবিচারের নীতি পরিত্যাগ না কর। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদাতা হও, কোন স্বার্থ বা লোভে নয়। সুবিচার কায়েম করার ক্ষেত্রে যদি নিজের বিরুদ্ধে বা নিজের পিতা-মাতার বিরুদ্ধে অথবা নিজের আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হয় তাতেও তোমরা কুণ্ঠিত হয়োনা। কারো ধন-সম্পদ অথবা কারো দারিদ্র যেন তোমাদেরকে সত্য সাক্ষ্য দানে বাধা না দেয়। যা সত্য তা তোমরা বল, যা অসত্য তা পরিহার কর। কারো সাথে সম্পর্ক তা বন্ধুত্বের হোক অথবা শত্রুতার– তা যেন সত্য সাক্ষ্য দানে তোমাদেরকে বাধা না দেয়। যে ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়ার কথা সে ধনী হোক বা দরিদ্র আল্লাহ পাকের সাথে তার সম্পর্ক তোমাদের চেয়ে অধিকতর। অতএব, কারো অবস্থার প্রেক্ষিতে অথবা তোমাদের সম্পর্কের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিও না, বরং যে কোন মূল্যে এবং যে কোন অবস্থায় তোমরা সত্য সাক্ষ্য নিশ্চিত কর। ধনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অথবা দরিদ্রের প্রদি দরদী হয়ে সত্য সাক্ষ্য গোপন করার বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের সর্বনাশ। অতএব, কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার অধিকার ইসলাম দেয় না। অতএব, বিচারের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে হবে।

নিতান্ত দ্বিধাহীন চিত্তে সত্যকে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়, মাঝামাঝি পন্থ্য অবলম্বন করাও বৈধ নয়। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে তাগিদ দ করে এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاؕ اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

অর্থাৎ- কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে তোমরা যেন সুবিচার না কর। তোমরা সুবিচার কায়েম করতে থাক। আর তাই হলো পরহেযগারীর নিকটবর্তী।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহা (রাঃ)-কে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খায়বরের অধিবাসীদের ক্ষেত-খামার এবং বাগ-বাগিচা পরিমাপের জন্যে প্রেরণ করেন তখন তারা হযরত আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহা (রাঃ)-কে উৎকোচ দিতে চাইল যেন তিনি তাদের সম্পদকে কম করে দেখান। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর। আল্লাহর শপথ করে বলছি, সারা পৃথিবীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। আর তোমরা

আমার নিকট কুকুর এবং শুকরের চেয়েও নিকৃষ্ট। কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহব্বতের কারণে অথবা তোমাদের শত্রুতার দরুণ আমি সুবিচারের পথ থেকে সরে যাব তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, বরং আমি তোমাদের প্রতি সুবিচার করবো। খায়বরবাসী তাঁর একথা শ্রবণ করে বলতে লাগলো, এ সুবিচারের উপরইতো জমিন ও আসমান সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

আয়াতের মর্মকথা

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর। ইসলামে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ কর। শরীয়তের যাবতীয় বিধানকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ কর এবং ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাক।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এ আয়াতে মোমেনদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ হে মোমেনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর-এর তাৎপর্য হলোঃ

১. তোমরা ঈমানের উপর সুদৃঢ় এবং সুপ্রতিষ্ঠিত থাক।

২. অথবা এর অর্থ হলো, হে মোমেনগণ! যেভাবে তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ, বিশ্বাস স্থাপন করেছ এবং তাঁর বিধান মেনে নিয়েছ ঠিক তেমনি দলিল প্রমাণ দ্বারাও ঈমানের তাৎপর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা কর।

৩. হে মোমেনগণ! ইতিপূর্বে তোমরা সংক্ষিপ্ত দলিল প্রমাণের উপর ভিত্তি করে ঈমান এনেছ, অতএব ঈমান এবং বিশ্বাস স্থাপন কর বিস্তারিত দলিল প্রমাণের আলোকে।

অথবা আয়াতে মোমেনদেরকে সম্বোধন করা হয়নি, বরং সম্বোধন করা হয়েছে আহলে কিতাবকে তথা ইহুদী এবং নাসারাদেরকে। এর অর্থ হলো, তোমরা যারা ঈমান এনেছ মূসা (আঃ) এবং তৌরাতের উপর, আর ঈসা (আঃ) এবং ইঞ্জিলের উপর, তোমরা ঈমান আন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর এবং পবিত্র কোরআনের উপর। অথবা এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মুনাফেকদেরকে। এমন অবস্থায় আয়াতের তাৎপর্য হবে এই, তোমরা যারা মৌখিক ঈমান এনেছ আন্তরিকভাবে ঈমান আন। অথবা এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে সে সব লোকদেরকে যারা সকালে ঈমান আনতো এবং বিকেলে কাফের হতো। এমন অবস্থায় আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এরূপ, তোমরা যারা সকালে ঈমান আন বিকেলে কাফের হও, তোমরা সঠিকভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে ঈমান আন।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৬, পারা-৫, পৃষ্ঠা-১০২
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩০৫

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্ পাকের প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি।

ঈমান বা বিশ্বাসের তাৎপর্য হলো, মোমেন বা বিশ্বাসী ব্যক্তি এ সত্য উপলব্ধি করে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্বই হলো প্রকৃত এবং খাঁটি। আর তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা এবং লাভ-ক্ষতির নিয়ামক একমাত্র তিনিই। এতদ্ব্যতীত কোন কিছুর মধ্যেই প্রকৃত গুণ বা সৌন্দর্য নেই। সমগ্র সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য একমাত্র আল্লাহ পাকেরই দান। আল্লাহ্ পাকের দান ব্যতীত কারো কাছে কিছুই নেই। এমনিভাবে যখন কোন মানুষ আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে তখন আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কোন কিছুর সাথে তার আন্তরিক সম্পর্ক ও মহব্বত থাকে না, থাকতে পারে না। যখন এভাবে আল্লাহ্ পাকের মহব্বত ও ভালবাসা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলা শুধু যে সহজ হয় তাই নয়, বরং তা মানুষের মজ্জাগত হয়ে যায়। আর এর ফলশ্রুতি হলো যদি এমন কোন মানুষকে আল্লাহর নাফরমানী করতে বলা হয় তবে সে কোন অবস্থাতেই রাজি হয় না। এমনকি যদি তাকে পরিণামে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে হয় তাতেও সে রাজি হয় কিন্তু আল্লাহর নাফরমানী করতে সে রাজি হয় না। বস্তুতঃ এ হলো প্রকৃত মোমেনের স্বরূপ এবং ঈমানের পরিপূর্ণতা ও সঠিক তাৎপর্য।

আল্লামা বগবী (রঃ) আবুল আ'লিয়াসহ অন্যান তত্ত্বজ্ঞানীগণের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে মোমেনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ হলো, হে মোমেনগণ! তোমরা ঈমানের উপর সুদৃঢ় ভাবে কায়েম থাক।

যাহ্যাক (রঃ)-এর মতে, এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে ইহুদী ও নাসারাদেরকে। এর অর্থ হলো, তোমরা যারা মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছ তোমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিও ঈমান আন। আল্লামা বগবী (রঃ) কালবীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ), আ'মাদ এবনে কা'ব (রাঃ), উসাইদ এবনে কা'ব (রাঃ) সায়ালাবা এবনে কায়েস (রাঃ)। আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ)-এর ভাগিনেয় সালাম (রাঃ) এবং তাঁর ভ্রাতঃষ্পুত্র সালমা (রাঃ) এবং ইয়ামীন এবনে ইয়ামীন সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করেছিলেন, আমাদের ঈমান আপনার প্রতি, আপনার কিতাবের প্রতি রয়েছে এবং মূসা (আঃ), তৌরাত এবং ওজায়ের (আঃ)-এর প্রতিও রয়েছে। এতদ্ব্যতীত, আমরা কোন কিতাব বা কোন পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস করি না।

তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

অর্থাৎ-তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর সেই কিতাবের প্রতি যা আল্লাহ পাক তাঁর রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন। তথা পবিত্র কোরআনের প্রতি এবং সেই কিতাবের প্রতিও যা আল্লাহ পাক ইতিপূর্বে নাযিল করেছেন তৌরাত, যবুর, ইঞ্জিল এবং অন্যান্য সহীফা সমূহ।

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ.... فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا

অর্থাৎ যে আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি এবং তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি এবং কেয়ামতের প্রতি ঈমান না আনে সে পথভ্রষ্টতায় বহুদূর সরে পড়েছে। অর্থাৎ হেদায়েতের পথ থেকে সে এত দূরে সরে পড়েছে যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন কোন আশা নেই। কেননা উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন একান্ত করণীয় কাজ। যদি এর কোন একটি বিষয়ের প্রতি ঈমান না থাকে তবে তা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। অর্থাৎ উল্লেখিত প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস অবশ্যই স্থাপন করতে হবে। এর একটি বিষয়কে অস্বীকার করলেও কোন মানুষ মুসলমান থাকে না। এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের অস্তিত্বকে অস্বীকার করলে যেমন কাফের হতে হয় ঠিক তেমনি তাঁর কোন সিফাতকে অস্বীকার করলেও কাফের হতে হয়। এমনিভাবে আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করলেও কাফের হতে হয়। আর পয়গম্বরগণকে অস্বীকার করলেও কাফের হতে হয়, আর একথাই ঘোষণা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতের সর্বশেষ বাক্য দ্বারা।

فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا

অর্থাৎ- তারা শুধু যে পথভ্রষ্ট হয়েছে তাই নয়, বরং পথভ্রষ্টতায় এতদূরে সরে পড়েছে যে, সেখান থেকে হেদায়েতের দিকে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই।[১]

১। তফসীরে মাজেদী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২২১

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ
آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ
وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾

তরজমা

(১৩৭) নিশ্চয় যারা ঈমান আনয়ন করেছে, পরে অবিশ্বাস করেছে অতঃপর পুনরায় ঈমান আনয়ন করেছে, আবার অবিশ্বাস করেছে, সে অবিশ্বাসই বৃদ্ধি পেয়েছে আল্লাহ পাক কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে সৎ পথ প্রদর্শন করবেন না।

(১৩৮) (হে রসূল!) মুনাফেকদেরকে আপনি জানিয়ে দিন যে, তাদের জন্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

(১৩৯) (সেই মুনাফেক দল) যারা মোমেনদেরকে ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, এ মুনাফেকরা কি কাফেরদের নিকট সম্মান চায়? তবে সমস্ত সম্মানই একমাত্র আল্লাহ পাকের।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান ছিল। আর বর্তমান আয়াতে যারা কাফের হয় এবং পুনরায় ঈমান আনে, পরে আবার কাফের হয় তাদের অবস্থা এবং ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ নিশ্চয় যারা মুসলমান হয়, পুনরায় কাফের হয়, আবার মুসলমান হয়, এরপর পুনরায় কাফের হয়, এরপর তাদের কুফর ও নাফরমানী বৃদ্ধি পেতে থাকে, আল্লাহ পাক তাদেরকে কখনও মাফ করবেন না।

ইমাম কাতাদা (রাঃ) বলেন, এ আয়াত ইহুদীদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। কেননা, তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল। এরপর গো-বৎসের

পূজা করে কাফের হয়েছিল। এরপর তওবা করে তৌরাতের প্রতি ঈমান এনেছিল, এরপর আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ)-কে অস্বীকার করে, এরপর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে কুফরী ও নাফরমানী বৃদ্ধি করেছে। মূলতঃ তাদের অন্তর কুফরে ভরা। অবশেষে কাফের ও বেঈমান অবস্থাতেই তাদের মৃত্যু হয়। অতএব, এ কাফেরদের মাগফেরাত বা নাজাত লাভের কোন পথ নেই।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ এ আয়াতের উদ্দেশ্য শুধু ইহুদী নয়, বরং সমস্ত আহলে কিতাব যারা নিজেদের পয়গম্বরগণের প্রতি বিশ্বাসের পর কাফের হয়েছে এবং সেই নবীর প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাকে সত্য কিতাব হিসেবে মেনে নেয়ার পর তা অমান্য করেছে। এরপর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের অস্বীকৃতির মাধ্যমে তারা কুফর ও নাফরমানীকে বৃদ্ধি করেছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে মুরতাদদেরকে যারা ঈমান আনয়নের পর কাফের হয়েছে তথা ধর্ম ত্যাগ করেছে। এরপর পুনরায় মুসলমান হয়েছে কিন্তু মুরতাদ হয়েছে। এরপরও আবার মুসলমান হয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের যে তারা এরপরও ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, এমন লোকদের তওবা কবুল হবে না কেননা, আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করেছেনঃ

لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ

"আল্লাহ পাক কোন অবস্থাতেই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না"।[১]

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ মূলত এ ঘোষণা হলো মুনাফেকদের উদ্দেশ্যে। শেখ ইসমাঈল হক্কী তাঁর তফসীরে রুহুল বয়ানে এ আয়াতের তফসীর এভাবে করেছেন।

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে অর্থাৎ সেই ইহুদীরা যারা মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল, এরপর গো-বৎসের পূজার মাধ্যমে কাফের হয়েছে, এরপর পুনরায় ঈমান এনেছে। এরপর আবার কাফের হয়েছে ঈসা (আঃ) এবং ইঞ্জিলকে অস্বীকার করার মাধ্যমে। এরপর তাদের কুফরী নাফরমানী বৃদ্ধি পেয়েছে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করার মাধ্যমে, আর এভাবে তাদের কুফর বৃদ্ধি পেয়েছে।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩০৯
২। তফসীরে রুহুল বয়ান খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০৪

যাদের এ অবস্থা আল্লাহ পাক তাদেরকে কোন অবস্থাতেই মাফ করবেন না, তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফের অবস্থায় থাকবে তাদের শাস্তি অবধারিত এবং তাদের ক্ষমা-প্রাপ্তির কোন আশা নেই। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো এদের থেকে আল্লাহর নাফরমানী কোন সময়ই ছুটবে না। আর কুফর ও নাফরমানীর কারণে তাদের অন্তর সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। তাই ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের অন্তরের আলো বিদায় নিয়েছে। তাই তারা সত্যকে গ্রহণ করতে অক্ষম।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে মুরতাদদের ধর্ম (ধর্ম ত্যাগীদের) সম্পর্কে কেননা, এর পরবর্তী আয়াতে মুনাফেকদের সম্পর্কে শাস্তির ঘোষণা রয়েছে–

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

"(হে রসূল!) মুনাফেকদের এ সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এখানে মুনাফেকদের অর্থ হলো সেসব লোক যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে তাঁর সম্মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করতো, আর যখন তাদের নিজেদের লোকদের সঙ্গে একত্রিত হতো তখন কুফরের কথা প্রকাশ করতো। মুনাফেকী তথা দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করতো। আর দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হতো। আর এভাবে তাদের নাফরমানী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতো।

الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

যাদের অবস্থা এই যে, তারা মোমেনদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো তথা ইহুদীদেরকে তারা একান্ত আপন মনে করতো এবং তাদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতো। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক একটি প্রশ্ন করেছেনঃ

اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ

তবে কি তারা কাফেরদের নিকট সম্মানিত হতে চায়? অর্থাৎ তারা কি কাফেরদের সাহায্য এবং বন্ধুত্ব লাভ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে সম্মান এবং শক্তির অধিকারী হতে চায়? কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই যে, তাদের এ আশা কোন দিন পূর্ণ হবে না। কেননা, সর্ব ইজ্জতই আল্লাহ পাকের হাতে, তাঁর

নিয়ন্ত্রণাধীনে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا

অর্থাৎ ইজ্জত বলতে যা কিছু রয়েছে তা শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে, তিনি যাকে ইজ্জত বা সম্মান দান করেন সে-ই সম্মানিত হয় আর তিনি যাকে অপমানিত করেন সে-ই অপমানিত হয়। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাকের ঘোষণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিনি ঘোষণা করেছেনঃ

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

ইজ্জত আল্লাহ পাকের জন্যে এবং তাঁর রসূলের জন্যে এবং মোমেনদের জন্যে। অতএব, মুনাফেকদের অপমান অবধারিত এবং তাদের পরিণাম ভয়াবহ।

وَقَدْ نَزَّلَ
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ
بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهٖٓ ۖ إِنَّكُمْ
إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِينَ وَالْكٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ
جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ
قَالُوٓا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِينَ نَصِيبٌ ۙ قَالُوٓا أَلَمْ
نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

তরজমা

(১৪০) এবং নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাবে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি তোমরা শুনতে পাও যে, আল্লাহর আয়াতের অস্বীকার বা উপহাস হচ্ছে তবে যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় মশগুল হয় সে পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে উপবিষ্ট হয়োনা। অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক মুনাফেক ও কাফেরদেরকে দোযখে একত্রিত করবেন।

(১৪১) (মুনাফেকরা এমন যে) তারা এর অপেক্ষায় থাকে যেন তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হয়। যখন আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে তোমাদের জয়লাভ হয় তখন তারা বলে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? আর যদি ভাগ্য কাফেরদের অনুকূল হয় তবে তারা বলে আমরা কি তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি? এবং আমরা কি তোমাদেকে মোমেনদের হাত থেকে রক্ষা করিনি? আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার করবেন এবং কাফেরদের জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা মোমেনদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখেননি।

তফসীরুল কোরআন

তফসীরকারগণ বলেছেন যে, মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় কাফের মুশরেকরা তাদের মজলিসে পবিত্র কোরআনের আলোচনা করতো এবং বিদ্রুপ করতো। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেছেনঃ

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ

অর্থাৎ "(হে রসূল!) যখন আপনি দেখেন যে, কাফেররা আমার আয়াত সমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে তখন আপনি তাদের থেকে বিমুখ হোন, যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় মশগুল হয়"।

এ আয়াত নাযিল হয় মক্কায়ে মোয়াজ্জমায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মোনাওয়্যারায় হিযরত করলেন তখন ইহুদীরা মুশরেকদের মত পবিত্র কোরআন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সমালোচনা করতো এবং বিদ্রুপ করতো আর তাদের সঙ্গে বসতো মুনাফেকরা এবং তারাও ইসলামের সমালোচনায় অংশ গ্রহণ করতো এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি বিদ্রুপ করতো। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এতে মুসলমানদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, কাফের বা মুনাফেকরা যখন পবিত্র কোরআনের প্রতি বিদ্রুপ করে অথবা ইসলামের কোন বিধি-নিষেধের সমালোচনা করে, হে মোমেনগণ! তোমরা তখন তাদের সঙ্গে উপবিষ্ট হয়োনা। যদি তোমরা তাদের সঙ্গে থাক তবে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। যখন তারা ঐ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য কথায় আসবে তখন তোমরা প্রয়োজনবোধে তাদের সঙ্গে বসতে পার। আর নিঃপ্রয়োজনে তাদের সঙ্গে বসা মকরূহ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত হাসান (রঃ)-এর মতে, যদি তারা বিদ্রুপ পরিত্যাগ করে অন্য কথায় মশগুল হয় তবুও তাদের সঙ্গে বসা বৈধ

নয়। এ আয়াতে সূরা আনয়ামের সে আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা মক্কায় নাযিল হয়েছিল ঃ

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا

যাহ্যাক হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত যত লোক বেদআত করবে তথা যা ধর্মীয় কাজ নয় তাকে ধর্মীয় কাজ মনে করবে সকলেই এ আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ

অর্থাৎ হে মুসলমাগণ! যারা কাফের মুনাফেক, যারা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে, যারা পবিত্র কোরআনের প্রতি বিদ্রুপ করে তারা যখন দ্বীন ইসলামের প্রতি বিদ্রুপ করে তোমরা যদি সে অবস্থায় তাদের সঙ্গে বস এবং ঐ বিষয়ের প্রতি রাযী থাক তবে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। যদি তোমরা মুখে কুফরী বাক্য উচ্চারণ না কর এবং অন্তরে কুফরী কার্যে রাযী থাক তবে তোমরা মুনাফেক হবে। আর কাফের ও মুনাফেকদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। যেমন পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মুনাফেক ও কাফেরদের সকলকে দোযখে একত্রিত করবেন অর্থাৎ যারা কাফেরদের সঙ্গে বসে তাদের কুফরী এবং বিদ্রুপের উপর রাযী থাকে এবং যারা পবিত্র কোরআনের প্রতিও বিদ্রুপ করে এমন সব লোকদেরকে আল্লাহ্ পাক দোযখে একত্রিত করবেন, যেভাবে তারা দুনিয়াতে একত্রিত থাকতো।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে একখানি হাদীসের উল্লেখ করেছেন, যে আসরে বসে মদ্যপান করা হয় তাতে এমন কোন ব্যক্তির উপবিষ্ট হওয়া উচিত নয় যে আল্লাহর প্রতি এবং কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করে। তাই এমন আসর বা মজলিস থেকে মোমেন মাত্রের দূরে থাকা যেমন কর্তব্য ঠিক তেমনি যে মজলিসে পবিত্র কোরআনের উপর বিদ্রুপ করা হয় সে মজলিসে মুসলমানদের শরীক হওয়া বৈধ নয়।

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ

এ আয়াতে মুনাফেকদের দ্বিমুখী নীতি এবং তাদের কুকীর্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা সর্বদা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে এবং অবনতির প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে

এবং সর্বদা মুসলমানদের অবস্থা জানারও চেষ্টা করে। তাদের সুবিধাবাদী নীতিই তাদের অশুভ পরিণামের কারণ হয়ে থাকে, তারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে খড়গহস্ত থাকে। যদি তারা দেখে যে, মুসলমানদের জয় হয়েছে তবে তারা বলে আমরা কি তোমাদের সঙ্গে নেই? আমরাও মুসলমান। অতএব, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদে আমাদের অংশ অবশ্যই থাকবে।

কিন্তু যদি কাফেরদের বিজয় লক্ষ্য কর তখন তাদের নিকট দ্রুত গমন করে এবং বলে, তোমাদের এ বিজয়ের মূল কারণ তো আমরা। আমরা কি অকেজো হয়ে বসেছিলাম? আমরা যে মুসলমানদেরকে তোমাদের থেকে দূরে রেখেছিলাম। অতএব, তোমাদের যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদে আমাদেরও হক্ব রয়েছে। কেননা, আমরা তোমাদেরকে মুসলমানদের সম্পর্কে জরুরী তথ্য সরবরাহ করেছি এবং তাদের সম্পর্কে অনেক কথা জানিয়ে দিয়েছি। ফলে তোমরা প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হয়েছ।

فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকই কেয়ামতের দিন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কে কি এবং কার কি সুবিধা অসুবিধা ছিল সে সম্পর্কে সকল বিষয় কেয়ামতের দিনই প্রকাশ পাবে। যারা মোমেন তারা বেহেশত লাভ করবে, কিন্তু যারা কাফের বা মুনাফেক তাদেরকে অবশ্যই দোযখের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। আর আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে দেবেন না।

হযরত আলী (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন, এর অর্থ হলো আখেরাতে অর্থাৎ মোমেনদের মোকাবেলায় কাফেরদেরকে কেয়ামতের দিন প্রভাবশালী করবেন না। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো সাহাবায়ে কেরামের উপর কাফেরদেরকে বিজয়ী হতে দেবেন না। আর বর্তমান যুগে যে কাফেরদের বিজয় এবং প্রাধান্য বিস্তার হচ্ছে তা শুধু মুসলমানদের ঈমান ও আকিদার দুর্বলতার কারণে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানী দরুণ, অতএব আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ পাক প্রকৃত মোমেনদের উপর কাফেরদেরকে প্রাধান্য দেবেন না। তবে দুর্বল ঈমানের অধিকারী মুসলমানদের ব্যাপারে আলোচ্য আয়াতে কোন অঙ্গীকার নেই। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে سَبِيْلًا শব্দটির কারণে এ অর্থ হবে যে, আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে এমন পথ দেখাবেন না যদ্বারা তারা মুসলমানদের মূলোৎপাটন করতে পারে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১২

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوْٓا
إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ
إِلَّا قَلِيْلًا ۝ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلٰى
هٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ
أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

তরজমা

(১৪২) নিশ্চয় মুনাফেকরা ধোকাবাজী করছে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে আর আল্লাহ্ তায়ালা এ ধোকাবাজী তাদের উপরই ফেলবেন (অর্থাৎ এর শোচনীয় পরিণাম তাদেরকে ভোগ করতে হবে) এবং যখন তারা নামাজে দাঁড়ায় তখন অত্যন্ত অলসতার সঙ্গে শুধু লোক দেখানোর জন্যে দাঁড়ায়। আর তাদের অতি অল্প সংখ্যক লোকই আল্লাহ্ পাককে স্মরণ করে।

(১৪৩) তারা দোদুল্যমান রয়েছে, তারা এদিকেরও নয় সেদিকেরও নয়। যাকে আল্লাহ পাক গোমরাহ করেছেন (হে রসূল!) আপনি তার জন্যে কোন পথই পাবেন না।

(১৪৪) হে মোমেনগণ! তোমরা মোমেনদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে কখনও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা, তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ পাকের সুস্পষ্ট দলিল তোমাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হোক?

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ পাক মুনাফেকদের ধোকাবাজি ও ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছেঃ মুনাফেকরা প্রকাশ্যে ইসলামের কথা স্বীকার করলেও তাদের অন্তর কুফর ও নাফরমানীতে পরিপূর্ণ। তাদের দ্বিমুখী নীতি দ্বারা আল্লাহ্ পাককে ধোকা দিতে চায় অথচ আল্লাহ পাক তাদেরকে এ ধোকাবাজির শাস্তি দেবেন। যাঁর কাছে পৃথিবীর কোন কিছুই গোপন নেই এমনকি, মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠের কথাও যাঁর নিকট গোপন থাকে না তাঁকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

মুনাফেকরা মনে করেছে যেভাবে দুনিয়াতে তারা মানুষকে ধোকা দেয় কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাককেও তারা সেভাবে ধোকা দিতে পারবে। যেভাবে তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হয়ে নিজেদের ঈমানের কথা প্রকাশ করে অথচ অন্তরে থাকে কুফর ও নাফরমানী। তারই জবাবে আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وَهُوَ خَادِعُهُمْ

মুনাফেকদের শাস্তির কথা

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ধোকাবাজির শাস্তি দেবেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেনঃ আল্লাহ্ পাক আখেরাতে মুনাফেকদের ধোকাবাজির শাস্তি দেবেন আর সে শাস্তির বিবরণ এই যে. তাদেরকে মোমেনদের ন্যায় নূর প্রদান করা হবে, যখন তারা পুলসেরাত পর্যন্ত পৌছবে তখন তাদের নূর নিভিয়ে দেয়া হবে, ফলে তারা অন্ধকারে পড়ে থাকবে।[১]

وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوا كُسَالٰى

অর্থাৎ মুনাফেকদের আরেকটি ধোকাবাজি হল এই যে, তারা নামাজের ন্যায় এত গুরুত্বপূর্ণ এবাদতের ব্যাপারেও গাফলত এবং অসসতা করে, নামাজেও তারা ফাঁকি দিতে চায়, নিতান্ত দায়ে পড়ে যদি কখনও নামাজে দাঁড়ায় তবে নামাজে তাদের মন থাকে না, তারা শুধু মুসলমানদের প্রতারণা করতেই নামাজে দাঁড়ায় যেন অন্য মানুষ তাদেরকে মুসলমান ভাবে– শুধু এ উদ্দেশ্যেই তারা নামাজে দাঁড়ায়। ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, যেহেতু তারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে না এবং যেহেতু নামাজের দ্বারা তারা কোন সওয়াবের আশা করেনা এবং নামাজ আদায় না করলে আযাব হবে এ ভয়ও করেনা এবং তাদের নামাজে হাযির হবার একমাত্র কারণ মানুষের ভয়। তাই তারা নামাজের ব্যাপারে অলসতা এবং কুঁড়েমি করে। তারা আল্লাহকে স্মরণও করে না, তাঁকে ভয় করে না। তাদের যা কিছু কর্মকাণ্ড তা শুধু লোক দেখানোর জন্যে, তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيلًا

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৮৩

অর্থাৎ তারা নামাজ বা অন্য এবাদত যা কিছু করে তা শুধু লোক দেখানোর জন্যে করে- আল্লাহ্‌র জন্যে তারা নামাজে দাঁড়ায় না, দাঁড়ায় শুধু মানুষকে দেখাতে, আর তারা আল্লাহকে স্মরণও করেনা। যদি স্মরণ করেও তবে তা অতি সামান্য।

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য আয়াতে "যিকরুল্লাহ" শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর অর্থ হল নামাজ। এমনি অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে তারা খুব সামান্যই নামাজ আদায় করে কেননা, যখন অন্য কেউ তাদের সঙ্গে থাকেনা তখন তারা নামাজ আদায় করে না। যখন তারা অন্য মানুষের সঙ্গে থাকে তখন নামাজে হাজির হয় যাতে করে মানুষকে প্রতারণা করা যায়। এ আয়াতে যিকরুল্লাহ'র দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল এই, তারা নামাজে আল্লাহ পাককে অতি সামান্যই স্মরণ করে, নামাজে যে সব কাজ প্রকাশ্যে করতে হয় যেমন বিভিন্ন অবস্থায় তকবীর দেয়া তা তারা প্রকাশ্যেই দেয়। কিন্তু যে সব কাজ গোপনে করণীয় যেমন ক্ষেত্রেবিশেষ সূরা এবং তসবীহ পাঠ, তা তারা করতো না। আলোচ্য আয়াতে যিকরুল্লাহ'র তৃতীয় অর্থ হলো, তারা আল্লাহকে স্মরণ করতো না, সব সময়ই এ অবস্থা ছিল, নামাজের সময় হোক বা না হোক। এ পর্যায়ে চতুর্থ কথা বলেছেন ইমাম কাতাদা (রঃ)। তিনি বলেছেন, যেহেতু আল্লাহ পাক মুনাফেকদের কোন এবাদত কবুল করেন না তাই তাদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ তারা অতি সামান্যই আল্লাহকে স্মরণ করে। যদি আল্লাহ পাক কবুল করতেন তবে সামান্য যিকরও অনেক বেশী মনে হতো। তাদের অবস্থার আরেকটি প্রতিচ্ছবি রয়েছে পরবর্তী বাক্যে-

مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ

অর্থাৎ মুনাফেকরা ঘরেরও না, ঘাটেরও না। তাদের একুলও নেই, অকুলও নেই। যখন মুসলমানদের সঙ্গে থাকে তখন নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে, আর যখন কাফেরদের সঙ্গে একত্রিত হয় তখন নিজেদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলেই দাবী করে অর্থাৎ তারা মুনাফেকীর কারণে প্রকৃত মুসলমান হতে পারেনা, আবার কাফেরদের সঙ্গেও সঠিকভাবে থাকতে পারেনা। তারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করে স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায় এবং কাফেরদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে আত্মসম্মান লাভে প্রয়াসী হয়। ঈমান ও কুফরের মধ্যে তারা হাবুডুবু খেতে থাকে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এবনে আবি হাতেমের উদ্ধৃতি দিয়ে মোমেন, কাফের এবং মুনাফেকদের একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। তিন ব্যক্তি একটি নদীর তীরে উপস্থিত হয়েছে, একজন নদীর তীরেই দাড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি নদীতে নেমেছে এবং নদী পার হয়ে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে গেছে। তৃতীয় ব্যক্তি নদীতে নেমেছে, যখন সে নদীর মধ্যস্থলে পৌঁছে তখন তীরে দাড়ানো ব্যক্তি তাকে

ডাকে যে, কেন ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছ, আমার কাছে ফিরে আস। অন্যদিকে যে পার হয়ে গেছে সে ডাকে আমার মত নদী পেরিয়ে চলে আস। এখন এ ব্যক্তি কিছুক্ষণ এপারের দিকে দৃষ্টিপাত করে আর কিছুক্ষণ ওপারের দিকে। সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না কোন্ দিকে যাবে। ঐ মুহূর্তে একটি প্রলয়ংকরী ঝড় আসে, নদীর পানির ঢেউ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অজানা গন্তব্যের পানে। এভাবে তার জীবনাবসান ঘটে মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধানের মাধ্যমে। যে ব্যক্তি নদী পার হয়ে গেল সে মুসলমান, আর যে নদীর তীরেই দাড়িয়ে রইল সে কাফের, আর যার সলিল সমাধি হল নদীর মাঝখানে সে মুনাফেক।[১]

বস্তুতঃ যাকে আল্লাহ পাক হেদায়েতের তওফিক দান করেন শুধু সে-ই হেদায়েত লাভ করে। পক্ষান্তরে, যাকে আল্লাহ্ পাক হেদায়েত থেকে বঞ্চিত করেন তার দুর্ভাগ্য অবধারিত। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا

অর্থাৎ যাকে আল্লাহ পাক পথভ্রষ্ট করেন (হে রসূল!) আপনি তার জন্যে হেদায়েতের কোন পথ পাবেন না। এ আয়াতে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে। কেননা, তিনি মানুষের হেদায়েতের জন্যে অত্যন্ত উদগ্রীব থাকতেন। আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় এ আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ যারা— তাদের অন্যায় আচরণের কারণে এবং দ্বিমুখী নীতির দরুণ পথভ্রষ্ট হয়েছে, আল্লাহর কোপগ্রস্ত হয়েছে এদেরকে হেদায়েত করার কোন পথ পাওয়া যাবে না। এ আয়াতে মুনাফেকদের কয়েকটি চিহ্ন বর্ণিত হয়েছে (১) তারা আল্লাহ পাক এবং রসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ধোকা দিতে চায় (২) নামাজের ব্যাপারে গাফলত করে (৩) আল্লাহর জিকর করে না এবং (৪) যা কিছু সৎ কাজ করে তা শুধু লোক দেখানোর জন্যেই করে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে কোন কিছু করেনা। (৫) হক্ব ও বাতিলের মধ্যখানে দণ্ডায়মান থাকে, ক্ষণিকের জন্যে হক্বের প্রতি আকৃষ্ট হয় কিন্তু পরবর্তীতে বাতিলের দিকে হয় ধাবমান। এজন্যেই তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, মোমেনদের তিনটি আশ্রয়স্থল রয়েছে (১) মসজিদ (২) আল্লাহ্র জিকর (৩) তেলাওয়াত কোরআন। যে কোন ব্যক্তি শয়তানের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষা করতে প্রয়াসী হয় তাকে অবশ্যই উপরোক্ত আশ্রয়-স্থল সমূহে আশ্রয় নিতে হবে। এতদ্ব্যতীত নাজাত লাভের কোন পন্থা নেই।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ

১। তফসীর এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫ খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০৬-০৭

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কে

যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফেকদের অন্যায় আচরণের কথা বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামেও তাদের বিশ্বাস ভক্তি নেই এবং কুফরেও তাদের পূর্ণ সান্ত্বনা নেই। দোটানায় পড়ে তাদের জীবন হয়েছে দুর্বিষহ। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেনঃ

হে মোমেনগণ! তোমরা কাফেরদের সঙ্গে কোন অবস্থাতেই বন্ধুত্ব করোনা, বন্ধুত্ব শুধু মোমেনের সঙ্গেই করতে হবে। আরো কঠোর ভাষায় আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তোমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র প্রকাশ্য অভিযোগ গ্রহণ করতে চাও?

ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ তফসীরে কবীরে এ আয়াতে শানে নুযুল সম্পর্কে লিখেছেন, যেহেতু মদীনা শরীফের আনসারদের সঙ্গে বনী কোরায়জা গোত্রের একটা সম্পর্ক ছিল যাকে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বলা যেতে পারে, তাই আনসারী সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করব? তখন তিনি এরশাদ করলেন মোহাজেরীনদের সঙ্গে।[১]

أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا

অর্থাৎ যদি তোমরা কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর তবে তা তোমাদের মুনাফেক হবার প্রমাণ হবে, অতএব কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রেখে তোমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ পাকের প্রকাশ্য অভিযোগ গ্রহণ করতে চাও? যা কোন অবস্থাতেই উচিত নয়। আল্লামা আলুসী (রঃ) তাঁর তফসীরে রুহুল মাআনীতে এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাক কোন ব্যক্তিকে তাঁর হেকমত ও গায়বী এলমের ভিত্তিতে শাস্তি দেবেন না যে পর্যন্ত না অপরাধী ব্যক্তির ব্যাপারে দলিল প্রমাণ উপস্থাপিত হয়।

অতএব, মোমেনদের কর্তব্য হল কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করা (আল্লাহ পাক তওফিক দান করুন)[২]।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৮৬
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৭৭

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ
فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا الَّذِيْنَ
تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللهِ وَأَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ
مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٤٦﴾ مَا
يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿١٤٧﴾

তরজমা

(১৪৫) নিশ্চয় মুনাফেকরা দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে বাস করবে এবং (হে রসূল!) আপনি তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী পাবেন না।

(১৪৬) কিন্তু যারা তওবা করে এবং আত্মসংশোধন করে আল্লাহ্ পাককে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাদের দ্বীনে একনিষ্ঠ থাকে, বস্তুতঃ তারাই হবে মোমেনদের সাথী। আল্লাহ্ পাক মোমেনদেরকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবেন।

(১৪৭) যদি তোমরা আল্লাহ্ পাকের নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর তবে তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহ্ পাকের কি লাভ? এবং আল্লাহ্ পাক পুরস্কার দাতা ও মহাজ্ঞানী।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মুনাফেকদের ভয়াবহ পরিণামের কথা ঘোষণা করেছেন। দোযখের গহীন সর্বনিম্ন স্তরে মুনাফেকরা বাস করবে।

মুনাফেকদের শাস্তির বিবরণ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন, দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে লৌহ নির্মিত সিন্দুক থাকবে। তার মধ্যে মুনাফেকদের বন্দী করে হবে। আল্লামা বগবী (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, মুনাফেকদেরকে সিন্দুকের মধ্যে বন্দী রাখা হবে। তাদের উপর নীচে জ্বলন্ত অঙ্গার থাকবে। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, লৌহ সিন্দুকগুলো অগ্নিতে পরিণত হয়ে যাবে,

যা চতুর্দিক থেকে বন্ধ থাকবে, কেউ তাদের জন্যে সাহায্যকারী থাকবে না যে, তাদেরকে উদ্ধার করবে অথবা তাদের শাস্তি লাঘব করবে।

এবনে ওহাব (রঃ) কা'বে আহবার (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, দোযখে একটি বন্ধ কূপ রয়েছে যা বন্ধ করার পর আর উন্মুক্ত করা হয়নি। স্বয়ং দোযখই ঐ কূপের তাপ থেকে আল্লাহ পাকের নিকট প্রত্যহ আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর তা-ই হলো "দরকে আসফাল" বা দোযখের সর্বনিম্ন স্তর। মুনাফেকদের এজন্যে দোযখের সর্ব নিম্ন স্তরের জন্যে মনোনীত করা হয়েছে যে, তারা কাফেরদের চেয়েও জঘন্য, কেননা তারা শুধু যে কাফের তাই নয়, বরং আল্লাহ পাক, তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং ইসলামের প্রতি তারা বিদ্রূপ করতো এবং মুসলমানদেরকে প্রতারণা করতো। অন্য একটি কারণ এই, তারা কাফের হওয়া সত্ত্বেও হত্যা এবং জিযিয়া (কাফেরদের কর) থেকে বাঁচতো। কেননা তারা প্রকাশ্যে মুসলমান হওয়ার দাবী করতো, অথচ তারা ছিল কাফের। তাই তাদের জন্যে এ কঠিন কঠোর শাস্তি।[১]

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا

কিন্তু যারা মুনাফেকী থেকে তওবা করে এবং আত্ম সংশোধন করে আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করে সুদৃঢ়ভাবে আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে এবং শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে দ্বীন ইসলামের উপর আমল করে, লোক দেখাতে নয় এবং দুনিয়ার কোন কিছুর লোভ ও লাভের জন্যেও নয়, বরং শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে সৎ কাজ করে তাদের হাশর হবে মোমেনদের সঙ্গে। তারা জান্নাতে মোমেনদের সঙ্গেই থাকবে, যারা ঈমান এবং এখলাসের কারণে পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ইমাম আহমদ (রঃ) এবং হযরত এবনে আবি শায়বা (রঃ) হযরত আবু সোমামা (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গী হাওয়ারীগণ হযরত ঈসা (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর জন্যে আমল করে তার পরিচয় কি? তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর জন্যে আমল করে সে উক্ত আমলের জন্যে মানুষের প্রশংসাকে পছন্দ করে না।

হযরত যায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি এখলাসের সঙ্গে তথা পূর্ণ

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩৪
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৫ খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০৮

আন্তরিকতার সঙ্গে কলেমায়ে তাইয়েবা (লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্) পাঠ করলো সে বেহেশতে প্রবেশ করলো। তখন আরয করা হলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! কলেমা পাঠের মধ্যে এখলাস কি? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ এ কলেমা যেন ইসলামের নিষিদ্ধ কাজ থেকে পাঠককে বিরত রাখ।

হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমাকে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন আমি তখন আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু হেদায়েত করুন। তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি দ্বীনকে শুধু আল্লাহ্র জন্যে খালেস কর তথা শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে দ্বীনের কাজ কর। বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে হযরত সওবান (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একথা শুনেছি। তিনি এরশাদ করেছেনঃ ইসলামের জন্যে যারা মোখলেছ তথা যারা আন্তরিকভাবে ইসলামের ওপর আমল করবে তাদের জন্যে খোশ খবরী, তারাই হল হেদায়েতের প্রদীপ, সর্বপ্রকার ফেতনার অন্ধকার তাদের থেকে দূরে সরে যায়। আর তাদের জন্যেই পরবর্তী বাক্যে রয়েছে খোশখবরী–

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

"এরাই সেসব লোক যারা মোমেনদের সঙ্গে থাকবে"।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে মুনাফেকদের সম্পর্কে কঠিন শাস্তি ঘোষণার পর চারটি শর্তারোপ করা হয়েছে। যারা এ শর্ত পূরণ করবে তারা দোযখের শাস্তি থেকে নাজাত পারে (১) যারা মুনাফেকী ও অন্যান্য পাপাচার থেকে তওবা করবে (২) আত্মসংশোধন করবে (৩) আল্লাহ্র দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। (৪) শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে দ্বীনের কাজ করবে। যারা এ চারটি শর্ত পূরণ করবে তারা পরকালীন জিন্দেগীতে মোমেনদের সঙ্গে থাকবে।

وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

মোমেনদের জন্যে পুরস্কারের ঘোষণা

আর আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে দান করবেন শ্রেষ্ঠ বিনিময়। তফসীরকারগণ এ শ্রেষ্ঠ বিনিময়ের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হল জান্নাত, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ। যেহেতু পূর্ববর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছে যে, মুনাফেকরা যদি তওবা করে এবং আত্ম সংশোধন করে ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে সৎ কাজ করে তবে তাদের হাশর হবে মোমেনদের সঙ্গে। তাই এ আয়াতে মোমেনদের বিশেষ

মর্যাদা এবং শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।[১]

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ

অর্থাৎ-যদি তোমরা শোকর গুজার হও এবং পরিপূর্ণ ঈমান আনয়ন কর, আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ সঠিকভাবে পালন কর তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন না। কেননা, শাস্তি তো কাফের এবং মুনাফেকদের জন্যে, শোকর গুজার মোমেনদের জন্যে নয়। বন্দাদেরকে শাস্তি দিলে আল্লাহ্ পাকের ক্ষমতায় কোন কিছু বৃদ্ধি পায় না, আর শাস্তি না দিলেও ক্ষমতায় এতটুকু লাঘব হয় না। কোন কিছু লাভের উদ্দেশ্যে অথবা কোন কিছুর ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় না। কেননা, আল্লাহ্ পাক সমস্ত লাভ ক্ষতির উর্ধ্বে, তিনি এসব কিছু থেকে পবিত্র। যারা আল্লাহ্র নেয়ামত সমূহ অহরহ ভোগ করা সত্ত্বেও তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তাঁর পৃথিবীতে বাস করে তাঁর বিদ্রোহী হয় তাদের শাস্তি অবধারিত।

আলোচ্য আয়াতে শোকরের কথা আগে উল্লেখিত হয়েছে, পরে ঈমানের কথা এসেছে। কোন কোন তফসীরকার এর কারণ বলেছেন, মানুষ সর্বপ্রথম আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের প্রতি লক্ষ্য করে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, অতঃপর চিন্তা করে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে।

وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا

আর আল্লাহ্ পাক বন্দাদের শোকর গুজারী বা কৃতজ্ঞতার জন্যে সওয়াব দান করেন। তিনি অত্যন্ত কম আমলের জন্যেও অনেক বেশী সওয়াব দান করেন, আর তিনি মহাজ্ঞানী, কার ঈমান কতখানি? কার আমল কি? আর তাতে এখলাস আছে কি-না? কে কোন্ পর্যায়ের এসব বিষয়ে তিনি মহাজ্ঞানী। অতএব, কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তির আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য পঞ্চম খণ্ডের তফসীর সমাপ্ত হল ৫-৮-৮৮ ইং।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৮৮